ক্রন্দসী কাশ্মীর

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

প্রকাশক—এস. চক্রবর্ত্তী
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ—১৩৭৩

প্রচ্ছদপট
প্রসাদ মিত্র
১২, নিত্যগোপাল চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা—২

দাম : দশ টাকা

মুদ্রাকর—সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

প্রশান্ত প্রকৃতির
কল্পনা উৎসবে যে
কভু মিতা
কভু জায়া
সেই তো রুকায়া ॥

॥ এক ॥

শেষদিন

'তারপর ?'

'একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকে দিল ওকে যীশুর মতন। সারারাত ও শীতে কাঁপল, সারাদিন রোদ্দুরে পুড়ল। পরদিন সন্ধ্যায় ও যখন খাবার চাইল তখন নিচের গ্রাম থেকে ধ'রে আনা হল তুদিনের বাচ্চা সমেত ওর অসুস্থ স্ত্রীকে আর ওরই চোখের সামনে ফুটন্ত গরম জলে ওর ছেলেকে সেদ্ধ ক'রে হানাদার তুলে ধ'রে বললে, 'নাও খাও !'

বাধা দিয়ে বলি—'থাক রুকায়া, আর বলতে হবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তুই হাঁটুর ওপর মুখখানা রেখে ও ব'লে যাচ্ছিল, দূর পাহাড়ের ওপারে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে। আমার কথা শুনে চোখ দিয়ে যেন ওর আগুন ঠিকরে পড়ল, বললে—'ফকীর মহম্মদ আটদিন ধ'রে সইতে পারল ওদের অত্যাচার আর তুমি শুনতেও চাও না ? বস।'

'শুনে কি হবে ?'

'তোমার দেশের মানুষকে জানাবে যে কাশ্মীরি নুন খেয়েছে, নেমকহারামি করেনি।'

বাধ্য হ'য়ে বসে পড়ি। ও বলে চলে, 'ফকীর মহম্মদ দেখেছে, দয়া চায়নি, কাঁদেনি, কথাও বলেনি। ওরা প্রতি চাবুকে হুকুম করেছে, বল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। ও প্রতি নিঃশ্বাসে জবাব

দিয়েছে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!' রাগে অন্ধ হ'য়ে ওরা ওর শরীরের জায়গায় জায়গায় ব্লেড দিয়ে কেটে ভরতে আরম্ভ করল নুন আর লঙ্কা। এমনি ক'রে তিনদিন কাটার পর ওরা আরম্ভ করল অত্যাচারের নতুন পদ্ধতি।'

'কি?'

'সাঁড়াশি গরম ক'রে ওর চামড়া টেনে তুলতে লাগল। তাও তিনদিন প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায়। হিন্দুস্থানী ফৌজ এসে দেখল, মানুষ নেই, আধপোড়া কালো একটা কঙ্কাল ঝুলছে।'

পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে পা দুটো যেন আর চলতেই চায় না। কোন রকমে সামনের বড় পাথরটার ওপর এক লাফে উঠে নিচে হাত বাড়িয়ে আমি রুকায়াকে টেনে তুললাম। পাখীর ওজন ব'লে পালকের মতন উঠে এলো। এক পলক নিঃশ্বাস নিয়ে ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করলাম—'আর কতদূর?'

দুফালি সোনালি চুল ওর ঘর্মাক্ত মুখ থেকে আলতো সরিয়ে রুকায়া ঘুরে দাঁড়াল। চারিদিক ভালো ক'রে দেখে, এ পাহাড় ও পাহাড়ের কি একটা হিসেব ক'রে বললে, 'আধ কোশ।' বলতে বলতে ও পাথরটার শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেল, আমিও দু পা সামনে সরলাম। এমন তন্ময় হ'য়ে ও তাকিয়েছিল যে, ওর ঠিক পেছনে এসে আমার দাঁড়ানোটা বুঝতেই পারেনি। ইচ্ছে করছিল পেছন থেকে ওর কাঁধ দুটো আলতো ভাবে ধ'রে, ওকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভুলে যাওয়া ওর প্রাণস্পন্দনে এই তুষ ময়দানের অসীম সৌন্দর্য্যকে সার্থক করি। কাশ্মীরের তুষ ময়দান হল প্রেয়সীর সেই পরিপূর্ণতা যা প্রেমের শেষ সপ্তকে পৌঁছে তবেই পাওয়া যায়, অনেক দ্বিধার পর, অনেক আনন্দ পেরিয়ে, অনন্তকে পাওয়ার অসম্ভব সাধনার পর, একেবারে অতর্কিতে।

হঠাৎ ঘুরতে গিয়ে আমার গায়ে হালকা ছোঁওয়া লাগল। আমার বোধহয় মনে হল ও টলে পড়ছে, তাই চট ক'রে ধ'রে ফেললাম। ও যেন একটু শিউরে উঠে বললে, 'শীতের হাওয়া। চল, যাওয়া যাক।'

ছুপুরটা শেষ হয়ে আসছে। সেই ভোরে গুলমার্গের ওপর আবহুল হালিমের বাড়িতে এক পেয়ালা কাবা আর ছুখানা ক'রে বাখরখানি খাওয়ার পর সেই যে আমাদের পাহাড় ভাঙ্গা শুরু হয়েছিল, পথে একবারও থামিনি। কথাও থামাইনি। রুকায়া একবার আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের একটা প্রবাদ আছে, চড়াই উঠবার সময় কথা বললে ভূতে পায়!'

হেসে বললাম, 'আমায় আজ কথার ভূতে পেয়েছে, কাশ্মীরি ভূতকে ভয় নেই!' অনেক কথা হ'য়েছে ওর সঙ্গে; এলোমেলো, নিজেদের একদম বাদ দিয়ে; শান্ত মনে স্তব্ধ আবেশে অসীম বেদনার কথা যার মধ্যে এখন আর কোন ব্যথা নেই, যেমন মকবুল শেরওয়ানি, যেমন ফকীর মহম্মদ আর তার ছেলে, যেমন আগামী কাল আমার দেশে ফেরা, যেমন আর কখন ওর সঙ্গে এইভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে না ঘোরা, যেমন আপন আপন জগতে নিজেদের হারিয়ে ফেলা। ও কখন শুনেছে, কখন ছোটখাটো জবাবও দিয়েছে। আমাদের মনের ইচ্ছে আর মুখের প্রতিজ্ঞা যাই থাক, গলার স্বর আর দৃষ্টি বিনিময় ছিল মিলন-রাতের শেষ প্রহরের মতন শান্ত, ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত। বড় পাথরটার ওপর ঐ ছোঁওয়াটুকুর পর, ছুজনেই কথা হারালাম, একেবারে নিঃশেষে। যে বাঁধটা আমরা নিজেরাই গড়েছিলাম সেটাতেও বোধহয় একটু ফাটল ধরল।

ছোট বড় পাথরের পাশ দিয়ে একফালি পথ। পাশাপাশি চলেছি ছুজনে, নিবিড় নিস্তব্ধতায়। রুকায়ার পায়ে নাগরা, চলার শব্দ নেই। আমার পায়ে রবার দেওয়া কাবলি, তারও কোন শব্দ

নেই, তবুও যেন প্রতিশব্দ শোনা যায়। পায়ে পায়ে পথ হাঁটছি আর মনে মনে হিসেব করছি। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। ওর ধবধবে পা দুটোর গড়ন একেবারে নিটোল। চার মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট। চারিদিকের গভীর নীরবতায় আমাদের নিকটত্ব নতুন ক'রে নিবিড় হচ্ছে, মনটা আর একবার মুখর হ'তে চাইছে। আমাদের ছোট্ট চলার শব্দে অনেকখানি মাধুর্য্য, টানাটানা নিঃশ্বাসের শব্দে অসীম আনন্দ, কাঁধে কাঁধ না লাগা আর হাতে হাত না ছোঁওয়ার মধ্যে অনেকখানি কাছে আসা। বুঝতে পারছি, বেশী নয়, আর এক পলক, তারপর এই নিস্তব্ধতাই হয়ে উঠবে ওকে আমার অনেকখানি কাছে পাওয়ার ঐকান্তিক আবেদন। ও হঠাৎ বলল, 'তুমি কি আমায় নিয়ে বই লিখবে?'

'হয়ত। কোন একদিন।'

'কি লিখবে?'

'তুমি যা।'

'সব লিখবে? সব?'

'হ্যাঁ, সব। স-ব।'

'আর আমার স্বামীর কথা?'

'তাও লিখব?'

'কি লিখবে?'

'তিনি ভগবানেরও ঈর্ষা।'

রুকায়া থেমে গেল। এক পলক দেখল আমায়। অনেকখানি দেখা, যেন খানিকটা অবিশ্বাসের অন্ধকারে, তারপর আবার চলতে চলতে বললে, 'তাই কি?'

মনে হল ও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। না করারই কথা। কামালের সঙ্গে আমার আলাপ দুদিনের, কথা এক রাত্রের। অনেকটা ঠিক মাঝরাতে দেখা আর শেষ রাতে ভুলে যাওয়া ছোট্ট স্বপ্নের মতন। অল্প, আবছায়া, বেশীটাই আজ যেন অস্পষ্ট। কামালকে

আমি কতটা বুঝেছি আর কতটা বুঝিনি সেই বোঝাপড়ায় ব্যস্ত হ'য়ে মনটা তুষ ময়দানের পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল অসহায়ের মতন। এবার শুনলাম কাছে কোথাও অজানা পাখী ডাকছে, দূরে কোথাও অ-দেখা ঝর্ণা ব'য়ে যাচ্ছে, চারিদিকে অচেনা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। কামালের কথা মনটাকে আবার বে-সামাল ক'রে তুললো। আর একবার দেখা হয়না ওর সঙ্গে? আর একবার ওর শেষ কথাগুলো শোনা যায় না—শুনতে শুনতে রুকায়ার সঙ্গে ওর ভাঙা জীবনের কথা না ভেবে, ওদের দৈহিক মিলনে রুকায়ার বিতৃষ্ণা কল্পনা না ক'রে? সেটা আর সম্ভব নয়। কাশ্মীরে আমার থাকার মেয়াদ নেই, ওর সঠিক কোন ঠিকানা নেই। বন্দুক কাঁধে ও ছুটে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে, পাকিস্তানি হানাদারদের ধাওয়া করে। আঠারো বছর ধ'রে এই ওর জীবনের ধারা।

দেশের সেবা করতে করতে হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়িয়ে ও নিজের দিকে তাকিয়ে রুকায়াকে কাছে টেনেছিল, বিয়েও করেছিল, কিন্তু ঘর বাঁধেনি। সামাজিক নিয়মে সংসার পেতেছিল কিন্তু সন্তানকে কাছে পাওয়ার অবকাশ পায়নি। রুকায়া ওর ঘরে ছিল কিন্তু মনে ছিলো না, আর যখন মনে পেতে চাইল তখন রুকায়া মনে মনে মরে গেছে। নিজেকে ও বোঝেনি, বোঝাতেও পারেনি। আজ তাই ওরা ঘরের জগতে দুই আলাদা মানুষ, বাইরে ওরা একই জগতের দুই অভিন্ন মানুষ, একজন দেশের দোর আগলায় আর অন্যজন ঘর সামলায়। মাঝে মাঝে ওদের দেখা হয় পাহাড়ের বাঙ্কারে আর কথা হয় হাটের মাঝখানে। ওদের পারস্পরিক চাওয়ার চাহিদা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বহুদিন আগে হিজিবিজি হয়ে গেছে। আজ ওদের মধ্যে সামাজিক বাঁধনের শৃঙ্খলটাই শুধু ব্যথার সুরে বাজে।

সালওয়ারটা আলতো ভাবে একটু তুলে, ঝর্ণার জলে পা

ডুবিয়ে রুকায়া আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে, "ঐ সেই গাছ তুমি যাকে বলেছ স্বাধীনতার তীর্থ।"

'কিম্বা, পাকিস্তানের কবর!'

ওরই মতন আমিও জুতো পরা পা দুটো জলে ডুবিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বরফের ওড়না গায়ে দেওয়া পাহাড়টার ঠিক পায়ের তলায় প্রকাণ্ড ঘন সবুজ মাঠের শেষ প্রান্তে একটা মাত্র তুত গাছ। আর তার মাথার ওপর মনে হল একটা ফ্লাগ উড়ছে।

জায়গাটার নাম তুষ ময়দান বলেই এ অঞ্চলের ভেড়াদের লোমে যে আলোয়ান তৈরি হয় তাকে বলা হয় তুষ। সামনের পাহাড়টার মাঝখানে যে খাঁজটা আছে তার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে মাইল পাঁচেক নামলেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের এলাকা। ও পারে আমাদের পাহারা আছে কিন্তু কাজে মন নেই। থাকলে, পাঁচ হাজার হানাদার এই পথে এসে ময়দানে ঘাঁটি গাড়তে কখনই পারত না।

এইটাই এখানে ভেড়া চরাবার সময়, কিন্তু জনমানব নেই। আমাদের বাঁ দিকে খাড়াই ভাবে পাহাড় নেমে গেছে দু আড়াই হাজার ফুট। তার নিচে গ্রাম। সারা শীত ওরা ঐখানে থাকে আর বসন্তের প্রথম বাতাসের ইশারা পেলেই হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে এইখানে উঠে আসে চার মাসের জন্যে। এক হাতে বাঁশী আর অন্য হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে ওরা প্রকৃতির অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। রুকায়া বললে, ওরা গরীব কিন্তু গর্বের সীমা নেই। হাজার হাজার বছর ধ'রে এইভাবে ওরা জীবন কাটায়; সভ্যতাকে জানেও না, মানেও না। ওরা বলে, খুদা ওদের পাঠিয়েছেন এইখানকার রাজা ক'রে নিচের মানুষদের ক্রীতদাস হবে কোন দুঃখে? আজও ওদের ধনী দরিদ্রের মাপ হল বাঁশের চাটাই আর তুষের কম্বল। যার বাড়িতে তিনটে চাটাই আর দুটো কম্বল সে হল রীতিমত বড়লোক।

ঝর্ণা পেরিয়ে একটু নামলেই মাঠ শুরু। মাঠে নেমেই মনে হয়

ঘাস নয়, মখমল। জুতোটা খুলে হাতে নিলাম। ভিজে পা দুটো যেন জমে বরফ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। রুকায়া বললে 'কলকাতার বাবু, এ কাজ কোর না, শরীর তোমার সইবে না।' ও কিন্তু জুতোটা খুলল না, পা থেকে ছুঁড়ে ফেলেই দিল টান মেরে, বললে, 'এখানকার বাতাসে বরফের যাদু আছে। বয়সটা হাজার বছর কমিয়ে ফেলে!' বলে ছুট দিল বছর বারো বয়স কমিয়ে ছেলেমানুষের মতন।

সত্যিই বোধহয় তাই। ওর ছোটার পেছনে মন ছুটিয়ে দেখি আমাদের পনেরো দিনের একসঙ্গে পথ চলা পোছয়ে ফেলে পৌঁছে গেছি কলেজের ক্যাম্পাসে। শোভা কেমন আছে কে জানে? ওর স্বামী তো শুনেছি রাজদূত, আছে বোধহয় আমেরিকা কি আরব দেশে। ঢাকায় নয়ত? আর রেডিওর রেবা? হঠাৎ মিলিয়ে দেখতে মন চাইল। রেবা আর রুকায়া কি একই মানুষ? চেহারার কথা বলতে পারি, মনটাকে বুঝিনা, রেবারও না, আজ আর রুকায়ারও না। সংসার পাতবো বলে রেবার দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলাম, ধরা দেয়নি। সংসার থেকে পালিয়ে এসেছি বলেই রুকায়া আমার জীবন জুড়ে বসেছে। চক্রাকারে যে মানুষটা আমাদের এই ভাবে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সে কে? ভাগ্য না ভগবান?

'শয়তান!'

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রুকায়া আবার আকাশ ছোঁওয়া চিৎকার ক'রে উঠল, 'শয়তান!' পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি হল।

'শয়তান! শয়তান!! শয়তান!!!'

গাছের গুঁড়িতে পেরেকগুলো এখনও আছে। দু'পায়ের জন্যে দুটো, গলার দুধারে দুটো। আর আছে রক্তের কালো কালো দাগ আর পোড়ার কিছু চিহ্ন। ভাঙা প্যাকিং কেসের ডালাটা গাছটার

ডানদিকে গজ দশেক দূরে পড়েছিল। তার ওপর কাঠকয়লা দিয়ে উর্দুতে কিছু লেখা। অস্পষ্ট কিন্তু পড়া যায়। তুলে এনে বললাম, 'কি লেখা আছে ?'

রুকায়া আস্তে মুখ ঘোরালো। দাঁত দিয়ে ওর ঠোঁটের কোণটা চাপা, চোখে জলের ধারা। গোলাপী ওর গাল দুটো থর থর করে কাঁপছে। পড়ার একটু চেষ্টা করেই ও আমার কাঁধের ওপর টলে পড়ল, ছেলেমানুষের মতন কাঁদতে কাঁদতে।

সমবেদনার সীমা ভালোবাসার অসীমে মিলিয়ে থাকে আর ভালোবাসার একটা বড় ভাষা হল দেহ। ওর স্পর্শ পাওয়ার শিহরণে আমার আদর্শ-আফিংয়ের নেশাটা যেন কেটে গেল, আবার ওকে কাছে পাওয়াটা দৈহিক সীমানায় দেখা দিল। আমার বুকে মুখ গুঁজে ও কাঁদল। ওর চুলের গন্ধে আমি কামালের শেষ কথাগুলো আবার শুনলাম, এবার স্পষ্ট, ঠিক যেমন ভাবে ও বলেছিল : 'ওকে আপনি নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। সে ঋণ কোনদিনও আমি ভুলবোনা। তাই ডেকেছিলাম বলব বলে। সে আপনাকে ভালোবেসে মুগ্ধ হ'য়েছে বলেই হয়ত আমার প্রতীক্ষা সফল হবে। আপনার ভালোবাসাতেই আছে আমার মুক্তি।'

কামালের এই কথাগুলো আমি রুকায়াকে বলিনি, বোধহয় কামালের ঈর্ষায়। আমার জীবনেও এই ধরণের একটা দিন এসেছিল কিন্তু তার ঋণ আমার শোধ হয়নি। কামালের মতন এমন সহজ মনে আর স্থির বিশ্বাসে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিসেব চোকাতে পারিনি। স্বার্থের অহংকারে কিছুটা হারিয়েছিলাম। সে কথাটা আবার নতুন ক'রে মনে পড়তেই বাহু বন্ধনের নিবিড়তা বেশ খানিকটা শিথিল হল। রুকায়ারও নিশ্চয় অমনি ধারা কিছু একটা মনে হল, হয়ত আমার কিছু কথা। ও স'রে গিয়ে বোর্ডটা তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল :

'সাবধান। আমাদের আসার খবর ভারতীয় কাফেরদের যে জানাবে তারই এই অবস্থা হবে।'

গাছটা থেকে গজ কয়েক দূরে যে ছোট্ট ঢিপিটা আছে, তারই ঠিক পাশে হিন্দুস্থানী ফৌজ ওদের—ওর আর ওর ছেলের কবর খুঁড়েছিল। গিয়ে দেখলাম সেখানে অল্প অল্প ঘাস গজিয়েছে। মোমবাতি ও একটা এনেছিল ঝোলায় ভ'রে এই মকবরায় জ্বালাবে বলে। সযত্নে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে রুকায়া বলল, 'স্মৃতির পূজোয় আমরা নমাজ পড়ি। তোমরা কি কর?'

ভাববার কথা। সত্যিই তো, কি করি? ভেবেই পেলাম না, তাই কাব্য ক'রে বললাম, 'অতীতকে মনে মনে সেলাম ঠুকে, ভবিষ্যতকে সামলাবার জন্যে হাতের মুঠো শক্ত করি।'

কেন এ কথাটা বললাম ভাবতে থাকি। ওকে ভেবে, না ওর স্বামীর কথা ভেবে? কে জানে। ও একটু হেসে বললে, 'তার আগে হাতটা একটু ছড়াও, আর বাতিটাকে বাতাসের দাপট থেকে সামলাও। আমি নমাজ সারি।'

আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম হাতটা বাড়িয়ে। মনটা কবরের কিনারায় ছোট্ট লাল ঘাসফুলটার পায়ে গিয়ে পড়ল। পঁচিশ বছর আগে এমনি একটা লাল ফুল রেবা আমায় দিয়েছিল তার ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। মুখে বলতে পারেনি তাই ফুলের ভাষা ধার করেছিল। তারপর অনেক পরিবর্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে জগতে এবং জীবনে, কিন্তু আমার প্রথম জীবনের সে সৌরভ, শেষ যৌবনের পরিসমাপ্তিতে আজ আবার তার পরিপূর্ণ সম্ভার তুলে ধরল। রুকায়ার প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক কিন্তু ঐ ছোট্ট লালফুলের পায়ে কোথায় যেন আজ সেটা একটু হোঁচট খেলো। এটাই কি আমি যাকে বলি 'লয়ালটি'? না, রুকায়ার আঙ্গিক আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে এটা আর এক আদর্শের আফিং? যাই হক, আমার সেই অতীতকে সেলাম ঠুকে সামনের ভবিষ্যতকে

সামলাবার জন্যে মনের মুঠো শক্ত ক'রে ধরি। নমাজের নানান ভঙ্গিমায় ওকে আরও যে অনেকখানি ভালো লাগছে তাতো বুঝতেই পারছি। আত্মপক্ষের আড়াল থেকে স্বার্থ উঁকি মারছে, আবার আদর্শের আচ্ছাদনও আছে।

স্মৃতির পূজো শেষ করে রুকায়া শুয়ে পড়ল ওর লাল চাদরটার ওপর। আমি ছোট্ট টিপিটাতে ঠেসান দিয়ে বসলাম ওর মাথার কাছে। দমকা বাতাসে বাতিটা নিবে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল।

'কি হল?'

'পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ!'

তাকিয়ে দেখি গাছের ওপর সেটা আধ-চেঁড়া হ'য়ে উড়ছে। ও ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট তেরঙ্গা ফ্ল্যাগ বের ক'রে বলল, 'এটা উড়িয়ে ওটা নিয়ে এসো!'

'এই সেরেছে!' আমি একবার ওপর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কলকাতার মানুষ, অহংকারের উচ্চতম শিখরে উঠতে পারি, খোসামোদের কথা শুনলে মাথার ওপরে উঠতে পারি আর পকেটে যদি ট্যাকসির পয়সা না থাকে তাহ'লে বড় জোর দোতলা বাসে, কিন্তু গাছে? পারব না!'

ও দাঁড়িয়ে বললে, 'এই যে সবাই বলে বাংগাল হল বীরের দেশ?'

আমি হেসে বলি, 'ছিল। এখন ওখানে আছে তিন জাতের পুরুষ—হয় বর, নয় বার আর না হয় বর্বর!'

'ইয়া আল্লাহ!' ও গায়ের চুন্নিটা কোমরে জড়িয়ে চট ক'রে চলে গেল আর দেখতে না দেখতে একেবারে মগ্‌ডালে। চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্ল্যাগটা সটাং নিচে ফেলতে ফেলতে বললে, 'দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দাও!' আর আমাদের ছোট্ট তেরঙ্গাটা উড়িয়ে দিয়ে বললে: 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!'

সিনেমা হলে জনগন শুনে দাঁড়িয়েছি আর লাল কেল্লার

জহরলালের প্রথম পতাকা উত্তোলনও দেখেছি কিন্তু আজকে ঐ তেরঙ্গা দেখার এমন তড়িৎ শিহরণ আগে কখন অনুভব করিনি। আজ মনে হল, আমি সৈনিক হলে ট্যাঙ্কের সামনে দাঁড়াতে পারতাম, প্রয়োজন হলে প্রাণও দিতে পারতাম, জীবনের কোন প্রতীক্ষারই বালাই রাখতাম না। রুকায়া ওর চুন্নিটা ঝাড়তে ঝাড়তে এসে দাঁড়াল আর আমি আমার দেশলাইটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ও দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা চেপে ধরল তারপর বড় বড় চোখ তুলে বলল, 'থাক্। পোড়াবোনা!' তারপর এসে ও ও টিপিটায় আধাআধি ভর দিয়ে এলিয়ে বসল, প্রথম দিনের জ্যোৎস্না জোয়ারে যেমন নৌকায় বসেছিল, নারীত্বের নীরব প্রতীক্ষায় ভরা ইশারা দিয়ে। আমাদের এতো কথা, বসার একটা ভঙ্গিতে ও যেন সব বাতিল ক'রে দিল। মনে হল ও হঠাৎ বদলে গেছে। কিছু হালকা. কিছু সচকিত। চুন্নির আঁচলটা কিছু বেশীই বোধহয় সরিয়ে নিয়ে মুখটা মুছল, বললে, 'সেদিন তোমায় কামাল কি বলেছে?'

'অনেক কথা।'

'আমার বিষয় ঠিক কি কি বলেছে।'

হাসলাম। আমি ঠিকই জানতাম কোন এক অবসরে এ কথাটা ও জানতে চাইবেই। এতোদিন কেন যে চায়নি সেইটাই আশ্চর্য্য। মেয়েদের পেটে কথা থাকেনা, অন্যকে আবার রাখতেও দেয় না। ভয় ছিল সারাদিন পথ চলার পায়ে পায়ে আর নানান কথার ফাঁকে ফাঁকে ও ঐ প্রসঙ্গটা না আবার তুলে বসে। ওর কৌতূহলকে আমি ভয় পাই না, কারণ ওর কাছে আমার কিছুই গোপন নেই কিন্তু ওর স্বামীর কথা উঠলেই আমার সঙ্কল্পে কোথায় যেন আঘাত লাগে। কথাটা তাই এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বলি: 'তার আগে তুমি বল, ওকে আমার কথা তুমি কি বলেছিলে?'

'সব। যা কিছু ঘটেছে।'

'সাহস পেলে কি ক'রে?'

ও হাসল, একটা পাথর কুচি নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, 'সত্যিটাই তো আমার জীবনের সম্বল।'

ছোট্ট ক'রে এবার ওর প্রশ্নের জবাব দিলাম, 'সেইটাই ও আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'আর কিছু? যা বলেছে সব বল।'

'তার আগে তুমি কিছু বল।'

'কি?'

'এমন সুন্দর মানুষটাকে তুমি বোঝনি কেন? তোমার এতো বুদ্ধি।'

পাকিস্তানের ফ্লাগটাকে এতোক্ষণ পা দিয়ে নাড়ছিল, এইবার হাত বাড়িয়ে মুঠো ক'রে তুলে নিল। বুঝলাম ঐটাই বোধহয় ওর বেদনার প্রতীক। বললে, 'বুঝিনি কারণ ও কখন আমায় বোঝেনি। পোনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম বোর্খার অন্ধকারে, সংসারের আশায়, গরীব ঘরের অশিক্ষিত মেয়ে। শেখ আবহুল্লাহ যেদিন আমাদের আকাশে নয়া কাশ্মীরের লাল পতাকা তুলে দিলেন, ও আর জয়নাল বেগম আমায় সেদিন ঘর থেকে বের ক'রে আনলো দেশের নামে ডাক দিয়ে। আমি দেশ চাইনি ওকে চেয়েছিলাম। তাই মার কান্না আমার কানে আসেনি, বাবার কথা বুঝিনি, কাশ্মীরি মুসলমান সমাজের আস্ফালন আমার পথ আটকায় নি। আমি নির্মুক্ত মনে বোর্খা ফেলে বেরিয়ে এসেছিলাম আর সঙ্গে এনেছিলাম কাশ্মীরি মেয়েদের নব-জাগরণ। কেন? কি ক'রে? আমি তার কিছুই জানিনা। শুধু জানি, দেশের জন্যে নয়। ও চেয়েছিল বলে। পাড়ায় পাড়ায় আমি বোর্খা পুড়িয়েছি ও ব'লেছিল ব'লে। যেদিন পাকিস্তানি হানাদার বারামূলার ইংরেজ নানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার ক'রেছিল, প্রকাশ্য রাজপথের ওপর তাদের ধর্ষণ ক'রে, সেদিন অবিবাহিতা;

অশিক্ষিত মেয়ে আমি কামালের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা ক'রেছিলাম, ওর কাছে থাকতে পাবো ব'লে আর যেদিন পামপোরের জাফরাণ ক্ষেতে লক্ষ ফুলের মধ্যে আমার যৌবনের প্রথম ফুল আমি ওকে দিয়েছিলাম তাও ওরই কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাসের পরিপূর্ণ আনন্দে।'

'জানি।'

'আমি সাধু চাইনি, আমি সন্ন্যাসী চাইনি, সৈনিক চাইনি, আমি স্বামী চেয়েছিলাম। আমি ধ্বংসের কাজ চাইনি, সৃষ্টির আনন্দ চেয়েছিলাম। আমি শুধু সন্তান চাইনি, সঙ্গে সংসারও চেয়েছিলাম। এক পলকের আনন্দ ভিক্ষা দিয়ে ও আমায় একমুঠো ধুলোর মতন চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি বিলেত আমেরিকা ঘুরে ডিগ্রি আনতে চাইনি, আমি দোকান থেকে চাল কিনে এনে চুলা ধরাতে চেয়েছিলাম।' এক পলক থেমে গেল রুকায়া। কোথাও আবার পাখী ডাকল, কোথাও ঝিঁঝিঁ ডাকল, গাছের ওপর ছোট্ট ফ্ল্যাগটা দমকা বাতাসের দোলায় আমার মনে আর এক ঝলক মুক্তির আস্বাদ এনে দিল। রুকায়া পায়ের কাছে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা ছড়িয়ে বললে, 'তুমি সেদিন পঁয়তাল্লিশ কোটির দোহাই দিয়ে বললে, আমরা ভালোবাসা বলতে যা বুঝি ও দেশ বলতে তাই বোঝে। তাই যদি হত তাহ'লে যেদিন শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীর বিকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করল সেদিন ও মদ খেয়ে মাতাল হত না, তাকে গুলি ক'রে মারত; পারল? যেদিন বক্‌সি গুলাম মহম্মদ ভারতের কোটি কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরে, লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরিকে অনাহারে মারল সেদিন পুরুষের মতন তাকে গুলি না ক'রে মেয়েদের মতন পালিয়ে গেল লেকচার দিতে। হানাদার দেশের শত্রু নয়, আসল শত্রু কামালরা যারা অন্যায় সহ্য করে।' থেমে গেল রুকায়া, ক্ষুব্ধ অভিমানে মনটা ওর ক্ষত বিক্ষত। প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করাই উচিত ছিল।

ও আবার বললে : 'তোমায় আমি কথা দিয়েছি কামালকে জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার। সে কথা আমি ঠিকই রাখবো। কিন্তু কেন জানো ?'

'দেশের জন্যে ?'

'না।'

'আমার জন্যে ?'

'তাও না।'

'তাহ'লে ?'

'জীবনের বিরুদ্ধে ওটাই হবে আমার জেহাদ।'

ক্লান্ত হ'য়ে আমার হাঁটুতে মাথা দিয়ে ও এলিয়ে পড়ল। ওর জন্যে মায়া হল। ও বেদনায় সিক্ত, নিরাশার হাহাকারে স্তিমিত, অসহায় রিক্ত। মাথায় সান্ত্বনার স্পর্শ দিয়ে বলি, 'এ জেহাদ শেষ হবে কবে—আর কেমন করে ?'

ও তাকায় আমার দিকে। কিছু বলে না। আবার জিজ্ঞেস করি, 'বললে না তো ?'

'আজ হ'তে পারে', উঠে ব'সে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটা টান টান ক'রে বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'এক্ষুনি !'

'কি ক'রে ?'

'এই ফ্ল্যাগটাকে মাটিতে নামিয়ে ও হিন্দুস্থান আর কাশ্মীরের মিলনটা পূর্ণ করবে বলে ঘুরে মরছে আজীবন। এইটাই ওর সৃষ্টির সাধনা। তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সৃষ্টির সাধনা আমি জানি। আজই আমার জেহাদ শেষ হয় যদি স্বাধীনতার এই তীর্থে তুমি আমায় সেই সাধনায় দীক্ষিত কর।'

'রুকায়া !'

'চমকে উঠোনা। আমার বলা এখনও শেষ হয়নি। আমি

ঘরের মানুষ, স্মৃতি নিয়ে আমার জীবন চলবে না। সেদিন কামালের জন্যে তুমি আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিলে। আমি দিয়েছি। আজ আমি নিজের জন্যে তোমার কাছে ভিক্ষের ঝুলি পাতছি, তুমি না বোল না।'

হাঁটু গেড়ে বসল আমার সামনে, বললে, 'বল দেবে।'

অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম, ভেবেই পেলাম না কি বলব।

ও-ই আবার বললে, 'কামালের কথা ভাবছো? বিনামূল্যে কি মুক্তি মেলে? তাছাড়া, ওতো আমায় পেলেও, দেশকে ভুলবে না। আমি কি নিয়ে থাকব?' থেমে বললে, 'বল, দেবে?'

আমি চুপ করে রইলাম, কথা জোগালো না। ও উঠে দাঁড়াল, বলল, 'দাঁড়াও আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'আমাদের ধর্মে বলে মসজিদে ঢোকবার আগে মুখ হাত ধুয়ে পবিত্র হ'য়ে নাও। তাই যাচ্ছি ঐ ঝর্ণায়। যাবো আর আসবো।'

রুকায়া চ'লে গেল, আমি হতবাক হ'য়ে ব'সে রইলাম। একদিকে আমার কামালের হতাশা অন্যদিকে রুকায়ার হাহাকার। কামাল দেখেছে আমার ভালোবাসায় তার মুক্তি। রুকায়া চাইছে তার নিজের মুক্তি। ওদের দুজনের মধ্যে আমি কে? আমি কোথায়? আমি কেন? আর রুকায়া যা চেয়েছে তাই যদি হয় তাহ'লে কামাল পাবে তার পথ, রুকায়া পাবে তার পাথেয় আর আমার জন্যে থাকবে কেবল পথের ধুলো। ভাগ্যের অনেক ষড়যন্ত্র উত্তীর্ণ হ'য়েছি কিন্তু এবার বোধহয় নিজেকে নিঃশেষেই হারালাম। একটা নিখিলেশের বোঝাই আমার সয়না—আরও? এমনি ধারা নানান ভাবনায় এমনই হারিয়েছিলাম যে গুলির প্রথম আওয়াজটা শুনিনি আর শুনলেও প্রথমে বিশ্বাস করিনি। চমক ভাঙল যখন রুকায়ার আকাশ ফাটা আর্তনাদ কানে এলো:

'কামাল।'

ঝর্ণার জলে মুখ গুঁজে রুকায়া পড়েছিল বড় পাথরটায় মাথা আটকে। রক্তের একটা ধারা গোলাপী পাড়ের মতন স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, নিচের গ্রামের দিকে, শ্রীনগরের দিকে, ঝিলামের দিকে। আমি জলে নেমে ওকে কিনারায় তুললাম, মাথাটা আমার কোলের ওপর রাখলাম। গোলাপী গাল দুটো ধ'রে মুখখানা তুলেও ধরলাম। ওর চুলগুলো ভিজে, মুখের ওপর মুক্তোর মতন কয়েক বিন্দু জল। ঠোঁটের কোণে ঠিক একবিন্দু রক্ত। বাঁ ধারে কাঁধের ঠিক তলায় গুলি লেগেছে। সেখানে পোড়া দাগ, এক চাপ রক্ত। আরও গুলির আওয়াজ এলো পরপর তিনটে। একটা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া, কারণ সামনের বড় পাথরটার একটা কোণ ভেঙে জলে পড়ল। বোধহয় সেই জন্যেই ওপর থেকে মানুষ পড়ার শব্দ আমি পাইনি।

আমার পেছনে এসে দাঁড়ালো পাঞ্জাব আর্মড পুলিশের সেপাই রামশুভাগ সিং। তখনই রুকায়ার বুকটা শেষ বারের মতন কেঁপে কেঁপে উঠে থেমে গেল। আমি ওকে আস্তে নামিয়ে, ওপরে উঠে পাথরটার ধারে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকেই দেখলাম, বাঁ ধারের গাছের তলায় দু'জন সেপাই একটা লোককে ধ'রে ঝর্ণার জল থেকে তুলছে। আর দেখলাম, জলের ছুটে-যাওয়া গতি, কোথাও একটা ঘূর্ণি, কোথাও জলে ভাসা শ্যাওলা। আর দেখলাম রুকায়ার রুমালটা। তুলে নিয়ে এলাম। ঐটা হাতে নেওয়ার পর কান্না এলো। কামালের জন্যে কেঁদেছিলাম। আর আজ কাঁদলাম রুকায়ার জন্যে।

তখনই, মনে হয় কেউ একজন কোন সময় বললে, রুকায়া যখন জল খাচ্ছিল তখন গাছের ওপর থেকে রাইফেল ছুড়েছে যে লোকটা সে পাকিস্তানি হানাদার, নাম আবদুল কাদের, ইলেভনথ্ এ কে ডিভিসনের সেপাই; টাস্ক ফোর্স বারামুলা

ব্রিজ, নম্বর ৩২৬৩১। আরও বললে, প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে ওরা এসেছিল।

* * * *

ফেরার আগে কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই পামপোরের ময়দানে, জাফরাণ ক্ষেতের আলের ধারে। রুকায়ার সংবাদ ও জানত না, আমিই দিলাম, আর দিলাম ওর আঠারো বছরের আসল লক্ষ্য—ছেঁড়া পাকিস্তানি ফ্ল্যাগটা। কি ওর হাতে তুলে দিলাম তা শুধু ওই জানে—মুক্তি না মৃত্যু?

॥ দুই ॥

গোড়ার কথা

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ আর পাকিস্তানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ভারতের সামরিক অভিযান আজ লাহোর আর শিয়ালকোট সেক্টারের গোলাগুলি থেকে মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক সংসদে গালাগালির পর্য্যায়ে নেমেছে। এ ছাড়া পাকিস্তানের আর পথ ছিল না। মাথা যাদের নিচু হয় গলাটা উঁচু করা তাদের স্বভাব—বিশেষ ক'রে ভুট্টোর মতন যারা নিধিরাম সর্দার তাদের তো বটেই। ভারত পাকিস্তানের ভাগাভাগি নিয়ে মনের আনন্দে মাতামাতি করা বৃটেন এবং আমেরিকার জাত-ব্যবসা অতএব ভুট্টোর গালাগালির সঙ্গে গলা বাজিয়ে তারাও চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছে। আমেরিকা চালাক তাই চুপ করে আছে। বৃটেন বোকা তাই অযথা ব'কে মরছে।

সারা বিশ্বে ভারত পাকিস্তান আর চীন নিয়ে চুলচেরা বিচার চলেছে, সিক্যুরিটি কাউন্সিলে তর্কের ঝড় উঠেছে, পররাষ্ট্রসচিবদের চোখে ঘুম নেই আর আমাদের নেই শান্তি। সংসদের সীমানা পেরিয়ে একটু তাকালেই দেখা যাবে যে রাশিয়া, বৃটেন আর আমেরিকার কূট-নৈতিক সভায় ইন্দো-পাকিস্তানের আপোষ-নিষ্পত্তির সূত্র ধরে বর্তমান কূটনৈতিক দলাদলির কিছু ওলোট-পালটের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। ভুট্টোর হুমকি, ডলারের হাঁকাহাঁকি আর ছোট্ট গলায় লাল বাহাদুরের হর্যক্ষ মতবাদ, চীন কিছুটা পেছিয়ে গিয়ে চুপ ক'রে শুনছে, রাশিয়া শুনে হাসছে

আর মাঝে মাঝে ছোটখাটো মন্তব্যের আড়ালে বড় ধরণের পরিবর্তনের পথ খুঁজছে আর সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ছোটখাটো দেশগুলো সময় হ'লে কার কাঁধে ভর করবে, মুখ বুজে তাই ভাবছে। এতদিন এবং এখনও সারা পৃথিবীতে বলতে গেলে দুটোই দল আছে: আমেরিকা আর রাশিয়া। ভারতের যা দাবী আর ভুট্টোর যা দাপাদাপি তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে পুরোণ দল ভেঙে নতুন দল গ'ড়ে উঠেছে: এসিয়া ও য়ুরোপ। বৃটেন এবং আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে পুষ্যি নিয়ে নেয়—যেটা ভুট্টোর আব্দার আর ওদের ইচ্ছে তাহলে এটা হ'তে বাধ্য এবং এই পরিবর্তন আনবে ভারত।

সারা বিশ্বের এই আমূল পরিবর্তনের মূল কারণ হল কাশ্মীর। আর এই নতুন ইতিহাসের সুচনা ক'রেছে কাশ্মীরি। তারা জাতে মুসলমান কিন্তু জীবনের আধারে ওরা সত্যিকারের মানুষ। ঠিক মত বুঝতে হলে ওদের গোড়ার ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

কাশ্মীরের গোড়ার কাহিনী হল এক কিম্বদন্তি। শোনা যায় সেই প্রাচীন কালে, আজ যেটা কাশ্মীর উপত্যকা, সেটা ছিল মস্তবড় দ্বীপ আর সতী সেই দ্বীপে নৌকা বিহার করতেন ব'লে দ্বীপের নাম ছিল সতীসার। এই দ্বীপের চারিধারের পাহাড়ে থাকত পিশাচ, যক্ষ আর নাগ। আর তাদের অত্যাচারে কোন মানুষই সতীসারের আশেপাশে বাস করতে পারত না। কথাটা কানে উঠল মরিচীর ছেলে প্রজাপতি কাশ্যপের। তিনি পিশাচপতী জলোদ্ভবকে যুদ্ধে আহ্বান করার আগে বসে গেলেন ধ্যানে। তাঁর ধ্যানে মুগ্ধ হ'য়ে ব্রহ্মা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন আর সেই সংবাদ শোনামাত্র জলোদ্ভব পাহাড় ছেড়ে লুকিয়ে পড়লেন সতীসার দ্বীপের জলের তলায়। কাশ্যপ তখন উপায়ান্তর না দেখে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন এবং বিষ্ণু তাঁর ধ্যানে মুগ্ধ হ'য়ে বারামূলার

কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্যে ফুটো ক'রে দ্বীপের সব জল বের ক'রে দিলেন। পিশাচপতী জলোস্তব তখন আত্মরক্ষার জন্যে করলেন পাতাল প্রবেশ। প্রজাপতি কাশ্যপ যখন হাজার বছরের চেষ্টাতেও আর তাকে খুঁজে পেলেন না, তখন সতী এলেন তাঁর সাধনায় মুগ্ধ হ'য়ে সাহায্য করতে। তিনি ময়নার রূপ ধরে মুখে ক'রে আনলেন একটা ছোট্ট পাথর আর ফেলে দিলেন তাক করে ঠিক জলোস্তবের মাথার ওপর।

সেই যে পাথর সতী ফেলেছিলেন সেইটা বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠল একটা পাহাড়। আগে সেই পাহাড়টাকে বলা হত সারিকা পর্বত কিন্তু হিন্দু রাজাদের আমলে তার নাম হল হরি পর্বত। এখনও তাইই আছে। বলা বাহুল্য, সতীর কৃপায় কৃতজ্ঞ হ'য়ে প্রজাপতি কাশ্যপ ঐ পাহাড়ের ওপর যে মন্দির গড়েছিলেন, আজও সেটা হিন্দুদের তীর্থস্থান আর মুসলমানেরা মন্দির মানেনা ব'লে সতীর ময়না রূপকে তারা আজও শ্রদ্ধা করে। দ্বীপের জল বেরিয়ে যাওয়ার পর যে জমি পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হল কাশ্যপমার অর্থাৎ কাশ্যপের আবাস, আর এ কাশ্যপমারের বর্তমান রূপ হল কাশ্মীর।

জলোস্তবের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রেবতী পিশাচদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন দ্বীপের উত্তরে হরমুখ পাহাড় ছেড়ে হিমালয়ে। আজও নাকি তারা সেইখানেই আছে এবং তথাকথিত 'য়েতি' (YETI) নাকি ঐ রেবতীরই বংশধর।

এই ধরণের গল্প দিয়েই কলহন্ তাঁর পৃথিবী-খ্যাত কাশ্মীর ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' লিখতে আরম্ভ করেন ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে। ওঁরই রচনা থেকে জানা যায় যে দু'হাজার বছর ধ'রে বাহান্নজন হিন্দু রাজার রাজত্বের পর খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সনে মহারাজ অশোক কাশ্মীর জয় করেন এবং শ্রীনগরীতে তাঁর রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের শ্রীনগরী ছিল বর্তমান শ্রীনগরের প্রায় তিন মাইল দূরে,

শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের ওপাশে। তিনি কাশ্মীরের আরও অনেক উন্নতি সাধন করেছিলেন। কিন্তু সত্যিকারের উন্নতির সাধনা ক'রেছিলেন রাজা কনিষ্ক।

রাজত্ব লাভ করেই কনিষ্ক দেখলেন বৌদ্ধধর্মে ভাঙন ধ'রেছে আর হিন্দুধর্ম আবার নতুন ক'রে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্ম-বিদ্বেষী তিনি ছিলেন না ঠিকই কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পরাজয় তিনি মানতে রাজি নন। অতএব, বৌদ্ধধর্মের দিকে প্রজাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তিনি নানান জায়গায় বৌদ্ধ বিহার তৈরি করলেন, বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী প্রজাদের নানান রকম সুখ সুবিধাও দিতে আরম্ভ করলেন এবং ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সমস্ত পৃথিবী থেকে পাঁচশোজন বাছা বাছা পণ্ডিত এনে ছ'মাসব্যাপী এক বৌদ্ধ সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। এই তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের পাঁচশো পণ্ডিত সাড়ে তিন লক্ষ শ্লোক রচনা করলেন। সেই সব শ্লোকের অনুলিপি গেল দেশ থেকে দেশান্তরে আর আসলগুলো তামার পাতে লিখে পুঁতে রাখা হল মাটির তলায় কোন এক গোপন স্থানে। চীনা পরিব্রাজক হিউন সাং নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু 'হিন্দু পণ্ডিতদের ভয়ে' কোথায় যে ওগুলো পোঁতা আছে তা বলেন নি। প্রায় দু হাজার বছর এর কোন সন্ধানই কেউ জানতো না। গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিব্বত থেকে এক সন্ধানী লামার দল এসে জানালো যে, জায়গাটার নাম নাকি 'কুন্দলবন বিহার'। কিন্তু ও নামে কোন জায়গা কাশ্মীরে নেই। ওরা ব্যর্থ হয়ে চলে যাওয়ার পর প্রায় দুশো বছর ও নিয়ে আর কেউ মাথাই ঘামায়নি। ১৯২৫ সালে কবি মেহজুর পুরোণ ইতিহাসের পাতা উল্টে আবার নতুন ক'রে তার সন্ধান আরম্ভ করলেন এবং বর্তমান কাশ্মীর সরকার তাঁরই সন্ধানের ওপর ভিত্তি ক'রে খনন কার্য্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করেছেন।

কনিষ্কের পর থেকেই বৌদ্ধ রাজত্বের ভাঙন ধরে এবং সপ্তম

শতাব্দিতে হুণরা কাশ্মীর অধিকার ক'রে নেয়। ওঁদের নেতা মিহিরকুল ছিলেন হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসকারী। শোনা যায়, উনি নাকি পীর-পঞ্জল এলাকায় এক পাহাড়ের ওপর থেকে একশোটা হাতিকে এক সঙ্গে নিচে গড়িয়ে ফেলে মজা দেখেছিলেন। সেই জন্যেই পাহাড়টার নাম হস্তিভঞ্জ।

হুণদের পর আবার হিন্দুরা অধিকার করলেন কাশ্মীর আর অশোকের শ্রীনগরী তিন মাইল সরে এসে হল শ্রীনগর। আজকের শ্রীনগরে যে সাতটা ঝিলাম-সেতু আছে তার প্রথমটা তৈরি করেছিলেন হিন্দুরাজা প্রবরসেনা। তাঁর পরই এলেন ললিতাদিত্য। ইনি শাসনের চেয়ে শোষণই বেশী করতেন বলে আবার পতন আরম্ভ হল হিন্দু রাজত্বের এবং শেষ হিন্দুরাজা মহারাণী দিদ্দা। সুলতান মহমুদ গজনীর প্রবল আক্রমণ বহুবার প্রতিরোধ করা সত্বেও তিনি রাজত্ব রাখতে পারলেন না। গজনীর ষড়যন্ত্রে বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মন্ত্রীর হাতে দিদ্দা নিহত হওয়ার পরই রাজত্ব ভেঙে খান খান হ'য়ে গেল আর সেই সুযোগে জম্মুর রাজা রামসিংহ দেও কাশ্মীর অধিকার ক'রে নিলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাহাড় পেরিয়ে তুর্কীরা এসে উপস্থিত হল। রাজা রামসিং রাজধানী ছেড়ে পালালেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিব্বতী মন্ত্রী রনচেন সিং সিংহাসন অধিকার ক'রে হ'য়ে গেলেন মুসলমান। ইনিই কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান এবং মুসলমান রাজা সদ্‌র-উদ্দীন।

এ পর্যন্ত কাশ্মীরে ছিল তুটো ধর্ম, বৌদ্ধ ও হিন্দু। রাজা সদর-উদ্দীন নিজে মুসলমান হ'য়েই বললেন,—'হও মুসলমান আর না হয় দাও মাথা।' দেখতে দেখতে তু'বছরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম লোপ পেল, অধিকাংশ হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালালো আর যারা রইল তারা হয়ে গেল মুসলমান। এটা হল ছ'শো বছর আগেকার কথা। এলাহাবাদের কাশ্মীরি সম্প্রদায় হ'লেন ঐ পলাতকের দল।

১৪২০ সালে রাজা হলেন সুলতান জয়নুল আবেদিন। উনি

রাজা হয়েই দেখলেন যে, সদর-উদ্দীন আর তার পরবর্তী রাজা শাহমীরের উৎপাতে দেশে সত্যিকার মানুষ বলতে একটিও নেই। শিক্ষিত সমাজ চলে গেছে আর অশিক্ষিত মানুষগুলো হয়েছে মুসলমান। কাশ্মীরকে আবার নতুন ক'রে গড়বার জন্যে উনি হিন্দু পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন বিদেশ থেকে, জিজিয়া কর তুলে দিলেন আর শাহমীর যে সব মন্দিরগুলো ভেঙে তছনছ ক'রে ফেলেছিল সেগুলো আবার নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে হুকুমের সঙ্গে টাকাও দিলেন দু'হাতে। ওঁরই আমলে সংস্কৃত আবার প্রচলিত হল এবং যাঁরা ফার্সী ও সংস্কৃত দু' ভাষাতেই পারদর্শিতা দেখাতে পারলেন তাঁরা টাকা পেলেন সঙ্গে জমিদারিও পেলেন। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের ওপর যে মন্দির খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে জালুক রাজা তৈরি করেছিলেন সেটা জয়নুল আবেদিন আবার নতুন করে গড়লেন আর হরি পর্বতের মাথায় কাশ্যপের তৈরী সতী মন্দিরেরও আমূল সংস্কার করলেন। হিন্দু মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের এই সমন্বয়ের পরই উনি মন দিলেন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সমন্বয়ের কাজে। দেশ দেশান্তর থেকে শিল্পী এলো, সঙ্গীত সাধক এলো, সংস্কৃত পণ্ডিত এলো, ফার্সীর উলেমা এলো আর এলো সাধু-সন্ন্যাসী আর পীর-পয়গম্বর। আরম্ভ হল সাংস্কৃতিক সম্মেলন, শিক্ষা সংগঠন আর ধর্ম সমন্বয়ের সাধনা সংসদ। জয়নুল আবেদিন নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলে ধর্ম সমন্বয়ের কাজ আরম্ভ করলেন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে; ধ্রুপদের ধারায় ফার্সী গানের নতুন যে প্রচলন হল ওঁর প্রচেষ্টায় তারই পরবর্তী ফল হল 'সুফিয়া কলম'। ওদিকে, শিক্ষা সংসদের মধ্যে দিয়ে উনি আরও একটা নতুন জিনিষ শুরু করলেন—হিন্দু পণ্ডিতদের বললেন, সংস্কৃত ভাষায় ফার্সী গ্রন্থ অনুবাদ কর আর ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করালেন বেদ উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ। দেখতে দেখতে ইসলাম এবং হিন্দু দর্শনের সংযোগে এক নতুন ধারার প্রচলন হল, যেটাকে

বলা চলে কাশ্মীরের 'ভক্তি যোগ'। মধ্য এশিয়ার মস্ত বড় পীর সৈয়দ আলি হামদানি এই ভক্তি যোগের প্রথম প্রবর্তক এবং ওঁর বহু শিষ্য আর শিষ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যা লালেশ্বরী আজও কাশ্মীরের ঘরে ঘরে পুজো পান। মুসলমানরা ওঁকে বলেন 'লাল দেদ' অর্থাৎ লাল দিদিমা। তাঁর পরেই হলেন হিন্দুদের নন্দ ঋষি, আসলে যিনি মুসলমানদের শেখ নুরুদ্দিন। জয়নুল আবেদিনের পর বহু রাজা এসেছে, বহু রাজত্ব ভেঙেছে গ'ড়েছে কিন্তু তাঁর আমলের হিন্দু-ইসলাম ধর্ম সমন্বয়ের এই যে সাধনা তা আজও পরিপূর্ণ ভাবে প্রচলিত আছে। ঐ লাল দেদ, ঐ নন্দ ঋষির সুর ধরেই গতকালের কবি মেহজুর পাকিস্তানের প্রথম আক্রমণের সময় গেয়ে গেছেন:

'…কে শত্রু আর কে বন্ধু তোমার দেশের
মনে প্রাণে জেনে নাও সব।
প্রতিটি কাশ্মীরি জাতে ও জীবনে এক,
তারা মানুষ, শুধু মানুষ
মিলে যাও তোমরা দুধ ও চিনির মতন।
হিন্দু ধরবে হাল, মুসলমান বাঁও দাঁড়
আর দেশের তরীকে আনো শান্তির কিনারায়…

আরও গেয়েছিলেন তিনি:

' দেখেছি সেখানে আমি হিন্দু ও মুসলীম
নত করে মাথা তারা একই সত্যের বেদীতে
'প্রেমময়' শহরের সংবাদ—এর চেয়ে ভালো
আর আমি কি দিতে পারি ?…'

সাড়ে পাঁচশো বছর ধ'রে আবেদিনের হিন্দু মুসলীম একতা আজও অটুট আছে, কখন কোথাও একদিনের জন্যেও তাতে ফাটল ধরেনি। কাশ্মীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সাতদিন আগেও আমি দেখেছি তা আমাদের

ভারতের ইতিহাসে কোনদিন ছিল না এবং কোনদিন হবে বলেও আমার মনে হয় না। আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যতই সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের অমোঘ বাণী থাক না কেন আর সেক্যুলারিজম্ নিয়ে আমরা যত বড় বড় কথাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি না কেন, সাম্প্রদায়িক উৎপাত আমাদের দেশে হয়েছে, এবং হবে। ১৯৩১ সালের ঢাকার দাঙ্গা থেকেও যদি হিসেব করা যায় তাহলেও দেখা যাবে যে আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত শুধু দাঙ্গায় যত লোক মরেছে, তুটো ইন্দো-পাকিস্তান হানাহানিতেও তা মরেনি। দোষ কার সেটা বড় কথা নয়, আমাদের নৈতিক দুর্দশাটাই আমার বক্তব্য।

আজকের কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা নব্বই জনেরও বেশী কিন্তু আজ পর্যন্ত কখন ধর্ম সংঘাতের একটাও ঘটনা ও দেশে ঘটেনি—যখন পাকিস্তান 'আল্লাহো আকবর' হুঙ্কার দিয়ে সারা কাশ্মীরে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা করেছিল, তখনও না। ১৯৪৭ সালে প্রথম পাকিস্তানি হামলার সময় চার লক্ষ কাশ্মীরি মুসলমানের রাস্তা ছিল তুটো, হয় পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে আর 'আল্লাহো আকবর' ব'লে ধনী হিন্দুদের লুঠতরাজে জাঁদরেল অংশীদার হওয়া আর না হয় পাকিস্তানের প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো। আমি তখন ব্যক্তিগত ভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম বলেই জানি যে যদি সারা কাশ্মীরের কোন এক কোণেও একজনও কাশ্মীরি ধর্মের ডাকে সাড়া দিত তাহলে সারা কাশ্মীরে একটিও অ-মুসলমান আর প্রাণে বাঁচতে পারত না। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি হামলাদারদের পৈশাচিক অত্যাচার থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের পুরো পরিবারকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে এমন বহু মুসলমানের ইতিহাস কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে সত্যিকার 'সেক্যুলারিজম্' আছে কাশ্মীরে। ওটাই হল মানব জাতির পীঠস্থান। আর, প্রত্যেকটি কাশ্মীরি হল তার অনৈক্য পূজারী।

॥ তিন ॥

আমার কথা

কাশ্মীরে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগার তিন দিন আগে আমি অনেকটা ভাগ্যের চক্রান্তেই কাশ্মীরে গিয়ে পড়ি আর সাময়িক ভাবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিনদিন পর কলকাতায় ফিরেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে কাশ্মীরিরা ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে আর স্তব্ধ আবেগভরা শ্রদ্ধায় আমি তাদের জীবন মরণের খেলা দেখেছি—তাদের হাসতে হাসতে মরতে দেখেছি আর মরতে মরতে হাসতে দেখেছি। আর দেখেছি ওদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা ভারতের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অভাবনীয় অভিযান—মৃত্যুকে পদে পদে অবজ্ঞা ক'রে জীবনকে জয় করা। হানাদারদের আক্রমণ থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়েছে কাশ্মীরি, আর্মড পুলিশ আর সাদেকের নেতৃত্ব।

'আমি' মানুষটার কথা বাদ দিলে, কল্পনার খেয়াল খুসী খুব বেশী এ কাহিনীতে নেই। ইতিহাস মানুষেরই সৃষ্টি কিন্তু তার মূল কথা হল ঘটনা প্রবাহ। সব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে দেখার সৌভাগ্য কোন মানুষের হয়না, আমারও হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। আমার কর্মক্ষেত্র থেকে কাশ্মীর কম ক'রে আড়াই হাজার কিলো মিটার দূর। কাজেই, আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে আগে এবং পরে যে সব ঘটনার সমাবেশ এ বইতে ঘটেছে, সেগুলো প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে শুনে নিজেকে মাঝখানে বসিয়ে নিজের ভাষায় গুছিয়ে বলার জন্যে যেটুকু স্বাধীনতার প্রয়োজন তার বেশী আমি নিইনি, নেওয়ার প্রয়োজনও হয়নি। গত আঠারো বছর ধরে

দিনের পর দিন কাশ্মীরে যা কিছু ঘটেছে, কিছুটা আমাদের নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ও মূর্খতায়, কিছুটা ওখানকার প্রাক্তন নেতাদের নৈতিক অবনতির জন্যে আর বেশীটা সাধারণ মানুষের বাঁচার তাগিদে এবং যার ওপর ভিত্তি ক'রে আজকের এই ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধ, তার ইতিবৃত্ত উপন্যাসের চেয়ে মনোরম, রহস্য রচনার চেয়ে রোমাঞ্চক, চোরা কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ। বাস্তবের সেইটাই বোধ হয় আসল ধর্ম।

একটা ছোট্ট জাতির জীবনে এই সব ঘটনাবলীর একটা খুব বড় অথচ বেদনাদায়ক দিক আছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা এমন আছে যা যতই অভাবনীয় হ'ক না কেন কাশ্মীরের ইতিহাসে কোনদিনই তারা স্থান পাবে না। ভারতের ইতিহাসে তো নয়ই। ইতিহাসের পাতায় মূলতঃ, সন তারিখের সমাবেশ আর মহামানবদের ভীড়, সেখানে ছোটখাটো মানুষদের ত্যাগ ও সাধনার ইতিবৃত্ত অচল ও অনাদৃত; তাদের সমূহ স্থানাভাব। কাশ্মীরের প্রাক্তন শের-এ-আজম শেখ আবদুল্লাহ যতই ঘৃণ্য অন্যায় আর ক্ষমতার জঘন্যতম অপব্যবহারই করে থাকুন না কেন এবং তাঁরই জন্যে কাশ্মীর আমরা হারাতে বসলেও, কাশ্মীরের ইতিহাসে তিনি কায়েমি আসন জুড়ে থাকবেনই। কিন্তু কাশ্মীরের এক হারাণো প্রান্তের সামান্য মেষপালক ফকীর মহম্মদের জীবনের শেষ সাত দিন যতই অভাবনীয় হক না কেন, কেউ কোনদিন হয়ত তা শুনবেও না, বুঝবেও না, জানবেও না। কাশ্মীর এলাকায় এক লাখ আন্দাজ ভারতীয় সৈন্য এবং সেই বাবদ প্রায় প্রতিদিন এক কোটি টাকা ব্যয় সত্বেও ঐ এক অজানা অচেনা ফকীর মহম্মদের জন্যেই কাশ্মীর আজও আমাদের আছে এবং আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে সেটা ভারতের অপরিহার্য্য অংশ হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর নিয়ে পণ্ডিতজী যতই মাতামাতি ক'রে থাকুন না কেন, পনেরো বছর চেষ্টা করেও প্রত্যেকটি ভারতবাসীর প্রাণের

এতটা কাছে কাশ্মীরকে উনি কোনদিনও আনতে পারেননি। ফকীর মহম্মদ প্রাণ দিয়েছে, যীশুর মতন ক্রুশে ঝুলেছে, আর আবার যদি আমাদের শাসনতন্ত্র মূর্খের মতন ঝিমিয়ে না পড়ে তাহলে বলা যায় কাশ্মীরকে সে পাকিস্তানের কবল থেকে চির-কালের জন্যে বাঁচিয়ে গেছে। প্রত্যেক কাশ্মীরি এবং কাশ্মীরকে যারা ভালোবাসে তারা সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, শেখ আবদুল্লাহের চেয়ে মেষপালক ফকীর মহম্মদ অনেক বড় এবং আরও অনেকখানি শ্রদ্ধার পাত্র। অথচ, ইতিহাসে তার স্থান কোনদিনই হবে না কারণ মানুষটা সে ছিল সামান্য, নগণ্য, অজানা ও অচেনা। পাকিস্তানি হানাদার আসার আগে কেউ তাকে জানত না, চিনত না আর কাশ্মীরে পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটিয়ে শেষ হানাদার যেদিন নিশ্চিহ্ন হবে সেদিন বড় বড় নেতাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যস্ততায় সবাই তার কথা নিঃসন্দেহে ভুলে যাবে। সাধারণ মানুষের এইটাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। সে ইতিহাস সৃষ্টি করে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় কখন স্থান পায় না। কাশ্মীরের ইতিহাসে মকবুল শেরওয়ানি স্থান পায়নি, কর্ণেল শর্মা স্থান পাননি, ফকীর মহম্মদও পাবে না।

কাশ্মীরের সঙ্গে আমার যোগ, সময়ের মাপকাটিতে আঠারোয় পা দিল। পাকিস্তান যেদিন পরোক্ষভাবে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল হানাদার পাঠিয়ে, তার চারদিনের মধ্যে আমি সেখানে গিয়েছিলাম ভারত সরকারের আদেশে, বেতারের কাজে। কাশ্মীরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সেই আমার প্রথম পরিচয় ও চিরকালীন প্রেম। দু'বছর পর আবার গিয়েছিলাম সরকারি বেতার দায়িত্বের আরও কিছু গুরুভার নিয়ে। কাজটা শ্রীনগরের ধারে কাছেই সারা যেত খুব সহজে আর শেখ আবদুল্লাহের পরোক্ষ নির্দেশও ছিল তাই, কিন্তু কাজের উৎসাহে আর প্রকৃতির প্রাণ-প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে কর্তব্যের সীমানা টেনেছিলাম সীমান্ত রেখার

ধার পর্যন্ত—যেটা আমার উচিতও ছিল। সেই অপরাধে তিন মাসের মধ্যেই আমায় কাশ্মীর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল শেখ আবছুল্লাহের কাছ থেকে 'পাকিস্তানি গুপ্তচর' হওয়ার অপবাদ মাথায় নিয়ে। উনি চাননি যে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ওঁর কার্যকলাপের নমুনা দেখি কিন্তু ওঁর ইশারায় বোঝানো ইচ্ছাকে আমি হেলায় অবজ্ঞা করেছিলাম। ওঁর নির্দেশকে আমি অমান্য করেছিলাম।

ওঁর সন্দেহজনক কার্য্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে আমার যে রিপোর্ট বেতার অধ্যক্ষ লকস্মনন সাহেব ছিঁড়ে ফেলেছিলেন যে রিপোর্ট পড়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দিল্লীর জমে যাওয়া শীতের এক শেষ রাত্রে লোদি গার্ডেনে প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে আমায় বলেছিলেন 'আমি যতদিন আছি তোমার ভয় নেই, যখন থাকবোনা তখন ভগবানকে ডেক', এবং যে বিপোর্টের জন্যে সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই আমি বেতারের পাকা চাকরি ছেড়ে চলে আসা মনস্থ ক'রেছিলাম, সেই রিপোর্টের সত্যাসত্য আমার চাকরি ছাড়ার তিন বছরের মধ্যেই সপ্রমাণিত হয়েছিল শেখ আবছুল্লাহের গ্রেপ্তারে। সেদিন আমার চাকরি ছাড়ার জন্যে ছুঃখ হয়নি, আবার বেতারে ফিরে যাওয়ার যে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ এসেছিল তা প্রত্যাখ্যান করতে কষ্ট হয়নি এবং কাশ্মীরের প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি। সত্যের সংগ্রামে অন্ন সংস্থানের পাকা পুঁজি হারালেও, মান হারাইনি। মন তো হারাইনিই।

আসলে খুসীই হ'য়েছিলাম। যে সরকারের কাছে সততা আর নিষ্ঠার মূল্য নেই, তাদের ‍ নুন খাওয়া আর বিষ খাওয়ার মধ্যে প্রভেদ কোথায়? তার চেয়ে না খেয়ে মরা অনেক ভালো।

ভাগ্যের ভাগাভাগিতে আঠারো বছর পর, কাশ্মীরের দ্বিতীয় এবং সম্ভবতঃ শেষ সঙ্কটময় মুহূর্তে আবার আমায় ওখানে যেতে

হয়েছিল কাশ্মীর সরকারের আমন্ত্রণে ছবি করার কাজে। প্রথম যখন গিয়েছিলাম এ'বছরের জুন মাসের শেষ প্রান্তে তখন জানা ছিল না যে কিছু ধনী কাশ্মীরি, কিছু বেইমান ভারতীয় নেতা আর কিছু প্রাক্তণ দেশদ্রোহী কাশ্মীরি নেতাদের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে পাকিস্তান, সারা দেশ জুড়ে, তলায় তলায় আগ্নেয়গিরি গড়ছে। এবার গিয়ে সেই আগ্নেয়গিরির অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই আটকে পড়েছিলাম। তার জন্যে অবশ্য মনে আমার ভয়ও ছিল না, ভাবনাও ছিল না। সহরের একঘেয়ে জীবনের মধ্যে মনের যে অপমৃত্যু ঘটে, আর কিছু না হক অন্ততঃ তার থেকে অনেকখানি পরিত্রাণ পাওয়া গিয়েছিল। মরবার ভয় ছিল না ঠিকই, কিন্তু বেঁচে ফেরার ভরসাও খুব ছিল না! আমার বন্ধু এবং আমাদের দোভাষী ছবির সহকর্মী বলরাজ সাহানির শ্রীনগরের সেরা পল্লী ওয়াজীরবাগের দু'মহলা বাড়ির তিনতলার কোণের ঘরে জানালায় দাঁড়িয়ে দু'দিন অনবরত আর একটানা কামানের গর্জন শুনেছি আর বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে মুখ বাড়ালেই আকাশ ছোঁওয়া পপলার গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাইফেল. স্টেন গান আর হাত বোমা দিয়ে খণ্ডযুদ্ধ দেখেছি রামবাগ ব্রীজের এধারে ওধারে। এ যুদ্ধ সৈন্যের সঙ্গে সৈন্যের যুদ্ধ নয়, আধুনিকতম মার্কিনী অস্ত্রে সুসজ্জিত শত্রু-সৈনিকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম; মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার অভিযান; দেশদ্রোহি নেতাদের নৈতিক অবনতির কারণে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের জীবন মরণ সংগ্রাম। ডান দিকের বন্ধ জানালার কাঁচ ভেঙ্গে রাইফেলের দুটো বুলেটও বিছানার এসে পড়েছে, বাইরে বেরিয়ে ঐ সহজ সরল কাশ্মীরিদের জীবনযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবার আকুল আহ্বান জানিয়ে। আমার আগে পিছে টান নেই তাই সামনে যেতে ভয়ও খুব একটা নেই। হয়ত নেমেই যেতাম যদি না বলরাজ বাধা দিতো। ওই বললে,

ভেতো বাঙালীর বাহুবলের চেয়ে বুদ্ধিবল অনেক বেশী, অতএব যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা না বাড়িয়ে যারা প্রাণ দিয়েও সাধারণ ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত আর বৃহত্তর ইতিহাসে অনাদৃত র'য়ে গেল তাদের কথা লিখতে। তাই লিখতে বসলাম।

আমার চারিধারে যা কিছু ঘটেছে এবং আজ হাজার মাইলের সীমান্ত রেখা জুড়ে যা ঘটছে, এর কিছুই একদিনে ঘটেনি, দিনে দিনে গ'ড়ে উঠেছে। কাজেই এর পেছনে একটা মস্তবড় ইতিহাস আছে যার মূলে আছে অতীতের জয়নূল আবেদিন, লাল দেদ, নন্দ ঋষি, হাবা খাতুন, আর্নিমাল, মেহজুর; আছে বর্তমানের শেখ আবদুল্লাহ, গুলাম মহম্মদ, পণ্ডিত নেহেরু, কৃষ্ণ মেনন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আর আছে যাদের নাম কেউ কোনদিন শোনেনি, হয়ত শুনবেও না, যেমন মকবুল শেরওয়ানি, কর্ণেল শর্মা, ওসমান, ফকীর মহম্মদ, আর যার জীবন ঘিরে এই কাহিনী—রুকায়া আহমেদ। ঘটনাপ্রবাহের ঐতিহাসিক বিবরণীতে নামের উল্লেখ থাকলেও প্রাণের স্পন্দন থাকে না তাই ও পথ ছেড়ে এই দৈনন্দিনের পথ ধরলাম। তার আরও একটা মস্ত কারণ হল যাদের কথা লিখতে ব'সেছি তারা অতি সাধারণ মানুষ, তাদের মন আছে, জীবনকে তারা ভালোবাসে, আর কাশ্মীর দেশটা তাদেরই। সঠিক তাকে সব কিছু জানতে হ'লে তাদের সবটুকুই জানা দরকার। ঐতিহাসিক ধারায় সেই প্রাণের স্পন্দনটুকু বাদ প'ড়ে যেটুকু বাকি থাকে তা নিতান্তই প্রাণহীন, তুচ্ছ।

যাদের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই কাশ্মীর পরিক্রমা, নানান কারণে তাদের কয়েক জনের নাম গোপন করতে বাধ্য হ'য়েছি; বিশেষ ক'রে তাদের, যারা আমায় দেশদ্রোহী নেতাদের ষড়যন্ত্র, ভারতীয় শাসনতন্ত্রের নির্বুদ্ধিতা আর সামরিক বিভাগের অসাবধানতার তথ্য জুগিয়েছেন। নাম প্রকাশে তাঁদের জীবনের আশঙ্কা আছে। সেখ আবদুল্লাহ, বক্সি, মির্জা আফজল বেগ প্রমুখ

কাশ্মীরের দেশদ্রোহী নেতাদের পার্শ্চর গুপ্তচর আর গুণ্ডার দল শ্রীনগর ছেয়ে আছে। তাদের সহায়তায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তারা আজ মরিয়া হ'য়ে মরণ কামড় দেওয়ার আশায় ওৎ পেতে আছে। এদের নাম প্রকাশ করা মানেই তাদের ইন্ধন জোগানো।

ভারতীয় সামরিক বিভাগের দিক থেকেও তাদের বিপদের অন্ত নেই। 'সুরক্ষিত' দেশে সাত হাজার লোক সাড়ে সাতশো টন গোলাবারুদ আর আধুনিকতম মার্কিনী অস্ত্র নিয়ে যে রাতারাতি আসতে পারেনা তা নিতান্ত গণ্ডমূর্খও বোঝে। আরও মারাত্মক কথা হল যে এই সাত হাজার পাকিস্তানি হানাদারদের মধ্যে কম ক'রে দু হাজার লোক আমাদের সামরিক বিভাগের 'সজাগ' দৃষ্টি এড়িয়ে সরাসরি একেবারে চলে এসে ছিল শ্রীনগরের মধ্যে ; তারা শুধু গোলাবারুদের গুদামই গড়েনি বেশ কয়েকটা সুরক্ষিত ঘাঁটিও তৈরি করেছিল। এ সবই যে আমাদের শাসন ব্যবস্থার গলদ আর সামরিক বিভাগের অসাবধানতার কারণেই সম্ভব হয়েছে এ তথ্য প্রচার করার যে দায় ও দায়িত্ব, নাম প্রকাশ করলে তার সবটাই ওদের মাথায় চাপবে। সেটা আমারই থাক। দেশ আজ এক হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ব'লেই আমাদের সৈনিকরা মরতে ভয় পায়না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মৃত্যুর বেদনা যেমন আমাদের, জয়ের উৎসও তেমনি আমরাই, দেশের শাসনতন্ত্র নয়। এইটাই আমার বলার কথা।

এই লেখার মধ্যে 'আমি' ব'লে যে মানুষটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তার মাঝখানে আমি আর চারিপাশে অন্য স্বতন্ত্রের সমষ্টি। তবে, এর মাঝখানের আমি সে জরাজীর্ণ শহুরে জীবনের আধমরা মানুষ নয় তা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। ঘটনার বিপর্যয়ে মানুষ বদলায় এটা আমার জানা ছিল কিন্তু রাতারাতি তার যে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হ'তে পারে তা ভাবিনি।

আমার মধ্যে এ পরিবর্তন আগে কখন দেখিনি, ভবিষ্যতে আর কখন হয়ত দেখবও না। যতদিন চার দেওয়ালি সংসারের বিরাট ফাঁকির বাঁধন ছিল ততদিন মায়া মোহ আর মিথ্যা বেড়াজালের মধ্যে দাঁড়িয়ে কখন ভাবতেই পারতাম না যে জীবনে মৃত্যুও আছে। তারপর নাম আর টাকায় অন্ধ, আমার চারিপাশের মানুষদের ঘৃণ্য নৈতিকতার মধ্যে যখন আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা পড়লাম তখন প্রতিপদে মনে হত জীবনের মৃত্যু কেন ঘটে না? আবার একদিন যখন আমার মধ্যেকার আসল মানুষটা হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আমার মনের হাত ধ'রে ঐ নোংরা পচা আবহাওয়া থেকে টেনে বার ক'রে এনে পথে দাঁড় করিয়ে দিল, তখন মুক্তির আস্বাদে মৃত্যুর কামনা কোথায় যে নিঃশেষে হারালো তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। এমনি ভাবে নানান পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে আমি নানান রূপে পেয়েছি, পরখও ক'রেছি কিন্তু এবারকার মতন এমন নবীন উৎসাহে কখনও নিজেকে নিঃশেষে হারাইনি। জানলায় দাঁড়িয়ে যত ঐ সহজ সরল গ্রামবাসীদের জীবন যুদ্ধ দেখেছি তত নিজেকে নতুন ক'রে পেয়েছি, বুঝেছি, অনুভব ক'রেছি। ব্রেন, ষ্টেন আর এল. এম. জির মৃত্যু উদ্‌গারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা শুধু হাতে এগিয়ে গেছে নিজের দেশকে ধর্মান্ধ দানবের হাত থেকে বাঁচাবে ব'লে তারা আমার মনকে নতুন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছে। সেদিন যে কোন মুহূর্তে আমি ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম; ওদেরই মতন 'কাশের জিন্দাবাদ' আর 'হামলা-আওয়ার খর্বদার' বলে আকাশ ছোঁওয়া হুঙ্কার দিয়ে মেসিন গানের ওপর স্বচ্ছন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম। আজ শহরের আনন্দ কোলাহলে আর পাখার তলায় ব'সে সে কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না! সেদিন আমার নিজের কাছে আমি নিজেই একটা অদ্ভুত অচেনা মানুষ হ'য়ে উঠেছিলাম যে আগে কখন ছিল না, হ'য়ত আর কখন তার

এতটুকুও আমার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। না যাক, ক্ষতি নেই; যে সত্য আমার মধ্যে সজীব হ'য়ে উঠেছিল আর যে স্মৃতি আজও মন ছেয়ে আছে তার মেয়াদ যত অল্পই হক না কেন তার বিরাটত্ব অসীম, তার বৈশিষ্ট্য অভূতপূর্ব। কাশ্মীরকে ভালোবাসা আমার জীবনে সার্থক হ'য়েছে।

আরও একটা কথা। এটা আজকের কাশ্মীরের ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত হলেও এতে যেমন অতীতের ইতিহাস আছে তেমনি ভবিষ্যতের সত্যটুকুও ছড়ানো আছে। আপাতদৃষ্টিতে আজকের সংঘর্ষ পাকিস্তানের সঙ্গে হলেও মূলতঃ এটা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কাশ্মীরিদের চিরকালীন লড়াই সেটা যার সঙ্গেই হক, যখনই হক আর যেখানেই হক। সাম্প্রদায়িক জঘন্যতায় যে লড়াই বাঁধে তার নৃশংসতা ঔরংজেবের আমলে যা ছিল, আয়ুবের আমলেও তাইই আছে, বদলায়নি, বদলাবেও না। কাশ্মীরিরা আজকের লড়ায়ে প্রাণ দিয়ে এইটাই চিরকালের জন্যে কবি মেহজুরের ভাষায় নতুন করে প্রমাণ করতে চাইছে যে :

> '......মন্দিরেই যাও আর মসজিদেই যাও
> গির্জাতেই যাও কিম্বা গুরদোওয়ারাতে
> যেতে হবে সেই একই দরজার মধ্যে দিয়ে...

ধর্মের আধারে এটা যেমন সত্য, মানবতার আধারেও তেমনি, আরও একটা সত্য আছে, যেটা জ্যোৎস্না বাঁধানো ঝিলামের বুকে শীকারায় শুয়ে শুয়ে রুকায়া ব'লেছিল :

'একটা জিনিষ আমি বুঝতে চাই কিন্তু কেউ সেটা বলতে পারে না। এই জীবন....এই তার আরম্ভ। অন্তহীন সৌন্দর্য্যের জন্যে ঐকান্তিক সাধনা দিয়ে আমরা জীবন শুরু করি আর মনে করি আমার মধ্যে আমি অসীম, আমি নিঃশেষ, আমি পরিপূর্ণ। হঠাৎ হাজার মাইল দূর থেকে কার খামখেয়ালের আঘাতে সেটা একদিন থেমে যায়। আমার সে ক্ষতিতে কারো কিছু যায় আসে

না। ওরা যে নিঃসাড় তা নয়, আসলে ওরা বোঝেই না যে ওদের জন্যে আমি ঠিক কি হারালাম। বোঝা উচিৎ...'

মুখ ঘুরিয়ে উপুড় হ'য়ে ঝিলামের জলে চাঁদনির ঝিনুক কুড়োবার চেষ্টা করতে করতে রুকায়া আবার বলে...

'আসলে আমি নিজেই বুঝি না, সেটা কি...সেটা কেন...'

কিন্তু শুরু থেকেই আরম্ভ করা যাক, বুঝতে সুবিধে হবে, ওকে আমাকে আর কাশ্মীরকে।

চার

অতীত পরিক্রমা

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে, ১৮১২ সালে জম্মুর রাজা রণজিৎ দেওর এক চরিত্রহীন বংশধর, গুলাব সিং, কাকীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করার অপরাধে দেশ থেকে বিতাড়িত হন। যাবার সময় তিনি কাকাকে শাসিয়ে গিয়েছিলেন যে জম্মুতে তিনি আবার ফিরে আসবেন—কাকীর জন্যে নয়, সিংহাসনে বসবার জন্যে।

জম্মু তখন মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের পাঞ্জাব রাজত্বের ঠিক অংশ না হলেও অনেক রকম সাহায্যের জন্যে বহুলাংশে নির্ভরশীল। গুলাব সিং গিয়ে যোগ দিলেন মহারাজার সৈন্যদলে সামান্য সৈনিক হিসেবে। একে রাজবাড়ির ছেলে, তায় দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ, পাঞ্জাবী মহারাজার নজর পড়তে সময় লাগল না। অল্প কিছুদিন মহারাজার পার্শ্বচর থাকার পরই উনি হ'য়ে গেলেন সেনানায়কদের মধ্যে অন্যতম আর বছর কয়েক যেতে না যেতেই একেবারে সৈন্যাধ্যক্ষ। এই সময় রজৌরির রাজা হঠাৎ রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়লেন জম্মু অধিকার করার উদ্দেশ্যে। গুলাব সিং গিয়ে তাঁকে সায়েস্তা করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বসলেন জম্মুর গদীতে। এটা হল ১৮২০ সালের কথা। বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে মানুষ ছাড়া আর কথাই বলেনা, রাজা হ'য়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তেমনি গুলাব সিংও চাইলেন রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে উনি চালিয়ে গেলেন যুদ্ধ—যখন যেদিকে ইচ্ছে, আর এদিকে রজৌরি থেকে আরম্ভ ক'রে ওদিকে বালটিস্থান, স্কার্দু, লাদাক পেরিয়ে লোক পাঠালেন তিব্বতে

পর্যন্ত। তিব্বতে পৌঁছোবার আগেই এদিকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লাগল শিখদের যুদ্ধ ১৮৪৫ সালে। মহারাজ রণজিৎ সিং তখন বছর ছয়েক হল মারা গেছেন। তাঁর বংশধরেরা সাহায্য চাইলেন গুলাব সিংয়ের কাছে। কারণ শিখেদের মধ্যে উনিই তখন একমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ যিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে সমানে যুঝতে পারেন। লাহোরের শিখ দরবারও ওঁকে ডাক দিল আর উত্তর পাওয়ার আগেই ওঁকে বানিয়ে দিল শিখ সৈন্যদের সর্বময় কর্তা। উনি বুঝলেন ব্রিটিশ সৈন্য আটকানো সহজ কথা নয় আর রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ চট ক'রে ছাড়াও উচিৎ নয়। উনি ব্রিটিশদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ ক'রে, যাবো যাচ্ছি ব'লে যুদ্ধটা এড়িয়ে গেলেন। ১৮৪৬ সালের সোবরাও-র শেষ যুদ্ধে শিখ সৈন্য যখন হেরে গেল, আর লাহোর গেল ব্রিটিশের হাতে তখন উনি শিখ সৈন্যদের সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে গিয়ে বসলেন সন্ধি করতে। ছুটো সন্ধি হল। 'লাহোর সন্ধি' অনুযায়ী বিপাশা থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত সব জায়গা শিখরা বাধ্য হলেন ব্রিটিশদের হাতে তুলে দিতে আর গুলাব সিংয়ের সঙ্গে বৃটিশদের গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী 'অমৃতসর সন্ধি' হল গুলাব সিং আর বৃটিশদের মধ্যে যার ফলে কাশ্মীর আর গিলগিটের একাধিপত্য গেল গুলাব সিংয়ের হাতে পঁচাত্তর লাখ টাকার বিনিময়ে। জম্মু, কাশ্মীর আর গিলগিট নিয়ে গুলাব সিং হলেন মহারাজা, একাধিপতি এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন।

গুলাব সিংয়ের তৃতীয় পুরুষে হলেন মহারাজা প্রতাপ সিং। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গোবেচারি শান্ত মানুষ। কাজেই ওঁর মাথায় গাঁট্টা মেরে ব্রিটিশ উপদেষ্টা এসে বসল কাশ্মীরে আর ধূর্ত ব্রিটিশ উপদেষ্টা প্লাউডেন মহারাজার সই জাল ক'রে রাজ্যভার তুলে দিলেন ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত এক মন্ত্রীসভার হাতে। কার্যতঃ কাশ্মীরের শাসনভার চ'লে গেল ব্রিটিশ সরকারের হাতে। এই

জাল চিঠি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন কলকাতার এক দৈনিক সংবাদপত্র যে বৃটেন আবার রাজ্যভার মহারাজার হাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কাশ্মীর নিয়ে বৃটেনের এই প্রথম অপমানসূচক পরাজয় যা আজও ওরা ভুলতে পারেনি।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাজ ওরা মনের মতন ক'রে গুছিয়ে নিয়েছিল। গিলগিটে একটা বেশ বড়সড় দুর্গ তৈরি ক'রে ব্রিটিশ সৈন্য সেখানে ভ'রে দিয়েছিল। কাশ্মীর গেল, কিন্তু গিলগিটের আধিপত্যটা থেকেই গেল। কাশ্মীরে ওদের উপদেষ্টার আসনটাও কায়েমি রইল।

প্রতাপ সিংয়ের কোন ছেলে ছিল না ব'লে ওঁর মৃত্যুর পর মহারাজা হ'লেন ছোট ভাই অমর সিংহের ছেলে হরি সিং। বিলেতে মানুষ হ'য়েছিলেন ব'লেই বোধ হয় সাদা চামড়ার প্রতি ওঁর টান ছিল পুজো করার সামিল। উনি যখন প্রথম রাজ্যভার পান, তখন বয়সে কিছু কাঁচা ছিলেন বলে শাসন আরম্ভ করেন পাকা প্রজাবৎসল রাজার মতন। বছর দু'চারের মধ্যেই হাসপাতাল বানালেন, স্কুল খুললেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন আর রাজার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে যাকে তাকে খাটিয়ে নেওয়ার 'বেগার' প্রথা তুলে দিলেন। মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আগে পর্যন্ত সারা দেশে জমির সত্বাধিকারী ছিলেন রাজা আর প্রজারা ছিল, যাকে বলা যায় ভাড়াটে। প্রতাপ সিং ও প্রথাটা বদলাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু শেষ করেন নি। হরি সিং সেটা বদলে দিলেন। এটা হল ১৯৩০ সালের কথা।

১৯৩০।৩১ সালে যখন সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের ঝড় উঠল, শেখ আবদুল্লাহ্ তখন সবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে এম. এস. সি. পাশ করার পর স্কুল মাষ্টারি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। উনি দিল্লীতে এসে দেখা করলেন মৌলানা

আজাদের সঙ্গে আর ওঁরই কথামত সোজা চ'লে গেলেন কাশ্মীর। সেখানে তখন অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরি আরম্ভ না হ'লেও পণ্ডিত আনন্দ কল আর শিখ সর্দ্দার বুধ সিং মহারাজ হরি সিংকে দেশের শাসনভার সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। ওঁদের বলার কথা ছিল যে মহারাজা গদীতে ঠিকই থাকবেন কিন্তু দেশ শাসন করবে প্রজা-প্রতিনিধি নিয়ে গড়া মন্ত্রীমণ্ডল আর অমৃতসর সন্ধি অনুযায়ী বৃটেন যে পূর্ণ স্বাধীনতার চুক্তি মেনে নিয়েছিল সেটা আবার পুরোপুরি বলবৎ ক'রে বৃটিশ উপদেষ্টাকে দেশ থেকে হটিয়ে দিতে হবে। যুক্তি যে অকাট্য সন্দেহ নেই কিন্তু সাহেব-ভক্তিও মহারাজের অসীম। উনি বৃটিশ উপদেষ্টার পরামর্শ চাইলেন। তিনি সাত দিনের মধ্যে হাজির ক'রে দিলেন একজন সিভিলিয়ান মন্ত্রা, দু'জন বৃটিশ পুলিশ অফিসার আর শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলীম কনফারেন্স! বলতে গেলে আন্দোলনটা রাতারাতি দুভাগে ভাগ হ'য়ে গেল আর সেই সুযোগ নিয়ে মহারাজা গুলি বর্ষণ আরম্ভ করলেন একেবারে নিরীহ অসহায় কাশ্মীরি জনসাধারণের ওপর। আনন্দ কল আর বুধ সিং এটা চাননি যে কাশ্মীরি জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাঙন ধরুক আর এটাও বুঝলেন যে ওঁরা যদি দু'দলে ভাগ হ'য়ে যান তাহ'লে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের ভাগাভাগির বিষ, ভারতের মতন কাশ্মীরেও ছড়াবে। ওঁরা তাই শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মুসলীম কনফারেন্সকে সামনে এগিয়ে দিলেন। কাশ্মীরে বৃটিশনীতির এটা দ্বিতীয় পরাজয়। এই পরাজয়ের শোধ তুললেন মহারাজা নিজে। তিনি নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন না, গরীবদের ভাতে মারতে আরম্ভ করলেন। প্রজাদের সুবিধার জন্য যে সমস্ত সংস্কার হ'য়েছিল রাতারাতি সবই রদ হ'য়ে গেল, রাজার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটিয়ে নেওয়ার 'বেগার' প্রথা আবার নতুন ক'রে শুরু হ'য়ে গেল, নতুন

নতুন ট্যাক্স বসল আর রাজার টহলদারি সৈন্য স্টেটের ফ্ল্যাগ আর ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে বাজারে ঘুরতে আরম্ভ করল। সারা দেশে নিয়ম হ'য়ে গেল ঐ ফ্ল্যাগ দেখলেই মাথা নোয়াবে আর যে এ আইন অমান্য করবে তার মুখ মাটির ওপর ঘ'ষে দেওয়া হবে আর চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তার তুলে দেওয়া হবে।

শেখ আব্দুল্লাহ সাম্প্রদায়িক দল ক'রেছিলেন ঠিকই কিন্তু মহারাজার এই দাপটটা কল্পনা করেন নি। দেশের লোকও ওঁর এই দলাদলিটা অনুমোদন করল না। কবি মেহজুর আন্দোলনের প্রথম আরম্ভতে অগ্রণী ছিলেন কিন্তু শেখ আবদুল্লাহ-র ঐ 'মুসলীম' কথাটায় ঘোর আপত্তি তুলে পুরোপুরি স'রে দাঁড়ালেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ রাজনীতির কিছুই জানত না, কবি ব'লে তারা মেহজুরকে পীরের মতন ভালোবাসতো এবং ওঁরই গানের সুর ধ'রে তারা আন্দোলনে এগিয়ে ছিল। কবি যেমনি স'রে এলেন তারাও অমনি পিছিয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক ভাঙন ধরানোর বৃটিশ পরিকল্পনা আর একবার ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে উপদেষ্টা সাহেব আর এক নতুন চাল চল্‌লেন যাতে জনসাধারণের আপত্তি সত্বেও শেখ আবদুল্লাহ-র মুসলীম কনফারেন্স দাঁড়িয়ে যায়। উনি মহারাজকে উপদেশ দিলেন যে দেশের সব নেতাদের গ্রেপ্তার কর, তারপর শেখ আবদুল্লাহর মুসলীম কনফারেন্সের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি ক'রে নেতাদের ছেড়ে দাও আর অত্যাচার বন্ধ ক'রে প্রজা-সভার প্রবর্তন ক'রে দাও! তাইই হল। মহারাজা প্রজা-সভার প্রবর্তন করলেন কিন্তু ঠিক হল যে সভার সদস্য রাজপক্ষ নির্বাচিত করবেন!

বিজয়ের তকমা এঁটে শেখ আবদুল্লাহ-র মুসলীম কনফারেন্স মুজাহিদ মঞ্জিলে নিশান ওড়ালো কিন্তু দেশের মানুষের মন টলল না। বৃটিশ উপদেষ্টার নির্দেশ মতন থেকে থেকেই উনি নানান রকম আন্দোলন করলেন আর প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

জানিয়ে প্রজা-সভার কিছু সদস্য নির্বাচনের অধিকারও পেয়ে গেলেন কিন্তু দেশের মানুষ ওঁর ডাকে কিছুতেই সাড়া দিল না। কবি মেহজুর তো স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে যতদিন 'মুসলীম' কথাটা নামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ততদিন উনি কোন সম্পর্কই রাখবেন না। বাধ্য হ'য়েই শেখ আবদুল্লাহ সাম্প্রদায়িকতার সুর ছেড়ে জাতীয়তার জেহাদ শুরু করলেন ১৯৩৯ সালে। 'অল জাম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর মুসলীম কনফারেন্স' নাম পালটে হল 'জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্স'।

এই পরিবর্তনেরও একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ এর শেষ ভাগে শেখ আবদুল্লাহ গিয়েছিলেন খাঁন আব্দুল গাফার খাঁর সঙ্গে দেখা করতে তাঁরই নিমন্ত্রণে। সেখানে ওঁর দেখা হয় পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে। দলের নামে 'মুসলীম' কথাটার তাৎপর্য্য কি এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি বলেন 'কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা নব্বই জন আর ধর্মের নামে সাড়া দেওয়া মুসলমানদের মজ্জাগত স্বভাব! খাঁন সাহেবই ওঁকে বুঝিয়েছিলেন যে এটা ঠিক নয়, এটা বৃটিশ কুমন্ত্রণা আর 'ভাগ ক'রে ভেঙে দেওয়ার' নীতি। পণ্ডিতজী বুঝিয়েছিলেন যে রাজার সঙ্গে লড়াই প্রজাদের হওয়া উচিৎ ধর্মের নামে নয়।

নাম থেকে 'মুসলীম' কথাটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে নেমে এলো জাতীয়তার সংগ্রাম আর ১৯৪৪ সালে যেদিন 'নয়া কাশ্মীর' আন্দোলন শুরু হল গুলাম মহম্মদ সাদেকের পরিকল্পিত শাসন সংস্কারের নিশান উড়িয়ে সেদিন কাশ্মীরে 'সাম্প্রদায়িক ভাগ ক'রে দেশের ভাঙন ধরাণো' বৃটিশ নীতি চিরকালের জন্যে শেষ হ'য়ে গেল। নয়া কাশ্মীরের পরিকল্পনানুযায়ী পঞ্চায়েৎ থেকে আরম্ভ ক'রে রাজ্য শাসন পর্যন্ত সবই পরিচালিত হবে জনসাধারণের নির্বাচন প্রথায় এবং বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে যে চাষ করবে তাকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। যে শতকরা

নব্বই জন ধর্মের ডাকে সাড়া দেয়নি তারা সব্বাই এসে দাঁড়ালো শেখ আবদুল্লাহ-র পেছনে আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালো দুমুঠো খেয়ে বাঁচার তাগিদে। দু'বছরের মধ্যে দুশো বছরের আলস্য শেষ হ'য়ে গেল, আর ১৯৪৬ সালে দুদিনের মধ্যে দশ হাজার লোক গগন ভেদি চিৎকার ক'রে বলল, 'কাশ্মীর ছাড়ো'।

১৯৪৬ সালের এই 'কুইট কাশ্মীর' আন্দোলন শুধু বৃটিশের বিরুদ্ধেই নয়, এটা মহারাজার শাসনতন্ত্রেরও বিরুদ্ধে। ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বলল, একশো বছর আগেকার 'অমৃৎসর সন্ধি' সন্ধি নয়, বিক্রির দলিল। গরু ছাগল মানুষ বিক্রি করতে পারে, জমিও পারে কিন্তু মানুষ মানুষকে বিক্রি করতে পারে না। বৃটিশ সরকারের কোন অধিকার ছিল না দশ লক্ষ লোককে পঁচাত্তর লক্ষ টাকায় বিক্রি করার! অতএব সন্ধির ঐ বিকৃত দলিল সভ্য সমাজে অচল!

ব্যাপক আন্দোলন সুরু হল রাতারাতি। সারা দেশে সাড়া পড়ে গেল। ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের প্রত্যেকটি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল আর বৃটিশ উপদেষ্টার হুকুমে মার্সাল ল' জারি হ'য়ে গেল। নির্দেশ হল, দেখো আর মারো! কাশ্মীরে বৃটিশ শাসনতন্ত্রের এইটাই মরিয়া হ'য়ে শেষ মরণ কামড়। পণ্ডিতজীও গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন। সেইটাই কাশ্মীরের কুক্ষণ।

১৯৪৭ এর আগষ্টে ভারত ভাগ হল। তার তিনমাস আগে লর্ড মাউন্টব্যাটেন গেলেন হরি সিংয়ের সঙ্গে দরবার করতে শ্রীনগর। মহারাজ জানতেন মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য, তাই তিনদিন নানান অজুহাতে উনি দেখা করাটাই এড়িয়ে গেলেন। উনি চেয়েছিলেন ভারতে যোগ দিতে কিন্তু মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য ছিল ওঁকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার। ভারতের গভর্ণর জেনারেল তো আর সে কথা সরাসরি বলতে পারেন না, অতএব জহর-বন্ধু ঘুরিয়ে নাক দেখালেন। উনি মন্ত্রণা দিলেন যে কাশ্মীরের

যা ভৌগোলিক পরিস্থিতি তাতে পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, কোন দিকেই যাওয়া সমীচীন হবে না, স্বাধীন থাকাই ভালো। তাহ'লে দেশটা পাকিস্তানের মুঠোয় থাকবে কারণ কাশ্মীরের সব কিছুই তখন রাওলপিণ্ডির পথেই কাশ্মীরে যেত। আর নেহাৎ যদি কোন রাজ্যে যোগ দিতেই হয় তাহ'লে তার আগে জনমত সরকারি ভাবে জানা দরকার। তাহ'লেও পাকিস্তান ভুক্তি অনিবার্য্য কারণ মুসলমানের সংখ্যা শতকরা নব্বই জন। আর ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ার আগে ভোট নেওয়া হ'লে ফলটা যে তাই হত তা অনস্বীকার্য্য।

মহারাজ বাধ্য হ'য়ে বললেন 'জো হুকুম' আর মাউন্টব্যাটেন নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এলেন দিল্লী। তার সাতদিনের মধ্যেই জিন্না সংবাদ পাঠালেন শ্রীনগরে যে মহারাজ যদি পাকিস্তানে যোগ দেন তাহ'লে তাঁর স্বাধীনতা পুরোপুরি বজায় থাকবে। মহারাজার প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক হলেন বৃটেনের জামাই। ওঁর স্ত্রী মেমসাহেব! তিনি বললেন সেই ভালো, কিন্তু মহারাজার তো তা ইচ্ছে নয় অতএব কাক এলেন দিল্লী মাউন্টব্যাটেনের মতামত নিতে। ঠিক হল যে সাময়িকভাবে স্বাধীনতা বজায় রেখে সই হবে 'ষ্ট্যাণ্ড স্টিল এগ্রিমেন্ট' অর্থাৎ আপাততঃ যা আছে তাই থাক। জিন্না রাজি হ'লেন কারণ মাউন্টব্যাটেন ইতিমধ্যেই জনমত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সর্দার প্যাটেল বললেন, 'ওসব হবে না, মনস্থির কর।' মহারাজা একটু জোর পেয়ে কাককে দিলেন ছাড়িয়ে আর রাজবন্দীদের দিলেন ছেড়ে। উনি জানতেন শেখ আবদুল্লাহ-র হাতে রাজ্যভার তুলে দিলে পণ্ডিজী কাশ্মীরকে লুপে নেবেন।

এর অল্পদিন আগেই পণ্ডিতজীকে মহারাজা গ্রেপ্তার করেছিলেন বলে ওঁর মনে পণ্ডিতজীর প্রতি একটা ব্যক্তিগত ভয় ছিল তবে ভরসা ছিল যে শেখকে রাজ্যভার দিলে পণ্ডিতজী খুসীই হবেন।

কাশ্মীরের এই পরিবর্তন দেখে জিন্না পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে

কাশ্মীরের সমস্ত মাল যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন আর যা মাল ছিল সব আটক ক'রে ফেললেন। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যও পাঠিয়ে দেন দেশটাকে জোর করে দখল ক'রে নিতে কিন্তু জেনারেল অকিনলেক বুদ্ধি দিলেন যে সেটা ঠিক হবে না কারণ খোলাখুলি সৈন্য পাঠালে ভারতও পাঠাবে আর তার ফলে যুদ্ধটা লেগে যাবে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে! অতএব এলো হানাদার, অর্থাৎ সেই সৈন্যই এলো কেবল পোষাক বদল ক'রে। প্ল্যান হল যে আক্রমণটা মোজাফারবাদ আর জম্মু এই দুদিক দিয়ে হবে যাতে ২৫ তারিখে ঈদের দিন শ্রীনগরে জিন্নাসাহেব নমাজ পড়তে পারেন!

আরম্ভ হল আক্রমণ। ২২ অক্টোবর ১৯৪৭। মহারাজার সৈন্য ছিল কিন্তু খুবই সামান্য। তারা ক্রমেই পেছু হটতে আরম্ভ করল। বিনা যুদ্ধে জয়ের আনন্দে অধীর হয়ে পাকিস্তানি হানাদারেরা ভাবল যুদ্ধ যখন করতেই হবে না তখন লুঠতরাজে আপত্তি কি? আরম্ভ হল ব্যাপক লুঠতরাজ। এই সুযোগে মহারাজার সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং শ্রীনগরকে বাঁচাবার জন্যে ঘাঁটি গড়লেন উরিতে, পাকিস্তানি হানাদাররা সেইখানে এসে আটকালো পুরো দুদিন।

ইতিমধ্যে ২৩ তারিখে মহারাজা সাহায্য চাইলেন ভারতের কাছ থেকে। মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে ২৫ তারিখে পাকিস্তানি হানাদার শ্রীনগর দখল করবে, কাজেই উনি ভেবেছিলেন যে সাহায্য না দিয়ে ২৫ তারিখটা পেরিয়ে গেলে ভাবনার আর কিছু থাকে না। অতএব উনি সাহায্য পাঠাতে বাগড়া দিলেন, বললেন অ্যাকসেশন না হওয়া পর্যন্ত সাহায্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ২৩শে এইভাবে পেরিয়ে গেল আর ওদিকে হানাদাররা পৌঁছোল উরি। সেখানে ওদের পথ আটকালেন ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং! পণ্ডিতজী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত, অতএব ইচ্ছে থাকলেও সর্দার প্যাটেলের কোন সহজ রাস্তা নেই। তবু যখন উনি জোর করলেন

তখন মাউন্টব্যাটেন বললেন সাহায্য করার কথা ভাবার আগে প্রত্যক্ষভাবে জানা দরকার যে পরিস্থিতিটা আসলে কি। অতএব ঠিক হল ভি. পি. মেনন যাবেন পরিস্থিতি যাচাই করতে। ফলে আরও একটা দিন গেল। ২৫ তারিখ ভোরে মেনন সাহেব গেলেন শ্রীনগর। সেদিন সন্ধ্যায় সংবাদ পাওয়া গেল যে রাজেন্দ্র সিং সদলবলে নিহত হয়েছেন এবং পাকিস্তানিরা এসে পৌঁচেছে বারামূলা অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে ৩৯ মাইল দূরে! মেনন যদি মহারাজাকে ছেড়ে চলে আসেন তাহলে হানাদারদের হাতে ওঁর প্রাণ যাবে আর অ্যাকসেশনের কোন কথাই উঠবে না অতএব বুদ্ধি করে উনি মহারাজাকে পাঠিয়ে দিলেন জম্মু আর নিজে ফিরে গেলেন দিল্লী। সর্দার প্যাটেল ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এয়ারপোর্টে!

২৬ তারিখ সকাল বেলায় হানাদাররা রওনা হবে শ্রীনগরের পথে। ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের সামান্য কর্মি মকবুল শেরওয়ানি তখন বারামুলায়। উনি হানাদারদের বোঝালেন যে সোজা পথে রাজার সৈন্য আছে, অতএব সুবিধা হবে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আর শ্রীনগরে ঢোকার আগে এয়ারপোর্টটা দখল করা কারণ ভারতের সৈন্য আসবে ঐ পথেই! শেরওয়ানি ওদের বোঝালেন যে দিনের আলোয় না যাওয়াই ভালো কারণ লোক থাকলে যাওয়ার পথে লুঠতরাজের সুবিধা হবে না; তাছাড়া, ভোরবেলা শ্রীনগর দখল করায় কোনই অসুবিধা নেই! অতএব ঠিক হোল সন্ধ্যায় ওদের যাত্রা শুরু হবে। হানাদাররা মহা খুসী। সারাদিনটা ওরা পেল বারামূলায় আরও কিছু এবং আরও ভালো করে লুঠ করবার!

রওনা হতে কিছু রাত হল। তারপর সারারাত এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে ঘুরে আর লুঠ করতে করতে হানাদাররা চলল মকবুল শেরওয়ানির পেছন পেছন। হিসেব করে মকবুল দেখিয়ে দিলেন যে ভোরবেলায় ওঁরা পৌঁছে যাবেন এয়ারপোর্ট আর সকালবেলায় শ্রীনগর। ভোর যখন হল তখন দেখা গেল ওরা আবার সেই

বারামূলাতেই ফিরে এসেছে। চায়ের দোকানের যে থামে মকবুলকে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে ওরা তেরোটা গুলি মেরেছিল সেটা আজও আছে।

ওদিকে ২৬ তারিখ সকালেই মেনন সাহেব ফিরে এলেন জম্মু, দলিল নিয়ে, সই করাবার জন্যে। রাজার হুকুম ছিল, মেনন সাহেব যদি আসেন, ঘুম থেকে তুলবে, আর যদি না আসেন তাহলে রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। মেনন সাহেব এলেন এবং দলিল সই করিয়ে নিয়ে গেলেন সেই দিনই। অধৈর্য্য আগ্রহে সর্দার প্যাটেল চ'লে এসেছিলেন এয়ারপোর্টে মেনন সাহেবের অপেক্ষায়। কাগজ নিয়ে সেখান থেকে সোজা গেলেন লাটভবনে। কাগজ পেয়ে মাউন্টব্যাটেনের চক্ষু চড়ক গাছ। আবার বাগড়া দিলেন। সই করেছেন কিন্তু জনমত নেওয়ার কথা লেখা নেই। অতএব পণ্ডিতজীকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে আপাততঃ দলিলটা মেনে নেওয়া হলেও অবস্থা যখন ঠিক হবে তখন জনমত সরকারি ভাবে জেনে নেওয়া হবে।

এবার সৈন্য পাঠাবার পালা। সর্দারজী হুকুম দিলেন আজই পাঠাও। মাউন্টব্যাটেন জানালেন সেটা অসম্ভব, একদিনে অত ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সামান্য কিছু সাহায্য পাঠানো যেতে পারে কিন্তু সেটা হবে মূর্খতা, যাদের পাঠানো হবে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আরও যদি একটা দিন দেরি করা যায়। বাধ্য হয়ে সর্দারজী পুরো দায়িত্ব নিজে নিলেন। কাশ্মীরে এটা হল বৃটিশ বদমায়েসির তৃতীয় পরাজয়।

২৭ সকালে যখন হানাদাররা আবার যাত্রা করল শ্রীনগরের পথে, বারামূলা থেকে, ঠিক সেই সময়ই দিল্লী থেকে যাত্রা করল ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরের পথে ড্যাকোটায় করে। ওদের প্রথম যুদ্ধ হল এয়ারপোর্টের ধারে।

শেখ আবদুল্লাহ সেইদিনই নিলেন কাশ্মীরের শাসন ভার। কাশ্মীরের ইতিহাসে আরম্ভ হল এক নতুন অধ্যায়।

॥ পাঁচ ॥

দোসরা সকাল

দিল্লী থেকে শ্রীনগরের আকাশ পথ বানিহাল পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যায় আর পৌঁছোতে লাগে প্রায় দুঘণ্টা। আগে ড্যাকোটায় ছাড়া আসা যেত না, আজকাল ফকারই বেশী। ভোর সাড়ে ছটায় দিল্লী ছেড়ে যখন প্রায় আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো, প্লেন-গৃহিনীর ব্রেকফাষ্ট খাওয়ানোর তাগাদায়, তখন ঝলমলে রোদ্দুরে হাজার দশেক ফিট নিচের এলানো ছড়ানো পাহাড়ের চূড়োগুলো মনে হচ্ছিল যেন কোন আধুনিক শিল্পীর খেয়ালখুসীর নীল সবুজের খেলা।

প্লেনে উঠলে আমার ঘুমের বহর যত বাড়ে বলরাজের তত বাড়ে নিতান্ত ছোট্ট ছেলের মত জানলা দিয়ে মুখ বাড়ানোর আনন্দ। নাকটা জানলার কাঁচের ওপর চেপে ও নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল কৌতূহলে আত্মহারা হ'য়ে। মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা যে ও করেনি তা নয়, আমি ইচ্ছে ক'রেই সাড়া দিইনি। অনেক নিচের ছোট বড় গ্রাম আর মাঝে মাঝে সহরগুলো আমার চোখে দেখতে যতই একই রকম লাগুক ওর কাছে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা আর প্রায় সবগুলোর নাম আর পরিস্থিতি ওর মুখস্থ। এ পথ দিয়ে যতবারই ওর সঙ্গে যাওয়া আসা করেছি, প্রতিবারই ওর এই অবাক হ'য়ে অতি পরিচিতকে আবার নতুন ক'রে দেখার এবং তার পূর্ণ বিবরণী দেওয়ার এই ছেলেমানুষী আনন্দ আমার যতই ভালো লাগুক, কোন বারেই আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে দিইনি। এবার প্লেনে ওঠবার আগে ও বারবার চেষ্টা করেছিল যাতে আমি জানলার ধারে বসি আর আমার কাঁধের

ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের ভূগোলের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটানোর জন্যে ওঁর রানিং কমেন্টরির সুবিধে ক'রে দি। ইতিমধ্যে তিন যাত্রায় ও বেচারা বিফল হ'য়েছে, এবার এড়িয়ে গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই হার প্রায় মেনেই ব'সছিলাম, বাঁচিয়ে দিল ওর অভিনয়ের সুনাম আর হিরো হওয়ার দুর্ভাগ্য। ওকে দেখা মাত্রই প্লেন গৃহিনীদ্বয় প'ড়ে যান আর কি! মহা সমারোহে ওকে স্বাগতম জানিয়ে জীবন সার্থক হওয়া সমাদরে ওকে সামলে নিয়ে বসিয়ে দিল জানলার ধারে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্লেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কফি এলো আর আমার এলো ঘুম।

প্লেন গৃহিনীর নরম সুরের ডাক আর গরম ব্রেকফাষ্টের গন্ধে চোখ খুলতেই বলরাজ বললে, 'ঠিক সময়ে উঠেছ, চটপট খেয়ে নাও, একটু পরই বানিহল।' ছোট্ট একটা 'হুঁ' ব'লে আর মস্ত একটা হাই তুলে ব্রেকফাষ্টে মন দিই। ক্ষিদে নয়, পুরোনো অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে গেল বলরাজের বুড়ো ভগ্নীপতি কানে যতই কম শুনুন আর গল্প যতই গুছিয়ে বলুন, খাওয়ার ব্যবস্থায় পুরো দস্তুর পাঞ্জাবী, কড়াই-র ডাল আর মটর পনীরো ছাড়া কথাই বলেন না। ও দুটোই আমার আবার ধাতে সয়না। ভূগোলের ব্যাপারে আদার ব্যাপারি হলেও খাওয়ার ব্যাপারে আমি রীতিমত নবাব। শ্রীনগরে আবার মাংসের সের পাঁচ টাকা আর মুরগীর তো ডাক শুনতেও পয়সা লাগে, মাংসের তো কথাই নেই।

বানিহল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বলরাজের বিবরণী শুরু হল। স-উৎসাহে নিচের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে ও বললে, 'ঐ সামনে বানিহল। ওটা পার হলেই শ্রীনগর একেবারে হাতের মুঠোয়।' তারপর হঠাৎ বললে, 'বাব্বা কি বিরাট সৈন্য সমাবেশ।' আমি না দেখেই মাথা নাড়লাম, মনটা আমার খাবারের দিকে। ও বললে, 'কাশ্মীরে আমাদের প্রস্তুতি একেবারে পুরোদস্তুর। পিঁপড়ে গ'লে যাবে এমন সাধ্য নেই!'

আঠারো বছর আগেকার পাকিস্তানের হানাদারি নৃশংসতা আমার সচক্ষে দেখা, বিশেষ বারামূলার কনভেন্টের মিশনারী নানদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার আর ওখানকার বাসিন্দাদের ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ওরা করেছিল তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। খেতে খেতে বললাম, 'সেইটাই উচিৎ। পাকিস্তানকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। সামান্য সুযোগ পেলেই ওরা এসে হাজির হবে। বিশেষ করে এখন।'

'কেন?' ও বললে 'এখন কেন?'

'শেখ আবদুল্লাহ আর বক্‌সি-র দল কিছু কম নয়। ওরা যে ওৎপেতে আছে সে তো সাদেক সাহেব নিজেই বলেছেন।'

'না!' বলরাজ বেশ জোর দিয়েই বললে 'সে প্ল্যান যদি পাকিস্তানের থাকত তাহ'লে হজরতের চুল চুরির সময় অরাজকতার সুযোগ নিয়ে সহজেই ওরা আসতে পারত। তাছাড়া, বক্‌সি গুলাম মহম্মদের পরও এখানে কম গোলমাল হয়নি, সেটাও খুব খারাপ সুযোগ ছিল না। আঠারো বছর যখন আসেনি তখন নতুন ক'রে আর ওরা আসবে না।'

কথাটা আমার মনে ধরল তাই চুপ করে গেলাম। ইতিমধ্যে আমরা বড়গাম এলাকার ওপর পৌঁছে নামবার জন্য নিচে এসেছি। বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ও জানলা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বললে: 'শ্রীনগরের বসতি এখন বড়গামে ছড়িয়েছে। এ অঞ্চলে এত লোক আগে কখন দেখিনি।' ওটা যে শ্রীনগরের বসতি নয়, পাকিস্তানের হানাদারি বেসাতি তা পরে জানা গেল।

বার দুই পাক খেয়ে প্লেন নামল শ্রীনগর এয়ারপোর্টে। তিন পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এই প্রকাণ্ড এয়ারপোর্টটা সহর থেকে সাত মাইল দূরে। জম্মু থেকে প্রায় দুশো মাইল দূর শ্রীনগর, বাসে আসতে লাগে প্রায় বারো ঘণ্টা। শীতকালের প্রচণ্ড বরফে বানিহাল যখন বারো ফুট বরফের তলায় ঢাকা তখন

মোটরপথ বলতে গেলে প্রায় বন্ধই হ'য়ে যায়। আগে হ'য়েই যেত বলে টানেলটাকে হাজার দুই ফুট নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। হলেও, অসুবিধার শেষ নেই। তাই ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের সহজ পথ হল আকাশযানে। সেই জন্যেই এই এয়ারপোর্টের প্রাধান্য ভারতের অন্য যে কোন এয়ারপোর্টের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ অবাক হ'য়ে দেখলাম ওখানে পাহারার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নেই। যে যখন যেখানে ইচ্ছে অবাধে যেতে পারে, জবাবদিহির প্রয়োজনই হয় না। কাঁটা তারের একটা ছন্নছাড়া বেড়া আছে আর তার গেটের ধারে ছেঁড়া সার্ট পরা বুড়ো সর্দারজী প্রসন্ন মনে দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। ওটা বোধহয় কোন রকমে ঘুম থেকে উঠে দুধ লস্যি খেয়ে আসার পর ঝাড়নের বদলে দাড়িতেই হাত মোছার পর্ব সমাধান।

আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সাদেক স্যাহেবের বড় ছেলে রফিক সাহেব। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে সিগারেট ধরাতেই বুড়ো সর্দারজী হাঁ হাঁ ক'রে উঠল। বোঝা গেল ওটা সরকারি বারণ নয়, ওর ধর্মের বিধান, সরকারের নাম ক'রে পুণ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করছিল। বলরাজ রফিক সাহেবের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, আর আমি জিনিষ সামলাবার জন্যে গিয়ে দেখি কয়েকজন মার্কিনী টুরিষ্ট মহাসমারোহে বিদায়ী ফটোগ্রাফ তুলছে ফটকের সামনে। এটা আরও তাজ্জব ব্যাপার। পৃথিবীর কোন এয়ারপোর্টেই বিনা অনুমতিতে ফটো তুলতে দেওয়া হয়না। কাশ্মীরে তখন ঠিক লড়াই না থাকলেও, কাশ্মীর নিয়ে লড়াই-র হুমকি আর সীমান্তে তার অল্পবিস্তর কিন্তু প্রাত্যহিক ঘনঘটা নিত্যই লেগে আছে। তা সত্বেও এই এয়ারপোর্টের মতন একটা বিশেষ জায়গায় কোন রকম বিধিনিষেধ না দেখে একটু খটকা লাগল। একজন হোমরা চোমরা লোককে কথাটা বলতেই তিনি এক গাল হেসে জানালেন, 'ওরা মার্কিনী টুরিষ্ট, আমাদের খদ্দের, তুলুক।'

এয়ারপোর্টের ধারে ধারে ক্ষেত। সহরের দিকে সাত পা গেলেই একধারে উঁচু-নিচু পাহাড়ে জায়গা, অন্যদিকে বড় বড় পপলার আর চিনার গাছের তলায় ঘন ঝোপের জমাট অন্ধকার। বেশ বড় সড় একদল লোক দিনের বেলাতেও বেশ স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। রাত্রিতে তো কথাই নেই। নেহাৎ তাগাদা দিয়ে না খুঁজলে পাওয়াই মুস্কিল। পাহাড়ের মধ্যে, পাশে ও ওপরে আঁজ খাঁজ অলি গলি অনেক আছে। আধুনিক যুদ্ধ অস্ত্র থাকলে এখান থেকে এয়ারপোর্টের ওপর যে কোন সময়, যেমন ভাবে ইচ্ছে আক্রমণ চালানো যায় এবং খণ্ড যুদ্ধ যদি বাধে তাহ'লে পাহাড়ের ওপর থেকে লোক সরানো নেহাৎ সহজ কথা নয়। এইভাবে প্রায় মাইল খানেক পথ গেলে তবে আবার ধানক্ষেত, আপেল আখরোটের বাগান, ছোট বড় কাঁচা পাকাবাড়ি আর সরকারি পরীক্ষাগার। এই সাত মাইল পথে কোথাও কিছু পাহারার ব্যবস্থা নেই, লোকজনের যাতায়াতও অল্প। কথার ফাঁকে বলরাজকে বললাম:

'কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের এতো হুমকি অথচ পাহারার কোন ব্যবস্থাই কোথাও নেই।'

রফিক সাহেব হেসে বললেন:

'দরকারও নেই। আকাশ পথ ছাড়া এয়ারপোর্টে পৌছোতে পাকিস্তানের লাগবে হাজার বছর। এখান থেকে হাঁটা পথে সীমান্ত হল কম ক'রে ৩০ মাইল আর চারিধারে আমাদের কড়া পাহারা।'

'সাবোটাজের লোকের তো অভাব নেই। আপনাদের বাড়ির বাথরুমে যদি টাইম বম্ব রাখতে পারে তাহ'লে এখানে শক্ত কি?'

হেসে রফিক সাহেব বললেন: 'সে কথা ঠিক, তবে বক্সি সম্প্রদায়ের বিষ দাঁত ভেঙে গেছে।'

'তাহ'লে আপনার বাবাকে মারবার প্রচেষ্টাটা কাদের?'

রফিক সাহেব কি ভাবলেন তারপর হেসে বললেন: 'ওদেরই!'

আমি আবার প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে প্রকাণ্ড ক'রে হারিয়ে ফেলি। বলরাজ সিনেমার নামকরা অভিনেতা হ'লে কি হবে, রাজনীতিতে ওর দখল আর বর্তমান অবস্থাটাকে পুরোপুরি বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে ওর কৌতূহল আমার চার জন্মের বাইরে। মুখ্যমন্ত্রীর বড় ছেলের কাছে থেকে যা জানা যাবে তার অথরিটি যে কোন সময় সে কোন লোকের চেয়ে অনেক বেশী, অতএব বলরাজ আর রফিক সাহেব রাজনীতিতে ডুব দিলেন। মাঝে মাঝে ভাসা ভাসা যে কথাগুলো কানে এলো তার সবটুকু আজ স্পষ্ট মনে নেই তবে একটা কথা রফিক সাহেব ব'লেছিলেন যা কানে ধ'রেছিল। উনি ব'লেছিলেন যে, শেখ আবদুল্লাহর পেটোয়া 'প্লেবিসিট ফ্রন্ট' আর বক্‌সি গুলাম মহম্মদের মোসাহেবদের দল প্রায় সর্বত্রই হার মেনেছে মীরকাশেম সাহেবের কংগ্রেস গঠনের প্রচেষ্টার কাছে এবং ভারত সরকার যদি আর কোন ভুল না করে তাহ'লে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সহজেই হ'য়ে যাবে।'

এয়ারপোর্ট থেকে পাঁচ মাইলের মাথায় রামবাগ ব্রীজ। সহরের এটা শেষ প্রান্ত আর সহরের ঠিক মাঝখান থেকে হিসেব করলে মাইল দুয়েকের বেশী নয়। শ্রীনগর ঘিরে আছে ঝিলাম নদী। তার বন্যা বন্ধ করার জন্যে যে খাল কাটা হ'য়েছে, এ ব্রীজটা তারই ওপরে এবং সহর ও এয়ারপোর্টের একমাত্র সংযোগস্থল। এ ব্রীজটা যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে এয়ারপোর্ট আর তার পাশের বড়গাম জেলা শ্রীনগর থেকে আলাদা হ'য়ে যায়। তাছাড়া, পাহাড় পথে সীমান্ত থেকে গুলমর্গ যেমন চট করে আসা যায়, তেমনি গুলমর্গ থেকে পাহাড় বেয়ে বড়গাম আসতেও কোন অসুবিধা নেই। অতএব, যুদ্ধের ব্যাপারে এই ব্রীজটার প্রাধান্য অনেকখানি।

ব্রীজ পেরিয়েই ডানদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার মাঝখান দিয়ে

সরু পিচ ঢালা রাস্তাটা রবীন্দ্র ভবনের সামনে দিয়ে গিয়ে পড়েছে একেবারে ওয়াজিরবাগের মাথার ওপর। ব্রীজ থেকে বলরাজের বাড়ি পাখীওড়া পথে মিনিট খানেক, গাড়িচলা পথে মিনিট তিনেক। ব্রীজ পেরিয়েই গাড়ি দাঁড়ালো চুঙ্গিখানার সামনে। রফিকসাহেব আমাদের রক্ষা কবচ, অতএব বিনা চেকিংয়েই পার পাওয়া গেল। যে সব লরী বাইরে থেকে আসে এবং ব্রীজ পেরিয়ে সহরে ঢোকে, এইটাই তাদের চেক্ পোষ্ট। খানাতল্লাসির পর ছাড়পত্র দিলে তবে তারা সহরে ঢুকতে পারে। সহরে ঢোকার প্রত্যেক রাস্তার মাথায় চুঙ্গিখানা আছে। এবং প্রত্যেক চুঙ্গিখানায় পুলিশ মোতায়েন আছে। এসব সত্বেও কম ক'রে আশী টন অস্ত্র আর গোলা বারুদ হানাদাররা সহরের মধ্যে এনেছিল! আর আনবে নাই বা কেন। ব্রীজে কোন রকম পাহারা নেই আর চুঙ্গিখানার সামনে কাশ্মীরি পুলিশ খালি পায়ে আর ছড়ি বগলে গাছের তলায় ব'সে চুল ছাঁটছিল! পাহারাদারি পুলিশের এমন পাহাড় প্রমাণ গাফিলতি জীবনে কখন দেখিনি!

কোন এককালে মহারাজের মন্ত্রীবর্গ এই পাড়ায় প্রাসাদ গ'ড়ে ছিলেন ব'লেই এর নাম ওয়াজিরবাগ। এখন পয়সাওয়ালা পাঞ্জাবীরা পাড়াটাকে বাহুল্যের তকমায় এঁটে রেখেছেন। দুমহলা বাড়ির তিন-তলার ওপর আমার ঘর। সহরের দিকে পেছন ফিরে আর প্রাকৃতিক ঔদার্য্যে চোখ মেলে ঘরটা আমারই মতন ছন্নছাড়া। ওপরে টিনের গড়ানো ছাদ আর চারিদিকে ইঁটের দেয়াল। জুলাই-র শেষে এখানে মশার উপদ্রব আরম্ভ হয় ব'লে বৃদ্ধ জামাইবাবু বেশ বড়গোছের একটা মিলিটারি মশারী আমার সরু নেয়ারের খাটে এমন আলু-থালু ঝুলিয়ে দিলেন যে মনে হল পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে মার শাড়ি পরেছে। মশারী টাঙানোর বহর দেখে আমি আর বলরাজ হেসেই খুন! তখন কে জানত, যে ঐ মশারীর জোরেই আমার বাঁচার মেয়াদ কিছু বৃদ্ধি পাবে!

শ্রীনগরের বাতাসে কি আছে জানিনা, বাড়িতে পা দিয়েই মনে হল সারা সকাল কিছুই বুঝি খাইনি। আর এক প্রস্থ খাওয়ার পর্ব শেষ হ'তে না হ'তেই মেহজুর সাহেবের ছেলে আমিন এসে হাজির। মেহজুরের জীবনী অবলম্বনে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ছবি হবে হিন্দি আর কাশ্মীরি ভাষায়। এতে বলরাজের যত উৎসাহ ওঁর তত লোভ। প্রায় ৩০ বছর ধ'রে বলরাজ ভারতের প্রায় সব পরিচালকের সঙ্গেই এ বিষয় কথা বলেছে কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা যে ওর অদম্য আশার সেই তরী ভিড়ল, আমার কর্মজীবনের ঠিক মাঝখানে এসে। আমিন এসেছে টাকার লোভে কিন্তু ভায়া জানেনা যে টাকা দেওয়ার আগে আমি তার সুদ আদায় ক'রে নেব। বললাম, 'চল, বড়গাম যাই!' আমিন কোন কথা বলার আগেই বলরাজ বেঁকে বসল। প্রস্তাবটা ওর একেবারেই মনঃপুত নয়। রাওলপিণ্ডিতে ওর জন্ম হলেও, মানুষ হ'য়েছে এই দেশের মাটিতে। এখানে ওর বাবা ছিলেন বিলেতি কাপড়ের জাঁদরেল আড়তদার আর সিগারেটের মূল পরিবেশক। লাহোর থেকে এম. এ পাশ করার পর ও বেশ কিছুদিন কাপড় কাঁধে দোকানে দোকানে ঘুরেছে বাবার ব্যবসায় আর গরীব সমাজে সেবার কাজের স্বপ্ন দেখেছে মনের তাগিদে। ওর ইচ্ছে ছিল ঝিলাম নদীর বাঁধ ধ'রে হেঁটে আসি সহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নয়ত নদীর স্রোতে ভেসে আসি যতদূর ইচ্ছে, যতক্ষণ মন চায়!

ওর কথায় আমি রাজি নই। এইখানের বাতাসে ঘরে থাকা দায় হয় ঠিকই কিন্তু তাই ব'লে সহরের মাঝখানে? মোটেও না। কাশ্মীরের মাটীতে পা দিলেই আমার মন চায় এক ছুটে সহরের বাইরে বেরিয়ে যাই, ধান ক্ষেতের ধার দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার পার দিয়ে একেবারে গ্রামের মাঝখানে।

আপত্তি তুলে বলরাজ বললে: 'সাতটায় রফিক সাহেবের বাড়িতে নেমন্তন্ন!'

'এখন তো সবে সাড়ে দশটা।'

অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল ও থাকবে আমি যাবো। সাতটার মধ্যে যদি আমি না ফিরি তাহ'লে রফিক সাহেবের বাড়ি ও চ'লে যাবে আর আমি সোজা সেইখানেই ফিরব। ও হেসে বললেঃ 'আসলে আমি জানি তুমি আসবেই না।' আমি হাসলাম। কথাটা ও ঠিকই ব'লেছ। এটা নতুন নয়, আগে বহুবার ঘটে গেছে। কাশ্মীরে কোথাও খাওয়ার কথা হলে আমি কেবলই যে পালিয়ে বেড়াই ও তা জানে। ওটা যে শুধু প্রকৃতির আকর্ষণে তা নয়, কাশ্মীরি বাড়ির নেমন্তন্নে আমার ভয়ের শেষ নেই। বারো থেকে আঠারো রকম মাংসের রান্না আর চার থেকে ছরকম মিষ্টির বহর, দেখলেই আমার কান্না পায়। এগুলো না হয় তবু খেয়ে, এবং না খেয়ে পার পাওয়া যায় কিন্তু একটা থালা থেকে চারজন খাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন খটকা লাগে। জাতির বিচার মানিনা, রীতিকেও অমান্য করাটাকে অসভ্যতা মনে করি, তবু ওদের একত্রে খাওয়ার এই সহজ সত্যটাকে কিছুতেই যেন মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। তাই ঠিক হল, সময় পেলে আমি সোজাই চ'লে যাবো আর ফাঁকি যে দেবোনা সেটা অন্ততঃ বলরাজের কাছে প্রমাণ করার জন্যেই সার্ট প্যাণ্ট ফেলে কালো আচকন আর চুড়িদার পাজামা প'রে নিলাম। বলরাজ এক চোখ দেখে বললে, 'একেবারে খাস্ মোগল জাঁহাপনা! দেখে কে বলবে তুমি বাঙালী! আসলে, আমার ভয় হচ্ছে, পাকিস্তানি ব'লে না কেউ ভুল করে।'

কথাটা ও যতই ঠাট্টাচ্ছলে বলুক না কেন, হাসতে হাসতে অতবড় ভবিষ্যত বাণী আর কেউ কখন করেছে কিনা জানিনা, আমার জীবনে যে কখন আর ঘটেনি তা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।

॥ ছয় ॥

দোসরা দুপুর

রামবাগ ব্রীজ পেরিয়েই বড়গাম তহশিলের রাস্তা বন্যাখালের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই পাকা পিচের রাস্তাটা আপন মর্জিতে এদিক ওদিক ঘুরে গিয়ে পড়ে এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে। বছর কয়েক আগে রাস্তাটা সোজাই চ'লে যেত কিন্তু ভাইকাউন্টের ওঠা নামার ধাক্কায় এখন ডান দিকে বেশ খানিকটা ঘুরে একেবারে দুই পাহাড়ের মাঝামাঝি গিয়ে পড়েছে। পাহাড় দুটো আড়াআড়ি ভাবে এয়ারপোর্টটাকে আগলে আছে ঠিকই, কিন্তু এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে গেলে গুলমার্গ একেবারে হাতের কাছে আর গুলমার্গ থেকে যুদ্ধ-সীমান্ত, পাহাড়ী হাঁটা পথ জানা থাকলে একদিনেই চলে যাওয়া যায়। এয়ারপোর্ট তল্লাটে যারা থাকে তারা পাহাড়ী পথেই গুলমার্গ যায়; পাকা রাস্তায় যেতে গেলে শ্রীনগর হ'য়ে যেতে হয়, প্রায় সাঁয়ত্রিশ মাইল। সীমান্ত থেকে আত্মগোপন ক'রে আসতে হলে এই পাহাড়ী এলাকার মধ্যে দিয়েই যে মানুষ আসবে সেটা আমাদের কর্তাদের কখন মনেই হয়নি। হ'লে অনেক হানাদারি ঝামেলা বেঁচে যেত। মনে রাখা উচিত ছিল, কারণ গত আক্রমণেও হানাদাররা এই পথেই এসেছিল এয়ারপোর্ট আক্রমণ করার জন্য এবং তাঁদের আটকাতে গিয়ে প্লেন থেকে নামার আধঘণ্টার মধ্যে প্রথম ভারতীয় সেনানায়ক কর্ণেল শর্মা প্রাণ দিয়েছিলেন। কর্ণেল শর্মার স্মৃতিফলক আজও সেখানে আছে। সেবারেও যেমন গ্রামবাসীরাই প্রথম হানাদারদের আটকে ছিল, এবারও তাই, কিন্তু আত্মপ্রসাদের আলস্যে এ পথে

প্রহরী বসানোর প্রয়োজনবোধ কেন যে কারো মনে হয়নি তা কর্তারাই বলতে পারেন।

দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথটা এসে আর এক ঢালু পাহাড়ের মাথায় যেন থমকে দাঁড়ায়। খুব সতর্ক নাহলে গাড়িটা একেবারে গ'ড়িয়ে নেমে যাওয়ার সমূহ বিপদ আছে। এখানে এক রকম বিনা নোটিশেই পুরোপুরি বাঁদিকে ঘুরে ওকারের মতন আঁক কাটতে কাটতে রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে। আমিন গাড়ি থামিয়ে নিচে নামল এবং আরও নিচের উপত্যকাটা দেখিয়ে বলল :

'এই পুরো উপত্যকাটা বড়গাম তহশিল। আমার বাবা যখন আর যতবারই এ পথে গেছেন, এইখানে দাঁড়িয়ে প্রতিবারই বড়গামকে দু চোখ ভরে দেখে দুহাত তুলে খুদাতাল্হাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব'লেছেন, বেহেস্ত যদি কোথাও থাকে তাহ'লে এইখানে, সেটা এইটাই।'

সত্যিই তাই। ঘন সবুজ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আর বড় বড় পপলার সারির মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা লাট্টুর মতন ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেছে সেই নিচে পর্যন্ত। সামনের সমতলভূমি সবুজের সংসার। আল বাঁধানো উঁচু নিচু ক্ষেতগুলোর কোনটার সঙ্গে কোনটার রং মেলেনা, আকার আয়তনের মধ্যেও কোথাও সাদৃশ্যের বালাই নেই। দেখলে মনে হয় কোন অতি-আধুনিক শিল্পী জ্যামিতির জাল বিছিয়ে রংয়ের নেশায় অনৈক্য সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছে। বড় বড় চিনারের ঘন ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল মাটির বাড়িগুলো খেলাঘরের অলস-বিন্যাস। বাঁ দিকে দুধগঙ্গা নদী কৌতূহলী শিশু মনের মতন আপন আনন্দে আপনিই দিশাহারা হ'য়ে ইচ্ছে মতন ঘুরে ফিরে চলে গেছে একটা নিচু কিন্তু লম্বা টানা পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়ে। পাহাড়টা পেছন দিকে ঠেলে উঠে, আকাশের কোলে হেলান দিয়ে আসন্ন অবকাশের অনন্ত প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দূরের নীলাভ ছানঝ

পাহাড়টা বরফের টুপি প'রে এই অবাধে ছুটে যাওয়া উপত্যকাটাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে অসম্ভবের সাধনায়। বর্ষায় ঐ পাহাড়ের বুক ধ'রে যে সব বড় বড় ঝর্ণা নামে, এখন সেগুলো শুকিয়েছে কিন্তু তাদের চলার পথের দাগগুলো এতো দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায়—শ্যামবর্ণ মেয়ের গলায় মুক্তোর মালার মতন। তারপরই নীল আকাশ। এখান থেকে তার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এতদূর আর এত বেশী যে সহুরে মানুষের কাছে তার প্রায় সবটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এইখান থেকে মাইল ছয়েক গেলে তবে আরিগাম। এই আঁকা বাঁকা পথটা যেখানে এলোমেলো ঝর্ণার গা ঘঁসে ঠিক এক চুমুর জন্যে চমকে দাঁড়ায় সেইখানেই প্রকাণ্ড চিনার গাছটার তলা দিয়ে কাঠের সাঁকো গেছে আরিগামে। আগে যদি আরিগামটা দেখতাম তা'হলে পরে অনেক সুবিধা হত কিন্তু ভীরু বাঙালীর ভাগ্যে ভয়ের ঝড় আসবে এইটাই ছিল আমার কপালের লিখন। তাছাড়া, মানুষের দৈন্দিন খোরাকিটা নিতান্তই নসীবের খেলা, ভাগ্যে না থাকলে জোটেই না। এখানকার রাজকীয় ভোজের কথা পরে জানা গেল।

এখান থেকে উটরা গ্রাম আরও সাত মাইল। পথ নেই, পুতুল নাচের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে গাড়ি চলে। রাস্তাটার শেষ প্রান্তে ছোট্ট গ্রাম, সেইখানে ট্যাক্সি ছেড়ে মাইল খানেক হেঁটে এলে দুধগঙ্গা নদী। ওটার ওপারে পাহাড়ে উঠলে তবে উটরা গ্রাম। খাড়া চড়াই উঠতে বাবার নাম ইয়াদ আসে কিন্তু প্রকৃতির এখানে এমনই প্রাচুর্য্য যে নারী-যৌবনও হার মেনে যায়।

আমিনের বড় মামা শাহ আব্দুল আজীজ সত্তর বছরের বুড়ো হ'লে কি হবে, সাতাশের মতন জোয়ান আর সতেরোর মতন চঞ্চল। প্রথম হানাদারি যুদ্ধে উনি তিনদিন ল'ড়েছিলেন পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে আর দুটো রাইফেলের হিম্মৎ নিয়ে। গ্রামের

ছজন মরেছিল কিন্তু হানাদারদের ওপরে উঠতে দেন নি। ওঁর কানের পাশে বুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন :

'দেশভক্তির এইটাই আমার 'পরম বীরচক্র'।'

মানুষটা সত্যিই মজার আর গ্রামবাসীদের মাটিতে লুটিয়ে পড়া কুর্নিশ দেখে বোঝা গেল কেউকেটাতো বটেই। শাহজীর নামে সাবই মাথা লোটায় আর আমি ওঁর খাস্ অতিথি শুনে গ্রামবাসীরা পারলে আমায় মাথায় নিয়ে ঘোরে। খাওয়ার পর্ব সারা না হ'লে শাহজী আমায় গ্রাম পরিদর্শনে যেতে দিতে নারাজ অতএব ওঁর সঙ্গে ব'সে জলখাবার খেতে হল বেলা বারোটায়। বেশী নয় খানদশেক বড়সড় পরোটা, ছটা ডিম আর বালতি খানেক খাঁটি গরুর দুধ। দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ ; উনি শুধু সস্নেহে বললেন : "দেহাৎ কা খানা আর কাশ্মীরি জেনানা, জিৎনা খা সকো খালো অর বাকি লে জানা।"

গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড আখরোট গাছ। লোক কবি মেহজুর তাঁর সারা সকালের দরকারি কাজ আর বাকি দিনের লেখার কাজ এইখানে ব'সেই সারতেন। সারা দিন রাত কাটাবার মতই জায়গা বটে। ওঁর মতন এক অতি সুপুরুষ কবির জীবনে নারী প্রভাবের অভাব দেখে বেশ খানিকটা অবাক হ'য়েছিলাম, এখানে এসে আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। এমন প্রকৃতির মধ্যে থাকলে প্রেমের প্রয়োজন কবির জীবনে ঘটে না।

খাড়া উৎরাইর শেষে, অনেক নিচে, দুধগঙ্গা চ'লে গেছে ডাইনে আর বাঁয়ে তার ওপারে আবার পাহাড়, পাহাড়ের ওপর একখানা বাড়ি। বাঁ দিকে সেই ছানঝ পাহাড়, এখন দূরেও নয়, নীলও নয়। অনেক কাছে, সবুজ ঘেঁষা। ডান দিকে পাহাড়ের ওপরে শ্রীনগর সহর, আঁকা ছবির মতন আভাষে ছড়িয়ে আছে। তিরিশ টাকা মাস মাইনের সামান্য পাটোয়ারি মেহজুর তাঁর কর্ম জীবনের শেষ তেরো বছর এইখানে এই গাছের তলায় ব'সে মাটির

ভাষায় মানুষের গান গেয়েছেন আর সারা কাশ্মীরে তার প্রতি-ধ্বনি শোনা গেছে। আজও কাশ্মীরের প্রত্যেকটি স্কুলে তাঁরই লেখা গান দিয়ে দিন আরম্ভ হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেতে, কি হিন্দু কি মুসলমান তাঁরই গান গেয়ে ধান কাটে, প্রতি ঘরে ঘরে বিয়ের মেহেদি রাতে তাঁরই গান গেয়ে ক'নে সাজানো হয়, ঈদের মেলা, হোলিতে রংয়ের খেলা, কাশ্মীরি জাতীয় সঙ্গীত, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রচার বাণী তাঁরই গানে সম্পূর্ণ হয়। অর্থের আকর্ষণ, সম্মানের আহ্বান, প্রতিপত্তির প্রলোভন কোন কিছুই তাঁকে কাশ্মীরের এই কোণ থেকে সরাতে পারেনি। কেন যে পারেনি, এইখানে এলে তবে বোঝা যায়।

নির্বাক আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে কতক্ষণ আমি ঐ প্রাকৃতিক অসীমতায় হারিয়েছিলাম জানিনা, হঠাৎ কানে এল, বহু কণ্ঠের কাকলি। কাশ্মীরে স্ত্রী পুরুষ সাধারণতঃ কাজ বেশী করে তাই কথা কম বলে। সহরের মধ্যেও সোরগোল অন্য জায়গার তুলনায় অনেক কম—নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই রবিবারের দুপুরে, সহর থেকে তিরিশ মাইল দূরের নির্জন পাহাড়ের কোণে আচম্‌কা কলরোলটা কানে লাগল কারণ, অদূর থেকে আসা ঐ আওয়াজে মেয়েদের মিহি সুরের বাহুল্যই বেশী। তাছাড়া, এখানকার প্রকৃতির এমনই প্রাণ-প্রাচুর্য্য যে নিঃসঙ্গতা আমার মতন মানুষের মনকে কিছুতেই যেন রেহাই দেয় না।

লম্বা পায়ে পথ চলতে চলতে এসে দাঁড়ালাম ছোট্ট স্কুল বাড়িটার সামনে। দুখানা ছোট ঘর আর চারিপাশে বড় বারান্দা ঘেরা মাটির বাড়ি, সামনে সীমাহীন কম্পাউণ্ড। কোথাও উঁচু ঢিপি, কোথাও নিচু ঢাল, মাঝে মাঝে শফেদার সারি আর এ প্রান্তে পরম উচ্ছ্বাসে ব'য়ে যাওয়া ঝর্ণা। স্কুলটার সামনে দাঁড়াতেই ছোট ছেলেমেয়েদের একটা বড় ধরণের ভিড় আমায় ঘিরে জ'মে উঠল। ভেতরে মহিলাদের জমাট ভিড়, দল করে সব বেরিয়ে আসছে।

জাতে মুসলমান হ'লেও এ জগতে বেশীর ভাগ পরিবারেই পর্দার বালাই নেই। সামান্য যেটুকু আছে তা পয়সাওয়ালা বড়লোক পরিবারে। তাঁরাও আজকাল বোর্খাটাকে পর্দার প্রতীক হিসেবেই ব্যবহার ক'রে থাকেন।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। কাশ্মীরি মেয়েদের সৌন্দর্য্য আমার মনে যতই সন্দেহ-সাপেক্ষ হ'ক, দুনিয়ার চোখে ওদের সুনামটা সর্বজনবিদিত। অতএব, চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বোঝাপড়া ক'রে নেওয়ার এমন সমারোহপূর্ণ সুবর্ণ সুযোগ ছাড়বার ছেলে আমি নই; কিন্তু বিদ্রোহ করল, আমার নাসিকা। ওদের গায়ের দুর্গন্ধ দু মাইল দূর থেকেও পাওয়া যায়। বাধ্য হ'য়ে স'রে এসে পাহাড়ের কিনারা ঘেঁসে দাঁড়ালাম। আর সরবার উপায় নেই, তাহ'লেই একেবারে দুধগঙ্গায় পড়তে হবে। ওরা যখন বেরিয়ে এসে, বলতে গেলে, আমার গায়ের ওপর দিয়েই যে যার পথে যেতে আরম্ভ করল, তখন একবার মনে হয়েছিল যে হাত পা আর চোখ কানের মতন প্রাণও যদি আমার দুটো থাকত, তাহলে তার একটা আজ আনন্দে খোয়াতে পারতাম নিচে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে। ওদের তুলনায় বোকা পাঁঠাও হার মানবে।

কাশ্মীরের এই হারিয়ে যাওয়া কোণে আমার মতন আচকণ পরা মানুষ কমই আসে বোধ হয়, তাই ওদের কাছে আমি কড়া নজরে লক্ষ্য করার চিজ। আড়চোখে দেখলাম ওরা আমায় বেশ দুচোখ ভরেই দেখে যাচ্ছে। দেখুক ক্ষতি নেই, তাড়াতাড়ি গেলে বাঁচি।

সবাই গেলেন কেবল দুজন র'য়ে গেলেন। আমার চারিধারের ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে, দুই সখীর মধ্যে যিনি সত্যিই সুন্দরী, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে সহুরে তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন: 'আদাব।'

আদাব জানিয়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম ওঁর মুখোমুখি। মাহলাটি

নিঃসন্দেহে সুন্দরী। চোখ দুটোই আগে চোখে পড়ে। ঘন নীল। চুলগুলো কালো নয়, ঘন বাদামি, চওড়া কপাল, নাকটা অযথা জায়গা জুড়ে নেই, গোলাপী গাল আর ধবধবে ফর্সা। দেহের ঠিক জায়গায় অজন্তার সম্ভার, বাকিটা ভালো শিল্পীর সুন্দর কল্পনা। আন্দাজে বয়স মনে হল তিরিশ, তবে কম যদি হয় তাহ'লে বেশীটা অভিজ্ঞতার পোড়া দাগের দিগ্‌দারি। শাড়ি পরার ধরণ দেখে সহজেই ধ'রে নেওয়া যায় যে উনি সহরের মানুষ এবং শিক্ষিতা। উনি কথা আরম্ভ করলেন, এবার আর উর্দ্দুতে নয়, রীতিমত অভ্যাসের শান-দেওয়া ইংরেজিতে।

'কিছু কি জানতে চান ?' প্রশ্নের মধ্যে যে ইঙ্গিত সেটা প্রচ্ছন্ন হ'লেও, আমার কাছে খুব স্পষ্ট। বোঝা গেল, আমায় নিয়ে ওঁর মনে কিছু সন্দেহের অবকাশ ঘটেছে। সোজাসুজি জবাব না দিয়ে আমিও প্রশ্ন ক'রে বসলাম। 'আপনি কি জানতে চান ?'

মহিলা বুঝলেন যে কোলাকুলিটা বেশ শেয়ানে শেয়ানেই হ'য়েছে। ভণিতা না ক'রেই বললেন: 'এখানে আপনি কি করছেন ?'

'বেড়াচ্ছি।'

'পুরো কাশ্মীর ছেড়ে এইখানে ?'

হেসেই বলি: 'এটাও তো কাশ্মীরের একটা কোন।'

'এখানকার সন্ধান আপনি কেমন ক'রে পেলেন ?'

প্রশ্ন-উত্তরটা একটু এবং অযথা ভারি হ'য়ে আসছিল, তাই খানিকটা হাল্‌কা করার জন্যেই বললাম: 'ধরা যাক যেমন ক'রে আপনি পেয়েছেন।'

'আমি কাশ্মীরি। আমার জানা আছে।'

'আমি কাশ্মীরি নই, কিন্তু কৌতূহল আছে।'

এবার মহিলাদ্বয় আপোষে আলাপ করলেন ওঁদের ভাষায়। তারপর অন্য মহিলাটি এগিয়ে এলেন। প্রথমটিকে খুঁটিয়ে দেখার

প্রলোভন হ'য়েছিল, এঁকে দেখবার প্রয়োজন হল না। এক চোখ দেখলেই বর্ণনাটা দুকথায় সারা যায়: 'মেয়ে স্কুলের বড় দিদিমণি।' উর্দ্দুতে উনি প্রশ্ন করলেন: 'আপনাকে এখানকার কেউ কি চেনে?'

হেসে বলি: 'ধরুণ, যদি না চেনে?'

বেশ কড়া সুরেই মহিলা জবাব দিলেন: 'তাহ'লে আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'চলুন।'

ঘড়ি দেখলাম, একটা। সকালের প্রাতঃরাশ তখনও রাশি রাশি হ'য়ে পেটের মধ্যে জমা হ'য়ে আছে। অতএব হাঁটায় আপত্তি নেই, হজমের সুবিধেই হবে। তাছাড়া, সঙ্গীহীন হেঁটে বেড়ানোর যে গভীর শূন্যতা তার থেকেও বাঁচা যাবে—আর সব চেয়ে সত্যি কথা, অজন্তা সুন্দরীর দেখা-না-দেখার ভঙ্গিমাটুকু বেশ ভালোই লাগছিল।

তিনজনে পথ হাঁটছি। কুচোর দল আস্তে আস্তে কেটে পড়ল, অজন্তা সুন্দরী বার কয়েক আড়চোখে দেখতে গিয়ে প্রতিবারই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে কথা পাড়লাম।

'কোথায় আমি যাচ্ছি এবং কতদূর এবং কেন?' জানতাম, উর্দ্দুতে প্রশ্ন করলে মাষ্টারনী মাসিমা জবাব দেবেন, তাই প্রশ্ন ছিল ইংরেজিতে।

মহিলা ছোট্ট জবাব দিলেন: 'গেলেই দেখবেন।'

'তবু?'

'আমাদের তহশিল দপ্তরে।'

'কোথায় যাচ্ছি জানা গেল। এবার বলুন সেটা কতদূর এবং সেখানে কেন যাচ্ছি?'

মহিলাটি রাগ করলেন না, কপট রাগে কিছু দাম বাড়ালেন।

'হেঁটেই যখন যাচ্ছি তখন নিশ্চয় বেশী দূর নয় এবং নিয়ে যাচ্ছি কারণ আপনার পরিচয় আমাদের পাওয়া দরকার।'

হেসে বলি: 'তার জন্যে দপ্তরে যাওয়ার দরকার কি? আপনার কৌতূহলই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কি জানতে চান বলুন?'

আমার কথায় এবার উনি হাসলেন, বোধ হয় কিছু কৌতুক অনুভব করলেন।

'ওটা আমার কাজ নয়, পুলিশের কাজ।'

'তাহ'লে আমার গ্রেপ্তার করেছেন কেন?'

এইবার মহিলা হেসে ফেললেন।

'সন্দেহে।'

'কিসের?'

'আপনার গতিবিধির। এখানে, এতদূরে কখন কোন ভিসিটর আসে না, আপনি কেন এসেছেন আমাদের জানা দরকার।'

'যদি না বলি?'

'সেইজন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

আমি থেমে গিয়ে বললাম: 'আর, যদি আমি না যাই?'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উনি ওঁর শাড়ির ভাঁজ থেকে একটা ছোট্ট রিভলবার বের ক'রে খুব শান্ত ভাবেই বললেন: 'যেতে আপনাকে হবেই।'

এতক্ষণ মহিলার প্রতি আমার ছিল সবটাই পুরুষালি কৌতূহল। এবার হল শ্রদ্ধা। বললাম:

'ওটার প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রাণের মায়া আমার যথেষ্ট আছে। চলুন।'

শ্রদ্ধা যতই হ'ক ভয় যে আমার হয়নি তা নয়। রিভলবার বুঝি কিন্তু মহিলার হাতে ওর ভাষাটাকে বিশ্বাস করায় ঠিক সাহস হচ্ছিল না। তাই, অনেকখানিটা পথ আর কোন কথা বলার চেষ্টাই করিনি।

উৎরাই নেমে দুধগঙ্গা পেরোবার সময় দেখি ওপার থেকে শাহ সাহেব আসছেন হন্ত দন্ত হ'য়ে। শুকনো নদীটার মাঝ বরাবর যে গাছের গুঁড়ির শাঁকো আছে তার ওপারে ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া গেল। শাহ সাহেব মহাসমারোহে অজান্তা সুন্দরীকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে আমায় বললেন :

'ইয়া আল্লা! এসেছিলেন তো মেহজুরের জীবনী খুঁজতে আর ধ'রে নিয়ে এলেন কাশ্মীরি আসমানের আলিশান্ তারা—রুকায়া বেগমকে। সাবাস্ ডিরেক্টর, সাবাস্!'

কথাটা শুনে রুকায়া বেগম তাঁর নীলচোখ দুটো আকাশের মতন ছড়িয়ে দিলেন আর মাষ্টারনি মাসি এত বড় হাঁ করল যে চেষ্টা করলে তার মধ্যে মোষ ঢোকানো যায়। আমি হাসতে হাসতে বললাম: 'আমি ধ'রে আনিনি, উনি আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'মানে?'

আমি বেগম সাহেবার দিকে চোখ তুলে বললাম: 'ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি হুকুম করেছেন আমি পালন করছি!'

বেগম সাহেবা এইবার মুখে বুলি পেলেন। ওঁদের মধ্যে কথা হল কাশ্মীরি ভাষায়। কথা শেষ করার আগেই শাহসাহেব এমন উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন যে ওপারের গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। রুকায়া বেগম সলজ্জ ভাবে বললেন: 'আপনি যে আমার দেশের অতিথি সে কথা আগে বলেননি কেন?'

হেসে বললাম:

'বলার অবকাশ আপনি দিলেন কখন?'

'সত্যিই!' উনি বললেন, 'আমরাই অন্যায় হ'য়ে গেছে। আসলে, আঠারো বছর পাকিস্তানের গুপ্তচর দেখে দেখে, মনটাই আমাদের বিষিয়ে উঠেছে। অচেনা লোক দেখলে আগেই সন্দেহ করি!'

ওঁর অপ্রস্তুত ভাবটা কিছু কমাবার জন্য ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে বলি: 'ভাগ্যিস্ গুপ্তচর ভাবলেন, নইলে অনুচর হতাম কি ক'রে?'

শাহসাহেব আর একবার তাঁর প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন: 'আরে ভায়া, বাড়িতে বুড়িয়া না থাকলে আমি রুকায়ার পার্শ্বচর হ'য়ে যেতাম।

মাসি তো মাসিই, রসকশের বালাই নেই। টাইমপিস্ বাঁধা হাতটা এগিয়ে বললে: 'এবার যেতে হবে। মেয়েরা অপেক্ষা করছে।'

শাহসাহেব রুকায়ার হাতখানা ধ'রে বললেন: 'খেয়ে যাও আর ডিরেক্টার সাহাবের সঙ্গে আলাপ ক'রে যাও, তোমায় ষ্টার বানিয়ে দেবে।'

রুকায়ার যে ইচ্ছে ছিল তা ওর ঐ মাষ্টারনি মাসির দিকে উৎসুক চোখের চাউনি থেকেই বোঝা গেল। মাসি কিন্তু নারাজ। সে ওপর পড়া হ'য়ে বলল: 'আজ থাক শাহসাহেব, আর একদিন হবে।'

শাহসাহেব রসিক লোক, মাষ্টারনিকে বললেন:

'আর এলেই বা হত কি? ডিরেক্টর সাহেবকে ছেড়ে আমার দিকে তো আর রুকায়াবিবি নজর দিতো না। আর তুমিও আবার আমাকে মনেই ধর না।'

রুকায়া চ'লে গেল। আবার দেখা হবে কিনা জানবার লোভ হ'য়েছিল কিন্তু মাসির ভয়ে সেটা সামলাতে হল। ওরা যাওয়ার পর শাহসাহেব দিলেন সহজ ভাষায় ওর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। জানা গেল রুকায়া কলেজে পড়ায় আর কাজের বাইরে সমাজ-সেবা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সেই সঙ্গে দেশের নিরাপত্তাকে ও নিজের দায়িত্ব মনে ক'রে গোয়েন্দাগিরিও করে। সারা কাশ্মীর উপত্যকায় ওর কাজের বাহার আর নামের বহর। আজ এই গ্রামে এসেছিল মেয়েদের জন্মনিয়ন্ত্রণ শেখবার কাজে। আবার আসবে একমাস পর।

ওকে যতটুকু দেখেছি আর ওর যতখানি জানা গেল, তাতে মন

যেন ভরতেই চায় না; তাই কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর কিছু পরিচয় পাওয়ার চেষ্টায় অকারণ লজ্জাই কিছু পাওয়া গেল। শাহসাহেব পুরোণো আমলের বোনেদি রসিক, হাসতে হাসতেই বললেন: 'মহারা। [এটা ওদের সাদর অভ্যর্থনা, বোধহয় 'মহারাজ' কথাটার অপভ্রংশ।] দিল্ দিয়েছ ভালো কথা, তার বেশী আর লোভ কোর'না। ও হল কাশ্মীরের নূরজাঁহা আর সারা কাশ্মীরের ন'-জোওয়ান ওর জন্যে মজনু হ'য়ে আছে।'

না হওয়ার কোন কারণ নেই, না হ'লেই বরং অবাক মানতাম। রুকায়ার সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ, ওর আকর্ষণ উত্তপ্ত। ওর নীল চোখে মানুষ নিজেকে হারায়, ওর দেহের গঠনে, নিজেকে খুঁজে পায়। ওর শরীর বাংলাদেশের মতন নরম নয়, উগ্র, অনবরত হাতছানি দেয়। ওর দেহ সৌষ্ঠব, কল্পনা করেছি, কম দেখেছি, কখন কাছে পাইনি। হঠাৎ শাহজী বললেন:

'জিসম্ (দেহ) বুড়ো হ'য়েছে কিন্তু লোভ যায়নি। রুকায়া আমার সারা দেহ ভ'রে এই কথাটাই জানিয়ে গেল।'

॥ সাত ॥

দোসরা বিকেল

শাহজীর সঙ্গে সারা পথ কথার ফলে, রুকায়ার ছায়া মনের ওপর ছড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল একটু নির্জন অবসর পেলে ওর কথা আর একটু ভাবা যাবে কিন্তু নানান কথার মধ্যে, মনের এই নাবালক অনুভূতিটাকে আমল দিইনি। বিপদ ঘটালো শাহজীর বাগানের এক জোড়া বুলবুল। দোতালার সরু বারান্দার কোণে যখন রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে খেতে ব'সেছি তখন বুলবুল দুটো, বলা নেই কওয়া নেই, উড়ে এসে আমার দু কাঁধে ব'সে গান জুড়ে দিল। মেহজুর সাহেবের যুগ থেকে এটা নাকি চলে আসছে ঐ বুলবুল দুটোর উর্দ্ধতন তিন পুরুষ ধ'রে। শাহজীর কাছে শোনা গেল, এই বুলবুলের ঠাকুর্দা, এমনি এক গ্রীষ্মের দুপুরে মেহজুরের কাঁধে এসে ব'সেছিল, আর কবি না কি ব'লেছিলেন, 'গান শোনা তাহ'লে রোজ খাবার দেব'। সেই থেকে ওরা বাড়ির বাগানে বাসা বেঁধে আছে, বাচ্চা হলে সব উড়ে যায় কিন্তু একটা থাকেই। সেই একটা তার দোসর নিয়ে আসে আর খাবার দেখলেই দুজনে মিলে গান শোনায়। ঐ গানের সুরে রুকায়া আবার নতুন আবেশে জেগে উঠে, খাওয়ার শেষে ঘর থেকে আমায় প্রকৃতির মধ্যে ঠেলে দিল।

*　　　*　　　*

মনের মধ্যে ওর ছাড়া ছাড়া কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে মেহজুরের অতি প্রিয় সেই আখরোট গাছের দিকে পা বাড়ালাম। মহিলা অনেক দেখেছি জীবনে, সমাজ-সেবিকাদের চেহারাও আমার অজানা নয় কিন্তু দুয়ের এমন সুন্দর সমন্বয় আগে অল্পই দেখেছি।

সারা দুপুর যে মানুষটা ছিল নিতান্তই পুরুষ মনের কৌতূহল, প্রকৃতির কোলে পা দিয়েই বোঝা গেল, সে হয়ে উঠেছে অনেকদিন হারিয়ে যাওয়া মনের একটা নতুন কল্পনা। শুধু মনেরই নয়, আমার চোখে সারা কাশ্মীরের স্বাদটুকুও যেন বদলে গেছে। আঠারো বছর ধ'রে আমার কাছে দেশটা ছিল প্রাকৃতিক ঔদার্য্যে অসীম আর রাজনৈতিক আলোড়নে অহেতুক। রুকায়ার সঙ্গে এক সকালের আলাপেই দেশটা হ'য়ে উঠেছে প্রাণস্পন্দনে পরিপূর্ণ আর রাজনৈতিক আধারে অপরিহার্য্য। যেন আমারই দেশ।

গাছের তলায় এসে দেখি মেহজুর সাহেবের বুড়ো চাকর আবদুল ওয়ানি, আমার জন্যে তার গায়ের কম্বলটা গাছের তলায় বিছিয়ে রেখে ওরই মতন বহু পুরাতন হুঁকোর নলটা মুখে দিয়ে আনন্দে ঝিমোচ্ছে। মেহজুর সাহেব মারা যাওয়ার পর, আজ তেরো বছর, ও সব ছেড়ে শুধু তাঁর স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে। আমি ওর স্মৃতির অনেকখানি নিংড়ে নিয়েছি আমার সৃষ্টির কাজে তাই, পারলে, ও আমার জন্যে ওর প্রাণটাই বিছিয়ে দেয়। ওর মুখে কবির কথা শুনে আমার মন ভরে, কারণ ওর কাছেই পাওয়া যায় কবির মনটা আর সেই মানুষটার আসল পরিচয়!

আমি কম্বলটা তুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিতেই ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে ও অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর অল্প একটু হাসল, আর বললে, আমি নাকি মেহজুর সাহেবের রুহ (আত্মা)। উনিও নাকি এইভাবে গায়ের চাদর তুলে মাটিতেই বসতেন।

আমি ওর পাশে বসলাম পা ছাড়িয়ে। ও হুঁকোটা এগিয়ে দিল। না নিলে ও মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই আপত্তি করলাম না। কাশ্মীরের গ্রাম্যকানুনে এইটাই হল বন্ধুত্বের অনৈক্য স্বীকৃতি। যে যার আপন আপন হুঁকো নিয়ে ঘোরে, কেউ কাউকে দেয়না, কেবল বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হ'লে হুঁকো বিনিময় হয়। আমি হুঁকো ধরলাম,

ও আমার পা'টা পরম আদরে টিপতে আরম্ভ করল। ইচ্ছে না থাকলেও অন্ততঃ কৃতজ্ঞতায় ওর সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার, তাই বললাম: 'কি অপূর্ব জায়গা এইটা।'

ও হেসে বললে: 'একটু চুপ ক'রে থাক, মহরা, দেখবে এমন কিছু যা আর কোথাও, কেউ, কখন দেখেনি। সন্নাটা (নিস্তব্ধতা)। এমন মিষ্টি যে কথা বলে, ঠিক মেয়েদের হাতের চুড়ির মতন। চুপচাপ ঘরে যেমন জেনানার চুড়ির শব্দে তার মোহব্বৎ মালুম পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি।'

'আবহুল, তুমি বিয়ে করনি? ছেলেমেয়ে নেই?'

ওর হাতটা আমার পায়ের ওপরই থেমে গেল। বোবা কান্নায় ওর চোখ হুটো ছলছলে। কোঁচকানো মুখে যেন শিশুর অসহায়বোধ। 'ছিল।' ও বললে, 'সব ছিল বাবু, সব গেছে।'

'কোথায়? কেমন ক'রে?'

'বারামূলায়। হানাদারদের হাতে।'

বোধহয় কান্না এড়াবার জন্যেই ও আবার পা টেপা আরম্ভ করল। আরো জোরে জোরে। এমন নিঝুম নিস্তব্ধতা যে নিঃশ্বাসের শব্দ গর্জনের মতন শোনায়। প্রজাপতির পাখা-ঝাপটানিও বুঝি কানে আসে। থেকে থেকে আর থেমে থেমে ও বলতে থাকে ওর বিবির কথা, ওর বাচ্চাদের কথা, ওর পরিপূর্ণ জীবনের কথা। তারপর কথার পিঠে কথা চাপিয়ে ও পৌঁছে গেল বারামূলার সেই বিভৎস রাত্রের পৈশাচিক ইতিহাসে।

বারামূলাতে ওর বৌ ছিল মিশনের আয়া। টাকার দরকারে ও কাজ সে নেয়নি, মেয়েটা কানে কম শুনত ব'লে চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিল, আর কিছুদিন থাকতে হবে ব'লে কাজটা নিয়েছিল। সাত চল্লিশের হামলায় হানাদারদের অত্যাচারের কাহিনী যখন কানাঘুষা ওরও কানে এলো তখন ও গেল বারামূলায়, বৌ আর মেয়েকে আনতে। সবাই ব'লেছিল, ওয়ানি যাস্‌নি, মেম পাদ্রিদের

কাছে আছে তারা, কোন ভয় নেই। ওরা সাদা চামড়া, হিন্দুস্থান পাকিস্তানের ঝগড়ায় ওদের কোন তাল্লুক নেই। তাছাড়া জিন্দগি ভোর ওরা আমাদের কত উপকার করে, ওদের হাতায় যাবে এমন হারামখোর মানুষ পৃথিবীতে নেই। সব শুনে ওয়ানি বললে, সে যাবেই, শয়তান যখন সুযোগ পায় সে তখন আর সাদা কালোয় ফরক বোঝে না। মেহজুর সাহেব হাত দুটো ওর নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে ব'লেছিলেন, ওয়ানি বেটা, আল্লাহতালার কসম খা, যা যা শুনেছি তার এতটুকুও যদি সত্য হয়, তাহ'লে নিজের খুন্ দিবি, হিন্দুর গায় হাত দিয়ে খুদাতালার অপমান করবি না। কথাটা শুনে ওয়ানি অবাক মেনেছিল, তারপর হেসে বলেছিল, বরখুদা, পীর সাহেব, কি কথা বলছেন? হিন্দুভাইদের গায়ে হাত দেব, কেন? লড়াই তো হামলাদারদের সঙ্গে কাশ্মীরিদের। এই ধরতির ওরাও তো সন্তান!

মিত্তিরগাম থেকে হাঁটা পথে তিন মাইল গেলে তবে পুলওয়ামাতে বাস পাওয়া যায়। পথের দুধারে বড় বড় চিনারের সারি আর তারি পায়ের তলায় আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ধানের ক্ষেত। ফসল তখন সবে ধ'রেছে, আর এরই মধ্যে ফসলের ভারে ভারে নুয়ে পড়া গাছগুলো দেখে ওয়ানির মনে হল, ওরা বুঝি জমজ ছেলে পেটে নিয়ে লজ্জায় মাথা নুইয়ে আছে। ওই দেখেই ওর আরও মনে হল, মেয়েটা যখন ভালোই আছে তখন এবার একটা ছেলে না হ'লে- আর চলছে না। ওর এত ক্ষেতখামার, ম'রে গেলে দেখবে কে? মনে মনে ঠিক করে নিল, এই ভাবেই কথাটা জেনানাকে জানাবে নইলে সে রাজিই হবে না, বলবে, বুড়ো বয়সে রঙ্গ দেখ!

পুলওয়ামাতে বাস এলো ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়াবার পর। এমন তো কখনো হয় না। বাস আসে আধ ঘণ্টা অন্তর আর টাইটম্বুর ভর্তি। এ পথে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের অনবরত ছোটাছুটি,

জায়গা পাওয়াই মুস্কিল! আজ বাস প্রায় খালি। কাদের মিঞা বললে, যাচ্ছিস কি, শুনিস নি? উরিতে যে খুনের দরিয়া বইছে। রাজার দেড় হাজার ডোগরা সেপাইকে ওরা কৎল ক'রে সহর গ্রাম সব পুড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ সব চুয়ার মতন যে যেদিকে পাচ্ছে পালাচ্ছে। ওয়ানি ছোট্ট জবাব দিল, তাইতো যাচ্ছি!

সারা মিস্তিরগামে আলো জলে তুঠো চারটে। বিয়ে সাদি হ'লে কিছু তার বেশী। দেহাতি লোকেদের চোখে শ্রীনগরের রোশনাই তাই রৌশন চৌকি অথচ সেই সহরটা কালো ঘুটঘুটে। জোয়ান ছেলে হঠাৎ মরে গেলে তার বুড়ো মা যেমন বেহোসের মতন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি। বরখুদা, শ্রীনগরের একি অবস্থা! লোক নেই, জন নেই, আলো নেই, আওয়াজ নেই, ঠিক যেন একটা মুর্দা। বাস অড্ডায় গিয়ে দেখল একদম জনমানব নেই। যে তুচারজনকে ও বাসের কথা জিজ্ঞেস করল, তারা এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যেন ও বদ্ধ পাগল। একজন শুধু বললে, হাঁগো তোমার কি মাথা খারাপ? বারামূলা আছে না কি? শোননি, মহারাজা নিজেই দেশ ছেড়ে চ'লে গেছেন প্রাণের খাতিরে?

বাধ্য হ'য়ে ও হাঁটা পথেই পা বাড়ালো। হিসেব ক'রে দেখল চল্লিশ মাইল পথ, যেতে লাগবে কম করে তুদিন, গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেলে দেড় দিনে হলেও হতে পারে। বারামূলা যাওয়ার আগে বৌ ঘরভর্তি বাখরখানি বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে আছে তারই কিছু খাবার, তুদিন অনায়াসেই চলে যাবে। ভাবনা শুধু তামাক। হুঁকোটা সঙ্গেই আছে। রাত্তিরটা বাস আড্ডার ধারে দোকানের বারান্দায় কাটিয়ে ও রওনা হবে পরদিন সকালে। দিন্‌টা ওর ঠিক মনে আছে। ২৪ তারিখ—কারণ তারপর দিনই ছিল ঈদ। হিসেব করেই বেরিয়েছিল। বাসে বাসে ও বৌকে নিয়ে ঈদের দিন গ্রামে ফিরবে। সেটা আর বোধহয় হল না।

দোকানের বারান্দায় শুয়ে পড়ল গায়ের কম্বলটা বিছিয়ে।

কালো কুকুরটা বাখরখানির গন্ধ পেয়ে সামনে এসে ল্যাজ নাড়তে শুরু করল। থলি থেকে বের ক'রে একটা তাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরও চারটে কুত্তা যেন আসমান থেকে টপকে পড়ল। রসুল আল্লাহ, তাদের ঝগড়া যদি দেখতেন; পারলে এ ওকে বুঝি ছিঁড়ে খায়। হুস্ হাস্ ক'রে যেই তাদের তাড়ালো অমনি অন্ধকার সহরটা কফনের মতন হ'য়ে উঠল। ঠিক যেন ভূতের বাড়ি।

ইয়া আল্লাহ! তাজ্জব ব্যাপার! সকাল হওয়ার আগেই হাজার হাজার মানুষের চিৎকার। বাস আড্ডা যেন একেবার ঈদ্ গাঁ। বাস সব আসছে তো আসছেই আর একদম ভর্তি। আর সে কি কান্না—ঔরৎ মরদ সব যেন খুদার জন্যে মাতমে লেগেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সব আসছে উরি থেকে, শিউপুর থেকে, সাদিপুর থেকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কেউ কথা বলে না, কেবল কাঁদে। কেউ আবার আল্লাহতালাকে হারামজাদা ব'লে গালাগাল দেয়।

বন্দুক কাঁধে নিয়ে যে হজরত লোকগুলোকে চুপ করতে বলছিল আর ন্যাশনাল কনফারেন্সের নাম ক'রে খাবার দিচ্ছিল তাকে গিয়ে ওয়ানি বললে, হজরত, আমি বারামূলা যাবো। সে বললে, পাগল, দেখছিস্ না এরা সব জান নিয়ে পালিয়ে আসছে সেখান থেকে। তারপর আর কোন কাথাই সে বললে না। কি করবে ভেবে না পেয়ে ওয়ানি গিয়ে বসল আবার বারান্দায়, গালে হাত দিয়ে। তখন ঐ মেয়েটা, রুকায়াবিবি, পনেরো বছরের জাফরাণ ফুল, একেবারে বেহেস্তের হুর, এসে বললে, হজ্ এখান থেকে হটে যাও, এটা আমাদের হাসপাতাল হবে। ওয়ানি অবাক হয়ে বললে, ইয়া আল্লাহ, এখানে হাসপাতাল? মেয়েটা বললে, হ্যাঁ গো হজ্, হ্যাঁ এখানে বাচ্চা হবে! বারমূলার হাসপাতাল হানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছে। দশজন বিবির বাচ্চা হ'য়েছে বাসে, সকলের সামনে।

ও তখন হাঁটতে আরম্ভ করল। যাবেই, যেমন ক'রেই হ'ক।

ঝাতমালুর কাঠের সাঁকো পেরিয়ে শেখ দাউদের দর্গার কাছাকাছি এসে দেখা গেল হাজার হাজার লোক আসছে হাঁটা পথে, বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান, ঔরৎ—সব, সারা ঘর গরস্তি কাঁধে নিয়ে। তাদের পেরিয়ে আর কোন রকমে পাশ কাটিয়ে চলেছে ওই একমাত্র মানুষ। ওদের উল্টো পথে। ওরা ওদের কান্না যেন আসমানে পৌঁছে দেবে। তারই মধ্যে একআধজন হাহাকার থামিয়ে এক পলক হতবাক হ'য়ে দেখল। একটা বুড়া হাত ধ'রে বললে, ওদিকে যাস্‌নি, ওদিকে মৌত আছে, আর কিচ্ছু নেই। ওয়ানি তবু চলল। ওরও আছে দুজন, ওর বিবি, ওর বিটিয়া। ওর বেহেস্ত, ওর হুর।

সামনে পথ আর দেখা যায় না, খালি মানুষ আর মাথা। সঙ্গে গরু, ছাগল, ভেড়া আর কুকুর। তিন বছরের বাচ্চা হাঁটছে, আশী বছরের বুড়িয়া হাঁটছে। ল্যাংড়া, অন্ধ, মোতাজ, সব হাঁটছে। পথ দিয়ে, খানা ধ'রে, মাঠের পাকা ফসল মাড়িয়ে। কথা নেই, শুধু কান্না। মানুষ নয়, যেন ভাঙা মেসিন, পায়ে পায়ে চিৎকার করছে। কেউ আল্লাহর কাছে দুয়া চাইছে, কেউ রসুল আল্লাহকে রাস্তার কুকুর আর শূয়ার-কা-বাচ্চা ব'লে চিৎকার করছে। ওয়ানির মনে হল, এরা মানুষ নয়, সব জানোয়ার বনে গেছে। এরা ভীতু, এরা গদ্দার, নইলে মানুষের মতন মুখোমুখি দাঁড়ালে, মারত আর না হয় মেরে মরত। হানাদারদের কাছে না হয় বন্দুকই আছে, তবু মানুষ তো বটেই। এমনি ক'রে পালিয়ে না এসে যদি এক ঝাঁক হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহ'লে ঐ অল্প কজন হানাদার কি করতে পারত?

মাইল কয়েক পেরিয়ে যখন রাস্তাটা কিছু খালি মনে হল তখন ও মাঠ ছেড়ে ওপরে উঠে এলো। আগেই উঠে আসত—ঐ পাকা ফসলগুলো মাড়িয়ে যেতে ওর মন চাইছিল না, কিন্তু উপায় কি? পথ তো নয়, মানুষ ভর্তি। ঈদগাঁর প্রকাণ্ড মাঠটা কেউ যেন টেনে লম্বা করে বিছিয়ে দিয়েছে। পথের মোড়ে যখন ঝর্ণার শব্দ কানে

এলো তখন জলতেষ্টায় ওর ছাতি ফাটছে। নিচে নামতেই দেখে গাছের ধারে কি যেন একটা ছটফট করছে। কাছে গিয়ে দেখে, সদ্যজাত বাচ্চাটা। দিন দুয়েকের বেশী কিছুতেই নয়। হায় খুদা, এতটুকু বাচ্চা এখানে প'ড়ে, মা'টা কোথায় গেল? বাপ ভাই কেউ নেই? দুনিয়াটার হল কি? কি করবে ভাবছে, একটা পাগলি বুড়ি ছুটে এসে বললে, নিবি? নিয়ে যা! তারপর হাসল। ঠিক যেন কফন থেকে বেরিয়ে এসে একটা মুর্দা হাসছে। বাচ্চাটা হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল। বুড়িটা পাশে ধপ ক'রে বসে বলল, মার জন্যে কাঁদছিস্? ক্ষিদে পেয়েছে? চ, খাবি চ। ব'লে বাচ্চাটাকে তুলে ছুট দিল বড় পাথরটা পেরিয়ে। ওয়ানি পেছন পেছন ছুটে গিয়ে দেখে মাঠের ধারে খানাটার মধ্যে গোটা ছয়েক কুকুর লাস থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে আর আপোষে কামড়া কামড়ি করছে। বুড়ি বললে, ঐ দেখ, তোর মাকে খাচ্ছে—খা খা তুইও খা! পেট ভ'রে খা। বাচ্চাটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল খানার মধ্যে আর কুকুরগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই বাচ্চাটার ওপর। ওয়ানি এক লাফে নেমে যাচ্ছিল, বুড়ি ওর কাপড় চেপে ধরল, বললে, খবরদার, তুই ওর বাপকে খেয়েছিস্, মাকে খেয়েছিস্, ওকে খেতে পাবি না। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে ওয়ানি যখন নামল নিচে, কুকুরগুলো লাফিয়ে এলো ওর ঘাড়ে। ভাবল বুঝি ওও একটা লাস্।

নিশুতি রাত। আকাশ-ভরা তারা আর দুনিয়া-ভরা অন্ধকার। হাঁটা মানুষগুলো মনে হয় বাঁচা মৃতদেহ। প্রেতাত্মার চেয়ে ভয়াবহ। অন্ধকারে পথ চলতে পায়ে পায়ে লাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। বাচ্চার কান্না, অর্দ্ধমৃতের গোঙানি। আল্লাহতালার নাম ধ'রে আর্তনাদ, সব মিলিয়ে যেন নরক। পথের দুধারে দূরে দূরে গ্রামগুলো জ্বলছে, আকাশটা রাঙা আভায় রাবেয়ার কথা মনে

করিয়ে দেয়। ওয়ানির মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া এক নিশুতি রাতের কথা। একটা ঘরে পুরো সংসার থাকে, মা বাপ, ছোট ভাই আর ওরা দুজন। অনেক রাতে ও যদি একটু কাছে যায় তাহলেই রাবেয়া রেগে আগুন হয়ে যায়, বলে, ছিঃ লজ্জা সরম কিছু কি নেই? তাহলে, কি হবে? অভিমান ক'রে ওয়ানি বলে, থাকব না কি সারা জীবন দুটো ভাই বোনের মতন? দুষ্টু রাবেয়া বলে, দুঃখ কোর না, ব্যবস্থা হবে। ষোল বছরের মেয়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে ঠিক শেখ আবদুল্লাহ। সন্ধ্যা যেমনি হয় হয়, মার পায়ে কেঁদে প'ড়ে রাবেয়া বলে, আমি গুনাহ করেছি। মা বলেন, কি? রাবেয়া বলে, গুনে গেঁথে ভেড়া তুলতে গিয়ে দেখি একটা কম। দিলে-নাদানটা বোধহয় মাঠেই র'য়ে গেছে। মা গালে হাত দিয়ে বলেন, হায় আল্লাহ, শিগগীর যা নইলে নেকড়ে ধরবে। রাবেয়া বলে, বরখুদা, একলা যেতে পারব না, জিন ধরবে! তুমিও চল সঙ্গে! মা বলেন, আমি? আব্বার রুটি করবে কে? তাহলে তুই বরং আবদুলকে নিয়ে যা। রাবেয়া গাল দুটো লাল ক'রে বলে, হায় আম্মি, ও আমি পারব না, আমার লজ্জা করে! মা হেসে বলেন, শোন পাগলির কথা, খাবিন্দের সঙ্গে যাবি, লজ্জা কিসের? আমরাও তো গেছি বয়স কালে, এখনই না হয় যাই না, ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। যা শিগগীর, নইলে দিলে নাদান বেচারা বেঘোরে প্রাণ দেবে।

সেদিনও ছিল এমনি ধারা আকাশ-ভরা তারা আর দুনিয়া-ভরা অন্ধকার, আর ছিল আসমানের ঐ গোলাপী আভা রাবেয়ার গাল দুটো জুড়ে। হাত দুটো ধরে, আর উচ্ছল ঝর্ণার মতন বেণীটা দুলিয়ে ফেরার পথে রাবেয়া জিজ্ঞেস করল, মন ভ'রে পেয়েছ? হ্যাঁ, আবদুল বলেছিল, পেয়েছি, আমার দিলে-নাদান।

ঐ নরকের মধ্যে দিয়ে আঠারো মাইল পথ চলা খুব কম কথা নয়। পাট্টন পৌঁছে পা'টা টান করবার জন্যে আবদুল ওয়ানি যখন

মসজিদের ধারে কম্বল বিছিয়ে বসল রাত তখন আদ্ধেক। সবে একটু তন্দ্রা পানা এসেছে, চোখে পড়ল গাড়ির আলো। ভাবলো বুঝি বাস, হাত তুলে থামিয়ে দেখে, ইয়া, আল্লাহ, এ যে সেই রাইফেলধারী হজরত আর সঙ্গে সেই বারান্দা হাসপাতালের পরীর মতন পনেরো বছরের মেয়েটা। হজরত যাচ্ছে বারামূলা ; ওয়ানি পা দুটো জড়িয়ে ধরল। হজরত বলল, মাথা খারাপ, সেখানে কি যাবি, সারা সহর পুড়ছে আর সব মানুষ পালিয়েছে। কুকুর বেড়ালই নেই, তো বিবি বাচ্চা। ওয়ানি বললে, সহরে নেই, আমার বিবি বাচ্চা আছে মেম পাদ্রিদের হাসপাতালে। তখন মেয়েটা বললে. আহা কামাল, ওকে তুলে নাও, সেখানে হামলাদাররা কিছু করেনি, আমি কাল বিকেল পর্যন্ত দেখেছি। কামাল বিরক্ত হ'য়ে বললে, রুকায়া তুই একদম বাচ্চা, যে শয়তানরা ষাট বছরের বুড়িদের পর্যন্ত ছেড়ে কথা বলেনি তারা কি মেম সাহেবদের ছেড়ে দেবে ? রুকায়া তবু বলে, আহা চলুক। হাজার হাজার লোক বিবি বাচ্চা ফেলে পালিয়েছে, একজন যদি তাদের জন্যে মরণের মুখে যায়, সে তো শহিদ ! চলুক। ওয়ানি ওর কথা শুনে কেঁদে ছিল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোন ভাষা পায়নি।

সময়ের আন্দাজে শেষরাতেই কামালের জীপ্ পৌঁছোল বারামূলা। ওয়ানিকে কামাল নামিয়ে দিল চকের চৌমাথায়। এধার ওধার লোক ছিল না একটাও তাই মিশন হাসপাতালের সঠিক সংবাদ কিছু জানা গেল না, কিন্তু চষমখোর শিখ ড্রাইভারদের বাসের ভাড়া কামালের জানা ছিল—বারামূলা থেকে শ্রীনগর মাথা পিছু ষাট টাকা (চার দিন আগে পর্যন্ত ভাড়া ছিল চোদ্দ আনা।) তাই রুকায়া বার বার ওকে বলে দিল, বিবি বাচ্চা নিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা না ক'রে ও যেন এইখানেই অপেক্ষা করে পরদিন সন্ধ্যাবেলা, ওরা কোন এক ফাঁকে ওকে তুলে নিয়ে যাবে জীপে। এটা কিন্তু দয়া নয়, রুকায়া বেশ জোর গলায় জানিয়ে দিল, এটা

ওর শের-দিলের সেলামী। মৌতের মুখে যে নিজের জান কুরবানি দিতে ছুটে আসে বিবি বাচ্চাদের জন্যে, সে মানুষ নয়, পীর। পরিনির্বানীয় কৃতজ্ঞতায় ওয়ানি রুকায়ার রুহির মতন হাত দুটো বুকে চেপে ধ'রে বলল, 'বেটি তুই সত্যিই বেহেস্তের হুর, আল্লাহতালার আশীর্বাদ।' ওকে নামিয়ে শিউপুরের পথে জীপ ছুটে গেল উর্দ্ধশ্বাসে। আসবার সময় কামাল ডাক্তারের কাছে সংবাদ পেয়েছিল যে সেখানকার জেনানা হাসপাতালে হানাদারেরা মেয়েদের নিয়ে পশুর খেলা খেলছে। সাহেব ডাক্তারটি সব ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, কামাল তার রাইফেলের ভয় দেখিয়ে সঙ্গে ধ'রে এনেছে।

চকই হল বারামুলার বড় বাজার। একেই কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে ছোট্ট সহরটা। এদিক ওদিক ছোট বড় বাড়ি আর সরু কাঁচা রাস্তা। ধান চালের বেশ বড় আড়ৎ ব'লে দিন আর রাতের প্রভেদ এখানে অল্প, জীবন কখন থামে না। আজ কিন্তু সারা সহর নিঃসাড়, একটা কুকুর বেড়ালও নেই। কোনদিন কোন মানুষ এখানে যেন কখন ছিলই না। ঈদের ক্ষীণ চাঁদ আগের সন্ধ্যায় দেখা গেছে তাই আজকের রাতটা আকাট অন্ধকার হওয়ারই কথা কিন্তু, চারিদিকে আকাশ-ভরা লালচে আভায় গাছ বাড়ি সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওয়ানি বেশ খানিকটা অবাক মনে হিসেব করতে থাকে ঈদের রাতে এমন ধারা আকাশ জীবনে কখন দেখেছে কিনা। পঞ্চাশটা ঈদের পাঁচ-মেশালী স্মৃতি আছে কিন্তু আকাশের এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য আগে কখন দেখেছে ব'লে ওর মনে পড়ল না।

বারামূলায় ওয়ানি আগে বহুবার এসেছে ঠিকই কিন্তু মেম পাদ্রিদের হাসপাতালটা ঠিক যে কোন্ দিকে ওর জানা নেই, কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে যে জেনে নেবে তারও উপায় নেই। সারা দিনের পথ চলায় সারা দেহ ঝিমঝিম করছে অথচ রাবেয়াকে

না দেখা পর্যন্ত স্থির হ'য়ে বসার উপায়ও নেই। কোন্ পথে যাবে, কি ক'রে জানবে এই সব কথাই ভাবছে, এমন সময় কানে এল আসমানফাটা উন্মত্ত চিৎকার 'আল্লাহ হো আকবর!'

ময়লা ফেলা রাত-গাড়িটা পথের ধারে পড়ে ছিল; ও তারই মধ্যে লুকোতে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যেই একটা বুড়ো সেখানে ঢুকে ব'সে আছে। গলির মোড়ে পোড়া বাড়িটার পাথরের পেছনে লুকিয়ে বসল। কিছুটা প্রাণের ভয়ে, বেশীটা কি করবে বুঝতে না পেরে। মশাল হাতে আর বন্দুক কাঁধে কম ক'রে হাজার খানেক লোক। পোষাক দেখে বোঝা যায় পরদেশী; মজফরাবাদের পাহাড়ী মুলুকের বাসিন্দাও তাদের মধ্যে বহু। সামনের রাস্তা ধ'রে তারা আসছে, দুধারের দোকানে আগুন লাগাতে লাগাতে আর উন্মত্ত পশুর মতন হুঙ্কার করতে করতে; যেন সব ক্ষ্যাপা জানোয়ার, আঁচড়ে কামড়ে দুনিয়াটাকে চির চির করে দেবে। একটা ক'রে বাড়ি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে, ভেতর থেকে মরিয়া মানুষগুলোর প্রাণ-ফাটা আর্তনাদ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বেরুলেই মারবে আর মেরেই পৈশাচিক চিৎকারে পাথরও ফাটিয়ে দেয়, 'আল্লাহ তো আকবর।'

সামনের দলটা দড়ি বাঁধা লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো চকের মাঝখানে। কেউ লাথি মারল, কেউ বন্দুকের গুঁতো মারল, কেউ তার পা দুটো ধরে তুলে ওপর থেকে আছাড় মারল। একজন চিৎকার ক'রে বললে, আগ লাগাতে, আর একজন বললে, জ্বলন্ত মশাল পেছন দিকে ঢুকিয়ে দে! ওদের সবাইকে হটিয়ে দিয়ে উর্দি পরা সাহেব ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে দাঁড় করালো, বললে, শালা বেইমান গদ্দার! আমাদের ভুল পথে চালিয়েছে সারারাত। চোস্ত উর্দ্দুতে হুকুম দিল, ধ'রে আন হারামজাদার মা বাপ ভাই বোন আর বৌকে। হাজার কণ্ঠে চিৎকার উঠল 'আল্লাহ হো আকবর।' লোকটার দাঁড়াবার

ক্ষমতা নেই, পড়ে গেল। সাহেব আবার হুকুম দিল, বাঁধ এই শুয়ারের বাচ্চাকে, সামনের দোকানে ঐ খুঁটিটার সঙ্গে। লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল, জনা ছয়েক লোক। সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, নিয়ে আয় সারা সহরের লোক, যে যেখানে আছে। যে আসবেনা তাকে গুলি ক'রে মারবি আর বাড়িতে তার আগুন দিবি। পাকিস্তানের পা যে চাটবে না তার কি অবস্থা হবে জেনে যাক। আবার সেই উন্মত্ত চিৎকার 'আল্লাহ হো আকবর।'

দেখতে দেখতে আকাশ জুড়ে উঠল আগুনের হল্কা। গুলির আওয়াজে প'ড়ে যাওয়া পোড়া বাড়িগুলো পর্যন্ত থর থর করে শিউরে উঠল, আবার নতুন করে। এক হুকুমের হুমকিতেই সারা সহরটা যেন ভয় পেয়ে ঘুম-ভাঙা শিশুর মতন আর্তনাদ ক'রে উঠল, আল্লাহ-র নামে; আর সেই একই আল্লাহ-র নাম ধরে হিংস্র পশুরা বার বার হুঙ্কার নিল 'আল্লাহ হো আকবর।' মানুষের আর্তনাদ আর পশুর আফসান মিলে এক বিভৎস আবর্ত আসমান ভ'রে তুললো। ওয়ানি মৃত্যু দেখেছে, মানুষকে মরতে দেখেছে, মারতেও দেখেছে কিন্তু আল্লাহ-র নামে মানুষ যে এমন পৈশাচিক হ'তে পারে তা ও দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

ভোরের আগেই সারা চক্‌টা মানুষে মানুষে ভ'রে গেল। ছেলে মেয়ে বুড়ো। জেনানা, মর্দানা। কাঁদতে কাঁদতে এলো অশীতি বৃদ্ধা, আসন্ন প্রসবা। কাঁপতে কাঁপতে এলো জরাজীর্ণ দাদা, পরদাদা। বন্দুকের গুঁতোয় আর শক্ত পায়ের লাথিতে ওরা চক্রাকারে দাঁড়াল, চকের চারিদিকে; মাঝখানটা খালি রইল, পাকিস্তানি আল্লাহ-র দরবারের জন্যে। পুরু ঠোঁটে বাঁকা সিগারেট ঝুলিয়ে উর্দিপরা কাপ্তান সাহেব এসে দাঁড়ালেন সেইখানে। অর্দ্ধমৃত জনতার কণ্ঠে আল্লাহ-র নামের আর্তনাদ ভয়ে জ'মে গেল। উনি হাত তুলে হুকুম দিলেন, পাঠান প্লাটুন।

হাজার হাজার মানুষ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়াল। চোখের পাতাও কারো পড়ছে না, পাছে শব্দ হয়। কুড়িজন পাঠান এসে দাঁড়াল, মনুষ্যাকৃতি দৈত্যের মতন। পাথরের মতন নিশ্চল, দানবের মতন নৃশংস। সাহেব সামনে দিয়ে হাঁটলেন। বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। বজ্রও বোধহয় অত কঠিন নয়, কর্কশ তো নয়ই। 'আনো হারামজাদার সারা খানদানকে!' খোলা জায়গাটায় মুখ থুবড়ে পড়ল বুড়ি মা, কিশোরী বৌ, কচি বোন আর বুড়ো বাপ। তিনজন পাঠান সৈন্য রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়াল তাদের দু পাশে। ক্যাপ্টেন সাহেব বাঁধা লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন :

'এই শালা শূয়ার কা বাচ্চা কাশ্মীরি, আমাদের শ্রীনগরের রাস্তা দেখাবার নাম ক'রে সারারাত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে আবার আমাদের বারামূলায় ফিরিয়ে এনেছে। এ যদি পাকিস্তানের সঙ্গে বেইমানি না করত, তাহ'লে আজ আমরা সারা কাশ্মীরকে পাকিস্তানের বেহেস্ত বানাতে পারতাম। এ আমাদের সঙ্গে গদ্দারি ক'রেছে, আমাদের কায়েদে আজম জনাব জিন্নার অপমান ক'রেছে, পাকিস্তানের আল্লাহতালাকে অবজ্ঞা ক'রেছে। এই ধরণের কাজ করলে কাশ্মীরিদের কি শাস্তি হবে তার কিছু ইশারা আজ আমি এখানে রেখে যাবো। যে দেখবে সে জানবে যে পাকিস্তানি আল্লাহতালার কি মহিমা, আর যে দেখবে না ব'লে চোখ বন্ধ করবে, তার চোখ গুলি দিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হবে। যে কাঁদবে, চিৎকার করবে, অজ্ঞান হবে কিম্বা চোখ বন্ধ করবে, আমাদের আইনে সে হবে পাকিস্তানের শত্রু আর শত্রুর শাস্তি...' সাহেব ঘুরে হুকুম দিলেন, 'আনো বুড়িয়াকে আর খুলে ফেল ওর গায়ের কাপড়!' আকাশ ফাটিয়ে দিল—'আল্লাহো আকবর!'

পাঠান প্লাটুনের একটা জোয়ান যাচ্ছিল হুকুম তামিল করতে, সাহেব চিৎকার করলেন, 'তুমি নয়, তোমার কাজ অন্য।' চারটে

লোক বুড়িয়াকে ধ'রে এনে ফেলল, পাকিস্তানি আল্লাহ্-র খোলা দরবারে। বায়নেটের খোঁচা দিয়ে কেটে ফেলল তার কাপড়। হাজার জনতা ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল। সাহেব হুকুম দিল, 'চালাও গোলি!' ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপায় নেই। পেছনেও চলল গুলি। আবার হুকুম হল, 'থামাও গোলি!' সাহেব চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন সব চোখ খোলা কি না। বুড়ো বাপের চোখ বন্ধ ছিল, একজন বায়নেটের খোঁচা দিতে যাচ্ছিল, সাহেব বললেন, 'ওকে নয়, ওর অনেক দেখা এখনও বাকি আছে।'

আবার সেই পৈশাচিক নীরবতা। সাহেব তার বুট-পরা পা'টা দিয়ে চেপে ধরলেন বুড়ির গলা আর হুকুম দিলেন, ওর পা দুটো ধ'রে দুদিকে টেনে ধর। নিয়ে আয় মশাল আর কর গরম একটা বড় বায়োনেট। হুকুম তামিল হল। সাহেব তাকালেন থামে বাঁধা লোকটার দিকে। সে চেয়ে আছে।

সাহেব হুকুম দিলেন 'দে পুরোটা ঢুকিয়ে।'

হুকুম তামিল হল, 'আল্লাহ হো আকবর!'

বুড়ি শুধু অস্পষ্ট বলল, 'ইয়া আল্লাহ!'

সাহেব পা'টা সরিয়ে নিলেন, 'এইভাবেই রেখে দে যতক্ষণ বেঁচে আছে। আন ওর বোনটাকে।'

এবার আর বন্দুকের বায়োনেট নয়, বন্দুকধারী পাঠান। আদ্দেক প্লাটুন। দুজন হাত ধরল আর বাকি ছজন সাহেবের হুকুম তামিল করল। মেয়েটা কাঁদল না, চিৎকার করল না। সে জানলও না পাকিস্তানি আল্লাহতালার দরবারে তার কি শাস্তি হল। আনার আগেই সে ম'রে গিয়েছিল।

আনা হল তার কিশোরী স্ত্রীকে। আসন্ন-প্রসবা সে। এবার আর শুধু পাঠান প্লাটুন নয়। যে কজন হানাদার আছে আর যতক্ষণ না মেয়েটা বলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' শমিম হাসল, বলল 'যো হুকুম কাপ্তানসাব—আমি তোমার হুকুম মানব শুধু একটা আমার

অনুরোধ। একটা শুধু রাইফেল দাও, থামে বাঁধা ঐ গদ্দারকে আমি নিজে হাতে আগে গুলি করি, তারপর বলব।' অর্দ্ধমৃত ঐ থামে বাঁধা মানুষটা চিৎকার ক'রে উঠল, 'বেইমান' আর বলল, 'কাশের জিন্দাবাদ।' আরও বলল, 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!

সাহেব বলল, 'সাবাস। এই নে বন্দুক! দেখুক সব গদ্দার কাশ্মীরি পাকিস্তানের সাচ্চা দোস্ত কে!'

শমিম তুলে নিল বন্দুক, খুলে দিল সেফ্‌টি আর গুলি করল, চক্ষের পলকে, সাহেবকে। এবার পুরো বারামূলা চিৎকার ক'রে উঠল, 'আল্লাহ হো আকবর!'

সাহেব গেল কিন্তু তার হাজার প্রেতাত্মা এক একটা হানাদারের মধ্যে। পাঠান প্লাটুনের সর্দার এসে দাঁড়াল ওর কাছে। চিৎকার ক'রে উঠল—'হুকুম তামিল কর!'

থামে বাঁধা স্বামী চিৎকার ক'রে বললে 'শমিম ভয় নেই, আল্লাহতালার নাম কর!'

শমিম পাগলের মত হেসে উঠল, বললে:

'মকবুল, সে বেইমান ম'রে গেছে!'

জনতার মাতম শুরু হল আটটার পর, যখন হানাদারের দল পা বাড়াল শ্রীনগরের দিকে। যাওয়ার আগে তারা থামে বাঁধা মকবুল শেরওয়ানিকে তেরোটা গুলি মেরে গেল। একটা একটা ক'রে, পা থেকে আরম্ভ ক'রে মাথা পর্যন্ত।

ওয়ানি মেম পাদ্রিদের হাসপাতালে পৌঁছোল বেলা এগারোটায়। হাসপাতাল তখন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে আর উন্মত্ত হানাদারের দল প্রকাশ্য রাজপথে তেরো জন নান-এর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রে চলেছে। তাদের সারা দেহ দিয়ে রক্তের বন্যা বইছে, কেউ কেউ ম'রেও গেছে কিন্তু হানাদারদের ভ্রূক্ষেপ নেই এক বিন্দু। তাদের নৃশংস লালসার রূপ এক, ছন্দ এক, ভাষাও এক—'আল্লাহ হো আকবর!'

ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি ওয়ানিকে প্রশ্ন করি :

'আর তোমার বিবি বাচ্চা ?'

ও এবার একটু হাসে, বলে : 'আমার জেনানা বড় ভক্ত ছিল আল্লাহতালার। সেই জন্যেই তিনি ওর ওপর বেসমাল মেহেরবাণী করেছেন, মেয়ের ওপরও।'

একটু যেন আমার ভয়টা কাটল, তবু অস্পষ্ট প্রশ্ন করলাম :

'কি রকম ?'

'হানাদাররা যখন বড় মেম সাহেবকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝখানে অত্যাচার আরম্ভ করল, ও তখন ছিল দোতলার কোণে রান্নাঘরে। ও পাগলের মতন চিৎকার করে উঠল, হায় আল্লাহ! সেইটা শুনে হানাদারের দল তাকাল ওপর দিকে আর ছ' সাতজন ছুট দিল ওকে ধ'রে আনবে ব'লে। একটুও ভয় পায়নি রাবেয়া। ও চট ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে মেয়েকে টেনে নিল, বুকের মধ্যে আর আদর ক'রে বললে কাঁদিস্ কেন পাগলি, ভয় কি, আমাদের আল্লাহ আছে, না ? ব্যস্ তারপরই বিজলি সুইচের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আঙুল দুটো।' এক মিনিট চুপ ক'রে রইল ওয়ানি বুড়ো, ভেবে নিল, বোধহয় আল্লাহতালার সঙ্গে রাবেয়ার শেষ মুহূর্তের পরমতম সংযোগটুকু, তারপর বললে :

ঐ পোড়া হাসপাতালের কোণের ঘরে ঠিক ঐ ভাবেই ওদের মা বেটিকে পেয়েছিল রুকায়া।'

'রুকায়া ?'

ও বললে : 'হ্যাঁ মহারা। বারামূলার চকে আমায় না দেখতে পেয়ে ঐ হুর দলবল নিয়ে এসেছিল আমার খোঁজে হাসপাতালে! আমি তখন পাথরের মতন ব'সে আছি ভাঙা গেটের ধারে। ওরাই খুঁজে বের করল, রাবেয়াকে আর বিটিয়াকে। এমন পুড়েছিল যে চেনাই যেত না যদিনা হাতে তার এই আংটিটা থাকত।'

'কোন আংটি ?'

পরম স্নেহভরে ওর বাঁহাতের কোড়ে আঙুলে পরা আংটিটা বার দুয়েক আঙুলের ওপর ঘুরিয়ে ও হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বাঁকা চোরা লোহার আংটির লাল রংয়ের কাঁচ লাগানো—পাথরও হ'তে পারে।

'সেই যেদিন আমরা ছোট্ট ভেড়া দিলে-নাদানকে খোঁজবার অজুহাতে পালিয়ে গিয়ে এক পলকের জন্যে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলাম চশ্‌মা সাহির কিনারায়, সেদিন এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আর অনেকখানি পাওয়ার এক ফাঁকে এটা ওর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

ওর সব হারানো জীবনে ঐ ছোট্ট স্মৃতির সঞ্চয়টুকু আর একবার দেখে নিয়ে ও বললে: 'এমন পাগলি দুনিয়ায় দেখিনি! যেদিন ওকে শ্রীনগর নিয়ে গেলাম বাইস্‌স্কোপ দেখাতে সেদিন বললাম, চ' তোকে চাঁদির আংটি কিনে দি। ও বললে, ইয়া আল্লাহ, সে কি এর মতন ভালো? বুঝলেন মহারা, অনেক বোঝালাম কিন্তু কিছুতেই কিনল না!'

কথায় কথায় কত যে বেলা গড়িয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ দেখি প্রায় পাঁচটা। এসে ট্যাক্‌সিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক ছিল, যে ব্যবস্থা ক'রে বলরাজ আমায় সরকারি গাড়ি পাঠাবে। সেটা এসেছে কিনা জানতে গেলে দুধগঙ্গা পেরিয়ে ও পাহাড়ের কিনারায় যেতে হবে। ওয়ানি বললে, তুমি বোস, মহারা, আমি দেখে আসছি। নিজের বয়সের দিকে তাকিয়ে এতোখানি পথ ওকে পাঠাতে লজ্জা করল, কিন্তু ও কিছুতেই শুনল না, হেসে বললে, 'কাশ্মীরির বয়স দেহে নয়, মনে। লোল (ভালোবাসা) করলে আমরা জান কবুল ক'রে দিতে পারি!'

ওয়ানি চক্ষের নিমেষে পাকদণ্ডি ধ'রে নিচে নেমে গেল, আর আমি আনমনা হ'য়ে আনত সায়াহ্নে নিজেকে ছড়িয়ে দিলাম। আমরা সহরের সভ্য মানুষ, শিক্ষার বড়াই করি, সংস্কৃতির নামে

শপথ করি কিন্তু জীবনের মূল্যবোধে ওয়ানির তুলনায় আমরা কতটুকু? ওর কুঁচকে যাওয়া আঙুলে কাঁচ বসানো লোহার আংটিতে স্নেহ ভালোবাসার যে অসীম সঞ্চয়, আমাদের ম্যানিকুার করা আঙুলের হীরের আংটিতে তার এক কণাও কি আছে? মনে পড়ে গেল, কোন একদিন চাঁপা-কলির মতন এক সুন্দর আঙুলে আমি হীরের আংটি পরিয়ে ভেবেছিলাম, ভালোবাসা বুঝি আমার অক্ষয় হ'য়ে রইল। হঠাৎ একদিন দেখলাম সেই আঙুলের ইসারাতেই তিনটে জীবন তছনছ হয়ে গেল, আর এক পুরুষের আরও একটি আংটির মোহে! 'আল্লাহ হো আকবর!'

'আসলাম্ ওয়ালেকম্!'

চম্‌কে তাকালাম।

॥ আট ॥

দোসরা সন্ধ্যা

দেখবার মতন চেহারা তাতে সন্দেহ নাই। লোকটা ছ'ফুট লম্বা, কম ক'রে বেয়াল্লিশ তার ছাতি। কালো বোখারা টুপি. তা দেওয়া গোঁফ, ডোরা কাটা হাঁটু ঢাকা কামিজ আর ময়লা সালোয়ার। পায়ের পেশোয়ারিটি ধুলিধূসরিত। প্রকৃতির প্রাচুর্য্যে মানুষ হয় ব'লে কাশ্মীরি চোখে চমৎকার একটা কমনীয়তা থাকে। এর চোখ ছোট, চাউনি প্রখর। কাশ্মীরি নয়, পাঠানও নয় যে পাকিস্তানি ব'লে সন্দেহ করব। সহর হ'লে জানবার কিছু থাকত না, সহজেই আদাবটা ফিরিয়ে দিয়ে আলাপ জমাতে পারতাম। হারানো কোণ ব'লেই যত হয়রানি! এক পা এগিয়ে এসে, লোকটা আবার বললে :

'আদাব জনাব।'

ভাষা শুনে বোঝা গেল, লোকটা পাঞ্জাবি। গলায় তাবিজ আছে, অতএব মুসলমান।

'আদাবরজ।'

ও এসে আমার পাশে বসল লাল রঙের রুমাল বিছিয়ে। আমি স'রে ওর জন্যে জায়গা ক'রে দিলাম। বসতে বসতে চোস্ত উর্দ্দুতে লোকটা বললে :

'আপনি কাশ্মীরি ?'

প্রশ্ন করার ধরণটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। বললাম :

'আজ্ঞে না।'

'তাহ'লে ?'

'বাঙালি।' স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা খুব অবাক হ'য়েছে। চোস্ত উর্দু ছেড়ে এবার পাকা ইংরেজীতে বলল :

'আপনার কথা শুনে বোঝবার উপায় নেই।' আমি উর্দুতেই জবাব দিলাম :

'সবাই তাই বলে।'

'এখানে ?'

'একটু কাজ ছিল।'

এক নজর আমায় বন্দী ক'রে লোকটা জানতে চাইল :

'কি কাজ ?'

আমি কিছু বিরক্ত বোধ করলাম। অহেতুক কৌতূহল এমনিতেই আমার খারাপ লাগে। বারামূলার বর্বর ইতিহাস আর হীরের আংটির বিশ্রী প্রহসনে মনটা আরও খারাপ ছিল। গোদের ওপর বিষফোড়া হল ঐ ফিলম্ প্রসঙ্গ। ও কথা উঠলে লোক একেবারে জোঁকের মতন পেয়ে বসে। ফিলম্ করি শুনলে অত্যন্ত অসাধারণ মানুষও জনসাধারণের মতন কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। তাই ইচ্ছে ক'রেই ঐ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বললাম :

'একজনের বিষয় কিছু অনুসন্ধান করছি। নাম হয়ত শুনেছেন। মেহজুর।'

লোকটা চমকে তাকালে, তারপর এক গাল হেসে বললে :

'আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

মেহজুরকে সবাই জানে আর বলরাজকে সকলেই চেনে, অতএব আমাদের ছবির কথা সারা কাশ্মীরে ইতিমধ্যেই যে ছড়িয়েছে তা আমার জানা ছিল। ও ভাববে এ আর এমন আশ্চর্য্য কি। লোকটা বললে, 'কতদূর এগুলো আপনার কাজ।'

'অনেকখানি।'

'আর কতদিন লাগবে ?'

'দিন দুয়েক।'

লোকটা অহেতুক আনন্দে আমার পিঠ চাপড়ে বললে,

'সাবাস্!...আপনার হেড কোয়াটার কোথায়?'

'ওয়াজির বাগ্!'

লোকটা মনে হল আরো অনেকখানি খুশী হল। ছবি করি শুনলে লোক অবাক হয় কিন্তু হিরো হওয়ার দাম অনেক বেশী। ঠিক তেমনি। লোকটা পকেট থেকে প্যাকেট বের করল, বললে:

'নিন!'

অজানা সিগারেট। প্যাকেটটা উর্দুতে লেখা। একটু অবাক হলাম। তিরিশ বছরের নেশা, তিনশো রকম প্যাকেট দেখেছি আদ্দেক পৃথিবী জুড়ে। কিন্তু উর্দুতে লেখা প্যাকেট কখন দেখিনি। সিগারেট যেমনই হক, নতুন ব্রাণ্ডের একটা আলাদা স্বাদ আছে। লোকটাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করল। পেটে খাবার পড়লে মনের ঔদার্য্য বাড়ে এটা বিলেতে থাকাকালীন শুনেছিলাম। সিগারেটের ধোঁওয়ায় আজ সেটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রশ্ন করলাম: 'আপনি?'

ইংরেজিতে ছোট্ট জবাব দিল:

'বাটার ফ্লাই।'

বোঝা শক্ত নয়। রকম বে-রকমের প্রজাপতি ধরা আর বোর্ডে পিন দিয়ে গেঁথে ড্রয়িংরুম সাজানো একটা জনপ্রিয় সাহেবি নেশা। বিলেতে বহু দেখেছি। কাশ্মীরের পথে প্রান্তরে ওদের ছড়াছড়ি, নানান রঙের, নানান আকারের। বোঝা গেল ও তারই ব্যবসা করে। আরও কিছু খোঁজ খবর নেব কিনা ভাবছি, ওয়ানি বুড়ো খবর দিল গাড়ি আসেনি। পাঁচটা বাজে; প্রমাদ গুনলাম। পাহাড়ি পথ পেরিয়ে ঐ তিরিশ মাইল যেতে লাগবে কম ক'রে ঘণ্টা দেড়েক। বাসে গেলে ঘণ্টা তিনেক তো বটেই। লোকটা বললে: 'কোথায় যাবেন? হেড কোয়ার্টার?'

একটু থতমত খেয়ে জবাব দিলাম :

'নেমন্তন্ন আছে।'

'কোথায় ?'

বাধ্য হ'য়ে বলতেই হল :

'সাদেক সাহেবের বাড়ি। ওঁর ছেলের কাছে।'

লোকটা এবার রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হ'য়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল বেশ মিনিট খানেক। 'কোথায় ?'

হেসে বললাম : 'কেন ? বিশ্বাস হল না ? সাদেক সাহেবের বাড়ি !'

'ও !'

জবাবটা ছোট্ট কিন্তু অবিশ্বাসটা স্পষ্ট। বোঝা গেল ও ভেবে নিয়েছে আমি মিথ্যে কথা বলছি। সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার জন্যেই বোধহয় বললে : 'চলুন আমার জীপ আছে।'

বাঁচা গেল। ফেরা নিয়ে ভাবনা হ'য়েছিল, আমায় মিথ্যুক ভেবেছে ব'লে খুশীই হলাম। ও বললে :

'চলুন।'

শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে ক্ষমাতীত অপরাধ হবে, তাই বললাম :

'আপনি এগিয়ে যান আমি শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আসছি।'

'ওঁকেও চেনেন নাকি ?'

হেসে বললাম :

'এখানে আমি ওঁরই অতিথি !'

'ইয়া আল্লাহ! চলুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাই। নাম অনেক শুনেছি কিন্তু দেখা করার সাহস হয়নি।'

শাহজীর সদর দরজা আর সাদর অভ্যর্থনা সকলের জন্যে সমান। উনি লোকটিকে বুকে ধ'রে বললেন :

'মেহজুর যতদিন ছিল, লোকের অভাব ছিল না। আবার তার যুগ আসছে আর আমাদের বাড়িতে জনাবরা।'

লোকটার ইচ্ছে ছিল জমিয়ে আড্ডা দেয় কিন্তু আমার তাগাদায় আর বসা হল না। আন্দাজ ক'রেছিলাম আমিন থেকে যাবে, গেলও। শাহজী একবার বলতেই ও একেবারে রাজি। মামার বাড়ির অমন রান্না ছেড়ে ঐ খাইয়ে মানুষ হোটেলের খাবার খেতে শ্রীনগর ফিরবে এমন কথা ভাবাই অন্যায়। আবার আসার আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে শাহজী আর আমিন আমাদের বিদায় দিলেন দুধগঙ্গার এপার থেকে।

চারিদিকে বড় বড় পাহাড় আছে ব'লে এ অঞ্চলে রোদ্দুরটা চট ক'রে চ'লে যায়। দুধগঙ্গার ওপারে ছোটখাটো পাহাড় আর বড় বড় পাথরের জন্যে চলার পথটা হারিয়ে ফেলা খুবই সহজ। এখানকার মানুষ যখন যেখানে ইচ্ছে পথ ক'রে নিয়ে হাঁটে ব'লে চারিদিকেই পথের চিহ্ন আছে আর গাড়ির বালাই নেই ব'লে আসল আর নকলের মধ্যে প্রভেদ বোঝা শক্ত। কাজেই, পথের দিকে নজর ছিল ব'লে মুখে আমাদের কথা ছিল না। কথা না বলার আরও একটা কারণ ছিল রুকায়া। হীরের আংটি-পরা হাতের ধাক্কা খেয়ে মেয়েদের প্রতি মনটা আমার এ ক'বছর ঘৃণায় বিষাক্ত ছিল। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক পরিপূর্ণতার ছোঁওয়া লেগে মনটা কিছু নরমই হ'য়েছিল। তাই রুকায়ার আকর্ষণ দাগ কাটতে সময় নেয়নি। অচেনা পথের ওপর ঐ অজানা মানুষটা আবার নতুনের ছায়া ফেলল। শাহজী সতর্ক করে দিয়েছেন, ওর জন্যে বহু মানুষ মজনু হ'য়ে আছে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার বয়স নেই, অথচ পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। আমার ঘর বাঁধার বালাই চুকেছে, ওর ঘর ভাঙার ভয়ও আছে। এড়িয়ে যাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু কেন? আবার, এগিয়ে যাব—তাইই বা কেন? এখানে আমার থাকার মেয়াদ অল্প। কাজ আরম্ভ হ'লে কখন

কখন আসব। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত কচিৎ কখন দেখা হবে। অনেকখানি পাওয়ার লোভ, আরও অনেকখানি দূরত্বের ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠল। গড়িয়ে যাওয়া বিকেলের শান্ত পারিবেশেও মনটা অশান্ত হ'য়ে উঠল। লোকটা বললে :

'কি ভাবছেন ?'

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম :

'ভবিষ্যতের কথা।'

হেসে লোকটা বললে :

'ভাবনা নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে!'

গ্রামের প্রান্তে এসে দেখা গেল গাড়ি নেই, গাছের তলায় একটা লোক ব'সে আছে কম্বল মুড়ি দিয়ে। লোকটি গিয়ে তাকে কি বলল, সে ছুটে চ'লে গেল বাঁ দিকের রাস্তা ধ'রে পাহাড়ের দিকে। ওর ব'সে থাকার ভঙ্গিমা, কথা বলতে বলতে এর সচকিত চাউনি আর ত্রস্তপদে ঐ লোকটার চ'লে যাওয়া, সহজ হ'লেও বেশ কিছু অস্বাভাবিক মনে হ'ল। হয়তো সবটাই আমার সন্দিগ্ধ মনের আশঙ্কা কিম্বা অবচেতনার অনুভূতি, তবু মনের কোণে কোথায় যেন বেসুরো বাজল। লোকটা আমার পাশে এসে বলল :

'দেরি হ'য়ে যাচ্ছে ?'

'নাঃ।'

'কটায় যাওয়ার কথা ?'

'সাড়ে সাতটায়।'

বেশ দামি হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে লোকটা বলল,

'অনেক সময় আছে!' থেমে বলল, 'কাজ সব ঠিক ঠিক হ'য়ে যাবে তো ?'

কথা বলতে ভালো লাগছিল না তাই ছোট্ট উত্তর দিলাম। 'আশা করছি!'

জীপ এলো, আনকোরা নতুন টায়ারের গন্ধ ভুর ভুর করছে।

লেফ্‌ট্‌ হ্যাণ্ড ড্রাইভ, কাশ্মীরের নম্বর। আমি আর দেরি না ক'রে উঠে বসলাম। ও ড্রাইভারকে বললে :

'শ্রীনগর যাও, সাহেবকে নিয়ে।'

'কোথায় ?'

'সাহেব যেখানে বলবেন।'

ড্রাইভার বেশ কড়া নজরে আমায় দেখে নিয়ে বললে :

'জি আচ্ছা।'

এদিক ওদিক চেয়ে লোকটা আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করলো : 'সঙ্গে মাল আছে ?'

বুকটা আমার ধড়াস্‌ ক'রে উঠল। এতো গায়ে-পড়া আলাপের কারণ এবার আন্দাজ করা গেল। টাকার প্রয়োজন ছিল না তাই সঙ্গে বিশেষ কিছু আনিনি। হাতঘড়িটা পরের, আংটিটা পুরোন আর পেনটার দাম পাঁচ সিকে। মনে মনে লোকসানের হিসেবটা ক'রে নিয়ে ভয়ে ভয়েই বললাম :

'না। এখানে দরকার ছিল না তাই সঙ্গে কিছু আনিনি।'

'পথে কি তাহ'লে ওয়াজিরবাগ হ'য়ে যাবেন ?'

ওয়াজিরবাগ পৌঁছোতে পারলে আর যাই হোক অন্ততঃ প্রাণটা থাকবে। সেই আশাতেই বললাম : 'হ্যাঁ।'

ও তখন ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল :

'আছে ?'

সে ছোট্ট উত্তর দিল :

'জি না।'

লোকটা পট্‌ ক'রে তার জামার আস্তিনের বোতাম খুলে বের করল একটা ছোট্ট রিভলভার, দিয়ে বলল, 'সঙ্গে রাখো।'

এতক্ষণ মনের মধ্যে ভয়ের একটা ঝড় বইছিল। এবার আরম্ভ হল কৌতূহল। সবটাই যেন হেঁয়ালি, অথচ সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে জেনে নেব, এমন সাহস নেই। মনে মনে ঠিক ক'রে নিলাম,

যাওয়ার পথে লুঠতরাজের প্ল্যান যদি থাকে তো বিনা দ্বিধায় সব কিছু দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মনে মনে আরও একবার হিসেব ক'রে দেখা গেল, দিলে যা যাবে তা অল্প, যা থাকবে—যদি থাকে, তা পয়সা দিয়েও মেলে না—প্রাণ। কৌতূহল মাথায় থাক, কোন রকমে শ্রীনগরের এলাকায় পৌঁছোতে পারলে বাপের নাম। ভাবনার বোঝা হাল্‌কা করার জন্যে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললাম :

'আসুন।'

আমার যাতায়াত সাধারণতঃ থার্ড ক্লাসের স্লিপিং কোচে! তার জন্যে চারমিনারই যথেষ্ট। কিন্তু প্লেনে ওঠার আগে কায়দা ক'রে ষ্টেট্ এক্সপ্রেস কিনেছিলাম অনেক দাম দিয়ে। পরে তার জন্য অনুতাপও কম হয়নি কিন্তু এখন, প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ভালো সিগারেট দামে যতই ভারি হক না কেন নেশাখোরদের কাছে তার মান আলাদা। লোকটা মহানন্দে মাথা নাড়ল, আর হ্যাংলার মতন হাত বাড়ালো। ওর ভাবে আর ভঙ্গিতে বোঝা গেল ওর প্ল্যান যাই হক, আমার প্রাণের প্রয়োজন বোধহয় নেই। ও আদাব ব'লে স'রে দাঁড়াল। আমি আরাম ক'রে হেলে বসলাম। গাড়ি ছুটল আর সেই সঙ্গে আমার মনটা। সারাদিনের ছোটখাটো কথা আর ঘটনার রাশি আমার সচেতন মনে কোথায় যেন কাঁটার মতন বিঁধে রইল কিছুটা ভয়ের ছোঁওয়া নিয়ে আর বেশীটা রহস্যের ঘন অন্ধকারে।

দেশটা যাই হক কলকাতা কি কাশ্মীর, রাতের চেহারা প্রায় সব জায়গাতেই সমান, আকাশটাই যা আলাদা। এখানকার বাতাসে ধূলোর প্রলেপ নেই ব'লে আকাশটা ঘন নীল আর সূর্য্যাস্তের নেশায় পলকে পলকে রং বদলায়। আকাশের এ সৌন্দর্য্য ইচ্ছে ক'রে দেখিনি, বাধ্য হ'য়েই দেখেছিলাম, আমার ড্রাইভার সাহেবের নির্বাক গাড়ি চালানো আর মাঝে মাঝে আমায়

বেঁশ কড়া নজরে দেখাটা ভালো লাগছিল না ব'লে। নিজের কথা অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ভাবছিলাম ব'লে ওকে প্রথমটা লক্ষ্য করিনি। আরিগামের কাছ বরাবর টাল সামলাতে না পেরে ও এমন জোরে ষ্টিয়ারিং ঘোরালো যে ঠিকরে আমি প্রায় বেরিয়েই যাই আর কি। তারপর থেকে ওর দিকে আধ চোখে আর পুরো মন দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে সামনে একটুখানি সোজা রাস্তা পেলেই ও আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে আর ওর ওপর মনটা রেখে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর হাসি পেল। অযথা ওকে সন্দেহ করছি। রিভলভারটা যদি আমার জন্যে হয় তাহ'লে আমার সামনে ওকে সেটা দেওয়া হত না। অতএব ওটা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। কিন্তু ওরই বা কিসের ভয়? সাহস ক'রে প্রশ্ন করলাম:

'এদিকে কি ভয়ের কিছু আছে?'

ও আমার দিকে না তাকিয়েই বলল:

'না। রামবাগ পুলের কাছে আছে।'

আমি একটু অবাক হলাম। পুলটার অনেক আগে থেকেই অল্পবিস্তর লোকালয় আরম্ভ হ'য়ে যায় আর ওটার ওপারেই শ্রীনগরের শুরু। তাহ'লে ভয়টা কিসের এবং কেন? ভাবনার বোঝা হাল্‌কা করতে গিয়ে রহস্যের বোঝা কিছু ভারিই হ'য়ে উঠল। কিন্তু ভেবে লাভ নেই অতএব গুন গুন ক'রে গান ধরলাম। এটা আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। মনের ভয় যত বাড়ে গানের সুর তত সাফ হয়। কথা অবশ্যই মনে থাকে না কিন্তু বানাতে কতক্ষণ?

পুল পেরিয়েই চেকপোষ্ট। সকালবেলা সাহেবজাদার সঙ্গে গেছি এবং দুপুরবেলা সেলামও পেয়েছি অতএব এখন আবার স-সেলাম ছাড়া পাওয়া গেল। গাড়িটা থামাতে হ'য়েছিল তাই ঘড়িটা দেখে নিলাম। সাড়ে সাতটা প্রায় বাজে। ওয়াজিরবাগ যাওয়ার ব্যবস্থাটা রদ্‌ করে বললাম, 'গাগরিবল!'

ও বলল :

'কোথায় ?'

বোধহয় ঠিক মত শুনতে পায়নি। তাই আবার বললাম :

'গাগরিবল।'

সেটা কোথায় ?'

আরও এক প্রস্থ অবাক হলাম। কাশ্মীরের ড্রাইভার গাগরিবল চেনে না ? কথাটা অবিশ্বাস্য।

'ডাল লেকের ডান দিকে, শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের তলায়।'

ডাল লেক পর্যন্ত ঠিক গেল, তারপর বলল, 'এবার ?'

বোঝা গেল সাদেক সাহেবের বাড়িতে কখন যায়নি। পথটা আমারও খুব স্পষ্ট জানা ছিল না কারণ দরকারি কাজে সর্বদা সরকারি গাড়ি পেয়েছি। তবু আন্দাজ ক'রে বাড়ির গেট পর্যন্ত পৌঁছোন গেল অনায়াসে। গাড়ি থেকে নেমে আগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সময় মত পৌঁছেছি, সামান্য হ'লেও জিনিষগুলো যায়নি আর প্রাণটা ঠিকই আছে। নিরাপদে পৌঁছোনোর নিবিড় আনন্দে ওকে বলতে ভুলে গেলাম যে সামনের রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক, গাড়িটা না ঘোরালেও চলবে। সেপাই গেটটা খুলেই রেখেছিল। আমি ভেতরে ঢুকলাম আর ও গাড়ি ঘোরালো।

গেট পেরোলেই গাছের ঝাড়। সেটা ঘুরে শ' খানেক গজ গেলে তবে দু'ধাপ সিঁড়ি আর দু'ধারে বাগান। আরও শ খানেক গজ গেলে তবে বাড়ির বারান্দা। বলরাজ সেইখানে ছিল সাহেব-জাদার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় মগ্ন হ'য়ে। মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়ে সাত কথা শুনিয়ে দেব আগেই ঠিক ক'রেছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না। ও বললে :

'যা ইচ্ছে তাই বল ক্ষতি নেই কিন্তু দোষটা ঠিক আমার নয় ভাগ্যের। গাড়ি গেল বিগড়ে আর ট্যাক্‌সি দিল বাগড়া।

ভাবছিলাম কি করা যায়, রফিক সাহেব বাতলে দিলেন যে অতিথিকে একদিনে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ আর যেই হক, শাহজী নন। অতএব, আমরা ঠিক করছিলাম যে কাল সকালে তোমায় শাহজীর আপ্যায়নের অত্যাচার থেকে উদ্ধার ক'রে আনব। এখন বল, এলে কি ক'রে?'

ঐ মানুষটার ওপর মেজাজ করতে পারে এমন মানুষ ওর মেয়ে ছাড়া আর অন্য দেখিনি। হেসে বললাম:

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়! এসেছি এক নতুন জীপে সঙ্গে ছিল সশস্ত্র ড্রাইভার!'

'নতুন জীপ?' রফিক সাহেব অবাক হ'য়ে তাকালেন।

'একদম। আনকোরা। নতুন টায়ারের গন্ধ নাকে এখনও লেগে আছে।'

'কার জীপ?'

'বিপদে ফেললেন।' হেসে বললাম, 'নাম তো জানি না, তবে পেশা বলতে পারি। প্রজাপতি ধরার ব্যবসা আছে!'

'সে আবার কি? ও ব্যবসা কাশ্মীরে কেউ করে বোলে আমার জানা নেই!'

আমি এসে গেছি শুনে খাওয়ার ডাক পড়ল। ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে রফিক সাহেব বললেন:

'হেঁয়ালি ছেড়ে হক্ কথাটা বলুন তো! নতুন জীপ তো আছে এক পুরোন পাপীর কিন্তু তার ব্যবসা লরীর। মেয়ে নিয়ে মাতামাতিও করে কিন্তু সব কটাই চামচিকে একটাও বাটারফ্লাই নয়! কিন্তু তার গাড়িতো এ বাড়ি পর্যন্ত আসবে না!'

হেসে বললাম:

'সর্বনাশ! একটা গাড়ি নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি হবে জানলে লোকটার নাড়ি নক্ষত্রের ইতিহাস নিয়ে আসতাম।'

রফিক সাহেব নাছোড়বান্দা, ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন:

'পেলেন কোথায়? আর সে দিলই বা কেন?'

'তাহ'লে তো আপনাকে সারাদিনের সবিস্তারিত ইতিহাস বলতে হয়।'

উনি হেসে বললেন:

'প্রথম পর্বটা বাদ দিতে পারেন, রুকায়ার কাছে সেটা আমাদের শোনা হ'য়ে গেছে।'

রুকায়ার নাম শুনে নিঃশ্বাসটা বন্ধ হ'য়ে গেল। সারা বিকেলের ব্যাপ্তিতে ওর কথা একবারও মনে হয়নি। আকাশে রঙের খেলা দেখতে দেখতেও না। নিজের প্রতি সন্দেহ হল; ও কি তাহ'লে শুধু মাত্রই দৈহিক আকর্ষণ?—না কাশ্মীরের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে মন ভরেছে ব'লে দেহ তার দাবী জানালো?

রফিক সাহেব তাড়া দিলেন:

'কৈ বললেন না? এতো কি ভাবছেন?'

হেসে বললাম,

'মনটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম।'

পার্সিয়াকে হার মানানো কাশ্মীরি কার্পেটের ওপর ব'সে সায়াহ্নের ইতিহাস সবিস্তারে সবেমাত্র বলতে আরম্ভ করেছি, বাধ সাধল ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের সর্বময় কর্তা সর্দ্দার সাধু সিং। সে এসে সংবাদ দিল যে জীপ ড্রাইভার 'ওয়ান ওয়ে' নিয়ম মানে নি ব'লে তাকে আটক করা হয়েছে, এখন সাহেবের কি হুকুম? প্রিয়াকে পাশে নিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও মানুষ বোধ হয় অতটা খুশী হয় না যতটা রফিক সাহেব হলেন। 'আসছি' বলে উনি এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুযোগের সুবিধে নিয়ে বলরাজ বললে,

'তুমি কি যাদু জানো?'

'সে আবার কি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে!' বলরাজ বললে, 'সারা সন্ধ্যা রুকায়া সে ইশারাই দিয়েছে!'

'কি রকম?' একটু আগে মনে যে সন্দেহ হয়েছিল, এক পলকে সব যেন মুছে গেল। মনটা সজীব হ'য়ে উঠল। দেহটাও সচকিত।

'ঘটনাটা মুখে বলেছে, অঘটনের ইঙ্গিত চোখের ভাষায়। এবার তোমার দিকটা শুনি।'

ওর কাছে না বলার মতন আমার কোন কথা নেই। কিন্তু বলা আর হল না।

'আদাব!'

দরজায় দাঁড়িয়ে রুকায়া। রুক্ষ কাজের ক্লান্তিভরা রুকায়া নয়, প্রথম রাতের প্রাতিভাসিক রুকায়া। রূপ আর যৌবনের এমন অস্বাভাবিক সমন্বয়, শিল্পীর কল্পনাতেই শুধু থাকে, তাও সকলের নয়। সুন্দরী কথাটা সামান্য, অপরূপ সুন্দরী কথাটাও অসম্পূর্ণ। কাছাকাছি হল শ্রীসুন্দরী। আবার দেখার আনন্দ আর উবছে পড়া আকর্ষণে আদাব জানাতেও ভুলে গেলাম। সিঞ্চিত সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় পাশে বসে বলল, 'এলেন কি ক'রে।'

গুছিয়ে জবাব দেওয়ার আগেই জোর একটা কলরব শোনা গেল। ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকে রফিক সাহেব বললেন, 'ড্রাইভার প্রথমে বলেছিল আপনার জীপ, পরে বলেছিল আপনার ভাড়া করা জীপ।'

'তাই বুঝি? এখন কি বলছে?'

'সাধু সিং যখন হুকুম নিতে এসেছিল তখন সে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে উধাও হ'য়েছে। কাসেম যে নম্বরটা টুকে রেখেছিল সেটা বারামূলার পুলিশ সাহেবের গাড়ির সঙ্গে মেলে।'

'তাহলে জীপটা নিশ্চয় তাঁর!'

'সেটাতো আনকোরা নতুন নয়, তাছাড়া পুলিশ তো আর প্রজাপতির ব্যবসা করে না!'

'তাঁর কোন আত্মীয়ের করতে বাধা কোথায়?'

রুকায়া বললে, 'খোঁজ নিলেই তো হয়।'

রফিক সাহেব সিগারেট ধরালেন, 'তাই ব'লে এলাম।'

কালিন বেছানো ঘরে কাশ্মীরি কায়দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হল এক থালায় চারজন ক'রে। মাঝখানে ঢিপি ক'রে ভাত রাখা থাকে আর যে যার দিক থেকে কুরে কুরে খায়। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ থাকে না, তবে মেয়েরা আলাদা বসে। এ ব্যবস্থায় সাম্যবাদ যতই থাক, আমাদের সংস্কারে কোথায় যেন বাধে ব'লে পেট ভরলেও মন ভরে না। সকলে এইভাবে বসলেও, রুকায়া আমার আর বলরাজের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা ক'রে দিল আর আমাদের পাশেই ও নিজের জায়গা ক'রে নিল। সান্নিধ্যের মোহ ওরও কিছু কম নয়। রুকায়া যখন ছিল না তখন কথার ফাঁকে বলরাজ বলল—

'যাদুকর, ও কে নিশ্চয় জানো?'

'জানি, কিন্তু জেনেও কোন লাভ নেই।'

'কেন?'

'কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য ওর মধ্যে কতখানি তা কি দেখোনি?'

'দেখিছি' বলরাজ বললে, 'সেইজন্যেই তো ভাবনা। তুমি যদি মন হারাও তো রবি ঠাকুরের কবিতা শোনাবে আর ও যদি কাশ্মীরের পুরমিতা প্রকৃতির মাঝখানে ব'সে তোমার মুখ থেকে তা শোনে তাহলে ও যে দেশকাল হারিয়ে দেয়াসিনী হ'য়ে উঠবে। তখন?'

রুকায়া ইতিমধ্যে আবার এসে বসল বলে ও প্রসঙ্গ বন্ধ করতে হল। ও চালাক মেয়ে আর পুরুষ চরিত্র খুব বোঝে। হেসে বলল—

'আমার সম্বন্ধে আলোচনা আমার শুনতে খুব ভালই লাগে।'

হেসে বললাম, 'আলোচনা নয়, আমরা করেছিলাম আপনার সমালোচনা।'

'বেশ তো। না হয় তাই ই শোনা যাক।'

একদিনের আলাপে অনেকখানি ভালোই লেগেছে ওকে, খুঁত কিছু খুঁজে পাইনি। তবু, সমালোচনা যখন করতেই হবে তখন সামান্য জিনিষ নিয়ে করাই ভালো। তাই বললাম, 'আপনি তো কাশ্মীরি, শাড়ি পরেন কেন ?'

মেয়েরা যতই আধুনিক হক না কেন পোষাকের নিন্দে কিছুতেই পছন্দ করে না। রুকায়ার ধবধবে ফর্সা মুখে গোলাপীর একটা জোয়ার ব'য়ে গেল। খুব সন্তর্পণে নিজেকে সামলে নিয়ে ও আমায় পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি তো বাঙালি, ধুতি পরেন না কেন ?'

বলরাজ হেসে ফেলল, 'আক্রমণই আত্মপক্ষ সমর্থনের সোজা পথ !'

'ধুতি পরি না কারণ ধোওয়ানোর অসুবিধে। আরও একটা কারণ হল পুরোপুরি অর্থনৈতিক। খারাপ ধুতির দামে ভালো প্যান্ট পাওয়া যায়। এ দুটো অজুহাতের একটাও কিন্তু আপনার পক্ষে খাটে না। ঝোব্বা ধোওয়ানোর অসুবিধা নেই আর যে শাড়ি প'রে আছেন তার দামে কম ক'রে চারটা ঝোব্বা পাওয়া যায়। এ ছাড়া যদি কিছু অজুহাত থাকে, বলুন।'

রুকায়া হেসে ফেলে বলল, 'হার মানলাম। আসলে এটা আপনাদের অনুকরণ !'

বলরাজ বললে, 'সৌন্দর্য্যও বাড়ে আর সুবিধেও হয় !'

ওর পেছনে লাগা আমার চিরাচরিত স্বভাব, সুযোগ পেয়ে খুশী হলাম, 'শাড়ি পরিনি কাজেই সুবিধের কথা জানিনা, তবে সৌন্দর্য্য দৈহিকভাবে বাড়লেও, ধার করা পোষাকে সারল্য অনেকখানি কমে —যেমন আমাদের মেয়েদের জিন্ পরা। দেখলেই মনে হয় মেয়ে নয়, ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গির বাচ্চা !'

বলরাজ হেসে বললে, 'শ্রীমতী ঠিকই ব'লেছিলেন। মনটা তোমার মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারের প্রাপ্ত বয়স্কা বিধবার মতন।'

রুকায়া প্রশ্ন করল, 'কার কথা বললেন ?'

'ওঁর প্রাক্তন স্ত্রী।'

শাড়ির মতন, মেয়েদের আরও একটা সনাতনী দুর্বলতা হল হাঁড়ির খবর। সেখানে যদি স্ক্যাণ্ডেলের সামান্য ইশারাটুকুও থাকে তো কথাই নেই। আরও কিছু জানবার আগ্রহে রুকায়া বলল :

'অর্থাৎ ?'

আমি হেসে বললাম, 'অর্থাৎ আমার একটি স্ত্রী ছিলেন। ষোল বছর ঘর করার পর আমার সম্বন্ধে তিনি তিনটি তথ্য আবিষ্কার ক'রেছিলেন। একটি যা বলরাজ বলেছে, অন্য দুটো আমার বলতে বাধা নেই। এক, লোকটা আমি অত্যন্ত খারাপ। দুই, স্বামী হিসেবে ওঁর জানাশোনা আরও দুচারজনের আমি সমকক্ষ নই। বলা বাহুল্য, তাঁর এই আবিষ্কার আমি আনন্দ সহকারে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছি !'

'এখন ?'

অত্যন্ত চালাক মেয়ে একটা ছোট্ট কথায় ও দুটো জীবনের ইতিহাস জানতে চায়। হেসে বললাম, 'আমি ভূস্বর্গে এবং আশা করি উনি জীবনের তৃতীয় স্বর্গে !'

ভয় পাচ্ছিলাম এর পরই হয়ত ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ উঠবে। নিজের জীবন যতই হেসে উড়িয়ে দিই না কেন, ওদের জীবন নিয়ে অনেকখানি দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। কিন্তু সেটা আর উঠল না। বারামূলা থেকে খবর এলো যে পুলিশ সাহেবকে টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে সারাদিনের ইতিবৃত্ত জানিয়ে যখন উঠলাম তখন রাত বারোটা। গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এলেন রফিক সাহেব আর রুকায়া। রুকায়া বলল, 'কথায় কথায় আসল কথাটাই জানা হল না। আপনার কাজ কতদূর এগুলো ?'

'অনেকখানি। জীবনের ইতিহাস সবটাই জানা হয়ে গেছে।'

'কে বলল ?'

'ওঁর জানা শোনা ষাট পঁয়ষট্টিজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছি আর সারা কাশ্মীর ঘুরে এসেছি।'

'সত্যি?' আনন্দে যেন উবছে পড়ল রুকায়া, 'শুনতে হবে তো। কাল কি করছেন? চ'লে আসুন না চা খেতে!'

চায়ের একটা নেমন্তন্ন বলরাজই আমাদের দুজনের হ'য়ে গ্রহণ করেছে ওর এক সহপাঠীর বাড়ি। অথচ ওইই বললে, 'ঠিক কথা। তুমি তো ফ্রি আছো, চ'লে এসো।'

'আচ্ছা। কিন্তু কোথায়? এখানে?'

রুকায়া এক চোখ রফিক সাহেবকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। ধরুন চারটে, কেমন?'

কিছুটা আনন্দে কিছুটা আশঙ্কায় আমি বললাম, 'আচ্ছা!'

যত রাতেই বাড়ি ফিরি না কেন আর কাজ থাক বা না থাক, টেবিলে বসা আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। আজ কাজ অনেক ছিল, তবু টেবিলে বসা হল না। বলরাজ হাসতে হাসতে বললে, 'বুঝলাম, বুড়ো বয়সে আবার পথে বসলে।'

॥ নয় ॥

দোসরা রাত

'এইভাবে ছুনিয়াটাকে সৃষ্টি ক'রে আর ইচ্ছেমত ইনসানকে আবাদ করার পর আরম্ভ হল জানোয়ার আর চিড়িয়ার ভাগ বাঁটোয়ারা। মেহেরবান খুদাতালা নিজে আর বাঁটোয়ারা করলেন না, ইনসানকে ডেকে বলে দিলেন, যার যা মর্জি নিয়ে যাও।

আফ্রিদিরা সবার আগে নিল হাতী, সিংহ, হরিণ, যা ছিল ভালো সুন্দর সব। সাহাবরা সৌখীন মানুষ, তারা নিল কুত্তা আর বিল্লি। আরবীরা মস্ত আদমি তারা নিল ঘোড়া। হিন্দুস্থান ধর্মের পূজারী, তারা নিল গরু আর মেয়েদের কথা ইয়াদ ক'রে নিল ময়ূর।

সবার শেষে খুদাতালার কাছে গেল কাশ্মীরি। জানোয়ার তখন আর কিছুই বাকি নেই, আছে চিড়িয়া। সে তাই নিয়েই খুশী মনে চলে আসছিল, হঠাৎ শুনল, পেছন থেকে কে যেন করুণ কণ্ঠে তাকে ডাকছে। ফিরে দেখে একটা ভেড়া। সে বেচারা নিতান্ত গোবেচারি নিরীহ ব'লে কেউ তাকে নেয়নি। কাশ্মীরি তাকে তুলে নিল কোলে। আল্লাহতালা খুশী হয়ে বললেন, তোদের দিল্ সবার সেরা। তিনি ছুয়া দিয়ে দিলেন, বললেন, থাক্ তোরা গিয়ে পাহাড়ের ওপর যেখানে শীতল বাতাস আছে, শ্যামল প্রকৃতি আছে, ঝর্ণার জল আছে আর আছে আমার ছায়া। ব্যস্ সেই যে আমরা চলে এলাম এইখানে, আর কোথাও আমরা যাইনি।'

গল্পটা পুরো শুনে তবে ফকীর মহম্মদকে ছাড়ল তার বড় ছেলে, সাত বছরের ছোট্ট খিচু। এর মধ্যে বিবিজান বার তিন চার তাগাদা

দিয়েছে, ঐ ঘরের কোণ থেকে, ময়দানে যাওয়ার জন্যে কিন্তু খিছু ছাড়েনি। এ গল্প সে আব্বার কাছে বহুবার শোনে সারা শীতকাল ধ'রে কিন্তু মন তার কখনই ভরে না। শুধু খিছু নয় গুজ্জরদের সব ছেলেমেয়েই এই গল্প শুনে আসছে যুগ যুগ ধ'রে। সেই জন্যেই বুঝি তারা তাদের পাহাড়ি এলাকা আর ভেড়ার দল ছেড়ে কখন কোথাও যায় না।

এটা শক্ত সমর্থ পুরুষের বাড়িতে থাকার মরশুম নয়, ফকীরও ছিল না, আগের দিন রাত্রে এসেছে। বিবিজানের সন্তান হওয়ার কথা ছিল তাই। মেয়েরা ঠাট্টা করেছে চোখ উল্টে 'এ আবার কোন দেশী মরদ রে আল্লাহ!' করবারই কথা। বসন্তের প্রথম ইশারা পেলেই ওরা যে ভেড়ার দল নিয়ে ময়দানে যায়, আর নামেনা শীতের আগে পর্যন্ত, তা সে ছেলেই হক আর বাপই মরুক। এসে যদি দেখে ছেলে হয়েছে তো ভেড়া কাটে, মদ খায়, নাচ গান করে। যদি শোনে বৌ মরেছে তো আবার নিকে করে। এইই ওদের জীবনের ধারা সেইই আদিমকাল থেকে চ'লে এসেছে। ব্যতিক্রম ঘটালো ফকীর। ময়দানে যাওয়ার আগে বিবিজান আল্লাহতালার নামে কসম্ খাইয়ে নিয়েছিল অন্ততঃ একবেলার জন্যেও যেন সে আসে। ফকীর হেসেছিল, বলেছিল, 'কেন রে দিয়ানা এ আব্দার কেন?' বিবিজান ব'লেছিল, 'ঐ যে বললি, দিয়ানা! তোকে না দেখলে আমি যে দিয়ানা হয়ে যাই আর এমন শয়তান পেটে দিয়েছিস্ যে সারাদিনরাত লাথি মেরে মেরে আমায় তোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আসবি তো?'

ফকীর তাই এসেছিল, খুশীও হ'য়েছে। খুদাতালার দুয়া না হ'লে এমন ভাগ্য কজনের হয়? একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে ছেলে। আর ছেলে কি। একেবারে বাপ কা বেটা। গ্রাম থেকে ময়দানে উঠতে লাগবে কম ক'রে ঘণ্টা আটেক তো বটেই, তাই বিবিজান সেই দুপুর থেকে তাগাদা দিচ্ছে অনবরত, এবার যা নইলে

আন্ধেরা হ'য়ে যাবে। ওর আর যাওয়ার মন নেই, এটা ওটা ব'লে কেবলই দেরি করছে। আসলে ইচ্ছে ছিল আরও একটা দিন থেকে যায়। বিবিজান বাধ্য হয়ে ভয় দেখিয়েছে তুই না গেলে আমিই কিন্তু উঠে যাবো। ও আদর ক'রে বললে, 'যাবি? কখন তো যাস্‌নি, চ'না একবার দেখবি, আল্লাহতালার কি মেহেরবানি আমাদের ওপর! এবার যা ঘাস হ'য়েছে, আব্বার কালে দেখিনি, যা তুষ হবে যেন বরফের চাঁই! চার মাহুর বড়লোক হ'য়ে যাব!' বিবিজান বললে, চাই না আমার চার মাহুর, হক আর একটা ছেলে, ব্যস্‌ পীর বাবা পামদিনের জিয়ারতে চার ভেড়া চাড়াওয়া দেব— আল্লাহর কসম্‌!' খুশী হ'য়ে ফকীর বললে, 'তুই চার দিবি, আমি পাঁচ দেব, একটা এই কাশ্মীরের ধরতির খাতির! ঐ তুষ ময়দানের খাতির! এই বেহেস্তের খাতির।'

যাওয়ার সময় ওর হাতে বিবিজান এক বস্তা বাখরখানি দিল, আর দু'বোতল শরাব, বললে 'যাওয়ার পথে যাকে যাকে পাবি দিয়ে যাস্‌!' ফকীর বললে, 'ইয়া আল্লা ওটা আবার এখন কেন? ফিরলে তো হবেই!' 'হ'ক' বিবিজান বললে, 'পীর বাবা পামদিনের এতো মেহেরবানি আমার আর তর সইছে না!'

এই জন্যেই ফকীর মহম্মদের পৌঁছোতে রাত হল। শুধু দিলেই তো হল না, 'গাঁয়ের খবর আছে, কে গেল কে এল তার হিসেব আছে আর আছে পাকিস্তান থেকে ধারে কাছে কোন হাম্‌লা হয়েছে কিনা তার হিসেব নেওয়া। ও শালারা একদম হারামজাদা, মাঝে মিশিলে দু পাঁচজন চুপি সাড়ে যখন তখন ছিটকে আসে, ভেড়া ছিনিয়ে নেয় আর কিছু বললে গুলি মারে। সরকারকে এরা সবাই মিলে বহুবার জানিয়েছে কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই। বক্‌সি তো এদের খেদিয়েই দিয়েছিল গালিগালাজ ক'রে। সাদেক তবু সেপাই পাঠিয়ে ব্যবস্থা ক'রেছে। হিন্দুস্থানের পল্টন, অতএব ভয় নেই একদম। হামলা তবু জারি ছিল, মাস খানেক চুপ চাপ।

ওরা আপোষে এ নিয়ে আলাপ করে কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা। একে ওরা গরীব তায় শালা হারামির জাত একমাস চুপ আছে, ব্যাপারটা কি ? চুরি চামারি না করলে তো ওদের চলেই না একদম! তা'হলে? কেউ বলে ভয় পেয়েছে সেপাই দেখে, কেউ বলে সায়েস্তা হয়েছে সাদেকের হাতে, ফকীর কিন্তু মানতে রাজি নয়, বলে, শয়তান কা বাচ্চা, মরে কিন্তু মচকায় না!

পথে বন্ধুদের সঙ্গে খুস্ খবরি আর বাখরখানির সঙ্গে মদও ভাগ ক'তে নিতে হয়েছে তাই তুষ ময়দানে উঠে এসে যখন দেখল যে চারিদিকে টিম্ টিম্ করে বাতি জ্বলছে তখন ও ভেবেছিল বুঝি ওগুলো সব সিতারা। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, আসমান প্রতিদিনের মতন জ্বল জ্বল করছে। তা'হলে? মদের নেশায় ওর বোধহয় মতিভ্রম ঘটেছে। ঝর্ণার ঠাণ্ডা জলে মুখ আর মাথাটা ভালো ক'রে ধুয়ে দৃষ্টিটা স্থির দাঁড় করিয়ে দিল সামনের দিকে। সত্যিই আলো, অনেকগুলো তাঁবুও আছে মাঠে আর পাহাড়ের সারা গায়ে যেন সহস্র জোনাকি ব'সে আজ বিশ্রাম নিচ্ছে। দুদিনেই এতো পরিবর্তন? হকচকিয়ে ভাবতে থাকে, তুষ ময়দানে হল কি? ভেড়াগুলোই বা গেল কোথায়? সভয়ে আর সন্তর্পণে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল, ভালো ক'রে দেখবার জন্যে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল শুধু আলো নয়, মাঠ ভর্ত্তি মানুষ ঘুরছে। একবার শ্রীনগরে নোয়াইস্ দেখেছিল ঠিক সেই রকম।

আরো কাছে গেল ফকীর। এখন আর ভয় নেই, ভয়ানক কৌতূহল। এতো মানুষ কোত্থেকে এলো আর কেনই বা এলো। তার চেয়ে বড় কথা, কবে বিদেয় হবে? গুজ্জররা গণ্ডীভূত মানুষ, বিদেশীদের গণ্ডগোল একদম পছন্দ করে না, আর যদি ভেড়া চরানোয় ব্যাঘাত ঘটায় তাহ'লে তো কথাই নেই! আরো একটু এগিয়ে দেখল অবাক কাণ্ড! রাইফেল আছে মেশিনগান্

আছে, ষ্টেন আর ব্রেন গানের ছড়াছড়ি কিন্তু আশ্চর্য্য, সেপাই নয় একটাও। সবাই সাধারণ পোষাকে ঘুরছে। বন্দুক আর ব্যবস্থা দেখে ভেবেছিল বুঝি হিন্দুস্থানী সেপাই ওরা, কুচকাওয়াজে এসেছে। কিন্তু তা যদি হত তবে ইতলা দিয়ে আসত যেমন মাঝে মাঝে আসে। তাছাড়া, বাস লরী আর জীপ গাড়ি তো মাঠের নিচেই থাকে। আসবার সময় সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে এসেছে, ওসব একটাও দেখেনি। গাছের আড়াল থেকে দেখে আর ভাবতে থাকে। কে ওরা? কি চায়? কোন এক কালে শুনেছিল, ময়দানে নাকি সেপাইদের ঘাঁটি হবে! ওরা বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিল আর নিচের সরলদ্রুম জঙ্গলে ওদের পীর বাবা পামদিনের জিয়ারতে গিয়ে কসম নিয়েছিল যে যতদিন একটিও গুজ্জর জীবিত থাকবে ততদিন ওরা লড়াই চালিয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে সেই ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল সাদেক সাহেবের কথায়। আজ ফকীরের সন্দেহ হল, হয়ত সাদেক সাহেব ওদের ধোকা দিয়েছে। ভাবছে গিয়ে গাঁ মোড়লকে ডেকে আনবে কিনা, পেছন থেকে একটা ইয়া ষণ্ডাপানা লোক ওর কাঁধে হাত রাখল।

'আসলাম ওয়ালেকম!'

ফকীর চমকে উঠল। এমন খুইয়েছিল ও নিজের ভাবনায় যে খেয়ালই করেনি। কথা হারিয়ে ও তাকিয়ে রইল। লোকটা হেসে ওর হাত ধরল। 'ভয় পেওনা, আমি জিন্ নই, জয়নুল।'

এইবার ফকীরের ভয় ঘুচল। 'ওয়ালেকম্ সেলাম হজরত।'

'আমার সঙ্গে এসো।'

'তোমরা কে?'

লোকটা আবার হাসল, 'ইয়া বাবা পামদিন! ভয় নেই, আমরা তোমাদের দোস্ত। এসো না।'

ফকীর তখনও ভাবছে যাবে কি যাবে না, পেছন থেকে আর একটা লোক এসে পিঠ চাপড়ালো। মুখে তার হাসি কাঁধে তার

রাইফেল। এবার সে হেসে বললে, 'আও দোস্ত!' দুজনে ওর দুপাশে এমন ভাবে দাঁড়াল যে নড়বার জায়গা নেই; অতএব না গিয়ে উপায়ও নেই। যেতে যেতে আর কোন কথা হল না। বসতির বহর দেখে ও হতবাক হ'য়ে গেল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর পায়নি এখন বোঝা গেল যে হাজার হাজার লোকের বসতি বসেছে। ওর আন্দাজে মনে হল হাজার দুয়েক তো হবেই।

পরে জানা গিয়েছিল ওরা ছিল তিন থেকে চার হাজার।

মাঠের শেষ প্রান্তে ঐ একমাত্র গাছটার ঠিক পাশে যে ছোট্ট তাঁবুটা ছিল তারই বাইরে দাঁড় করিয়ে জয়নুল ঢুকে গেল ভেতরে আর বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। পেছনে তার আর একজন লোক, দেখে মনে হল বোধহয় দলের সর্দার। তিনি ওকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন ইয়া প্রকাণ্ড ছাতির ওপর। ভাবটা যেন বহুকালের হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজে পেয়েছেন নিতান্ত অতর্কিতে। ঐভাবে ওকে নিয়ে গেলেন তাঁবুর ভেতরে আর সামনে খুলে দিলেন বিলেতি সরাবের বোতল। পিঠ চাপড়ে সর্দার বললেন: 'চলুক। আমরা তো সব ভাই বেরাদরি!'

দেশী মদের নেশা ওর অনেক আগেই ছুটে গেছে কিন্তু বোতল ও ছুঁলো না। বললে, 'আমরা হলাম গুজ্জর মানুষ ও আমাদের সয়না!'

'তাতে কি হয়েছে', সর্দার বললে, 'ভাই বেরাদরিতে সবই চলে।' ফকীর তবু খেলোনা। সর্দার নিজেই বোতলের আদ্দেকটা এক ঢোকে শেষ ক'রে ফেললেন।

'ভাবছ নিশ্চয় আমরা কে? আমরা হলাম আজাদ ফৌজ। হিন্দুস্থান এখানে ঘাঁটি করবে বলেছিল না? আমরা এসেছি সেটা বন্ধ করতে, পীর পামদিনের কসম্।'

ফকীর শুধু বললে, 'ওঃ!'

'তোমায় আমাদের সাহায্য করতে হবে!'

আবার ছোট্ট উত্তর দিল, 'কি ?'

এক বাণ্ডিল টাকা ওর কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন সর্দার। সব দশ টাকার আনকোরা নতুন নোট, ভারতীয়। বললেন, 'টাকার জন্য ভাবনা নেই। আরও লাগলে তাই পাবে।'

ফকীর টাকার বাণ্ডিলের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে রাখল সর্দারের ওপর। বললে, 'কি চাই ?'

'মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য খচ্চর। এক একটা একশো টাকা রোজ, আর প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা ক'রে চালক। তারও ভাড়া আলাদা রোজ দুশো টাকা।'

'আর ?'

'আর চাই গাইড। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

'ক'জন চাই ?'

'কুড়ি জন। আদ্দেক আমাদের নিয়ে যাবে গুলমার্গ আর বাকি আদ্দেক নিয়ে যাবে বড়গাম।' থেমে সর্দার বলল, 'দিনের বেলায় বড্ড গরম আজকাল তাই আমরা রাতের বেলায় চলব। গাইড মজুরি পাবে দিনে পাঁচশো। ভালো হ'লে হাজারও দিতে পারি।'

এইবার ফকীর হাসল, যেন সব ব্যাপারটা তার কাছে একদম পরিষ্কার হয়েছে। বললে, 'আর এমন যদি গাইড হয় যে এক রাতেই গুলমার্গ পৌঁছে দেবে ?'

'তাহ'লে সে পাবে দেড় হাজার। আছে তেমন লোক ?'

'আছে। কিন্তু গুলমার্গে।'

'আনতে পারো ?'

'সময় লাগবে।' একটু ভেবে আবার বললে 'যেতে আমায় হবেই ওখানে। খচ্চর তো আর এখানে মিলবে না।'

সর্দার অধৈর্য্য আনন্দে উঠে পড়লেন তাঁর ক্যাম্পখাট থেকে, ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আজই যেতে পারো ?'

হেসে ফকীর বললে, 'এক্ষুনি।' মুচকি হেসে আবার বললে, 'তবে সাহেব একটা কথা। আমি রাতে হাঁটি, আমার রেট আলাদা।'

'কি চাই?'

'রোজ এক বোতল মদ।'

'এক কেন দু' বোতল পাবে।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফকীর আদখালি বোতলটা তুলে পুরো খালি ক'রে দিল। বলল, 'যাই তাহ'লে?'

সর্দার বললে: 'শুভান আল্লাহ। কখন আসবে?'

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে ফকীর বললে: 'কাল বিকেলে। খচ্চর আসবে রাত লাগলে, আর রাত শেষ হওয়ার আগেই গুলমার্গ পৌঁছে যাবে।'

'বরখুদা। তা যদি হয় তাহ'লে দুনিয়ার সব দৌলত তোমার পায় ঢেলে দেব, আলবৎ।'

ফিক্ ক'রে হেসে ফকীর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। কি সব ভাবল, বিড় বিড় ক'রে বললও অনেক কিছু আপন মনে।

'কি হল?'

'গুলমার্গ সোজা যাওয়া ঠিক হবে না সাহেব। তার চেয়ে ভালো হবে তিন মাইল উত্তরে বাবা মাঝরি গামে। সেখান থেকে গুলমার্গ দূর নয়।'

সর্দার স-উৎসাহে বললেন,

'সাবাস্ এই তো চাই। এমন না হ'লে দোস্ত কিসের?'

ফকীর মহম্মদ আর দাঁড়ালো না, দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় নোটের বাণ্ডিলটা নিতে ভুললোনা। একটাই নিল অন্যটা ছুঁলোই না।

সর্দার হাঁক দিয়ে বললেন, 'আরে এটা নিলে না?'

ফকীর একটু হেসে জবাব দিল, 'গোস্তাকি মাফ। আমরা

গুজর হুজরৎ, নিমকের দাম জানি, হারামি করিনা। আগে কাম, পরে দাম!' যেতে গিয়ে আবার থেমে গেল ফকীর, বললে,

'মাঠে আমার ভেড়া ছিল, তার একটাও দেখলাম না!'

সর্দার হেসে বললেন,

'সে আমরা সব হালাল ক'রেছি। দাম পাবে। কত চাই?'

রাগে ফকীর মহম্মদের মাথা ঘুরে গেল। তার ইচ্ছে হল সর্দারকেই হালাল্ ক'রে ফেলে কিন্তু উপায় নেই। দেশের বিপদ। একটা যদি ভুল চাল হয় তো জীবনই ওর চলে যাবে। হেসে বললে,

'তাহ'লে এই বাণ্ডিলটাও নিলাম আমি। আর যদি দরকার হয় বলবেন, পীর বাবা পামদিনের কৃপায় আমাদের কাছে ভেড়ার অভাব নেই!' সর্দার কি জবাব দিলেন ও শুনলই না। হালালের জন্যে পরের কাছে ভেড়া বিক্রি করা জবরদস্ত গুনাহ। ও কথা শোনাও পাপ! ফকীর দৌড় দিল। যেতে যেতে শুনল পাকিস্তান রেডিও থেকে কি সব হচ্ছে।

শুধু হাঁটলে চলবে না, ফকীর মহম্মদ ছুটতে আরম্ভ করল। আল্‌পাথর হ্রদ পেরিয়ে অপর্বত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এলো পীর বাবা পামদিনের দুয়া চাইতে চাইতে। এসব জায়গায় প্রতিটি পাথর ওর চেনা, হ'ক না যতই অন্ধকার, আন্দাজেই ও পথ চিনে নেয়। ভয় খালি ঐ ভল্লুকদের। এ অঞ্চলে এমনই ওদের উপদ্রব যে রাত বেরাতে পথ চলবে এমন বীরপুরুষ দুনিয়ায় নেই।

আজ কিন্তু ওর না আছে ভয় আর না আছে ভাবনা। পীর বাবা পামদিনের নাম নিয়েছে, বাবা মাঋষির কাছে মানতও করেছে। ওরাই ওর সবখানি ভরসা। যেতে যেতে ভাবতে থাকে, ওরা চাইলে কি না হয়? পর পর তিনটে ছেলে হবে এ কথা কি ও ভেবেছিল? ওদের দুয়া হয়েছে তাই হয়েছে। ওদের কাছে মানত করে মনের মতন সন্তান পেল আর এইটুকু পাবে না? ভয় যে

ওর হয়নি তা নয় কিন্তু ভল্লুকের ভয়ে কাবু হয়ে এমন মুল্লুকটাকে বিপন্ন করলে নিমকহারামি হবে। গুজ্জররা সব পারে, পারে না শুধু ঐটে। ধরতি হল ওদের জিয়ারত। জান দেবে তবু জিয়ারত দেবে না।

এমনই পীর বাবার দুয়া আর বাবা মাঋষির মেহেরবানি যে পথে বিপদ তো দূরের কথা, একটা ভল্লুকের দেখা পর্যন্ত মিলল না। শুধু কি তাই? অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে, ছোট বড় পাথরও গড়িয়েছে, কিন্তু পা'টা ওর একবারও পেছলায়নি। এইভাবে সারারাত পথ হেঁটে ও গুলমার্গ পৌছলো ভোর আজানের আগে ভাগে।

॥ দশ ॥

তেসরা সকাল

সাজাহানের দেওয়া নাম 'গুলমার্গ' মানে গোলাপের কানন। সত্যিই তাই। গোলাপ এখানকার প্রখর প্রকৃতির প্রদীপ্ত প্রদ্যোত। শীতকালের কটা মাস বাদ দিয়ে, সারা বছর তারা আপন আনন্দে ফোটে আর, রূপ রং আর সৌরভের অসীম ঔদার্য্যে, পাহাড়ের ওপর সমতল ভূমিকে নৈমিষারণ্য বানিয়ে রাখে। মহারাজার এটা ছিল গ্রীষ্মাবাস, সাহেবদের সুইজারল্যাণ্ড। ছোট বড় বাংলো, ফলের বাগান আর রঙিন ফুলের ঝাড় চারিদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে, আপন ইচ্ছে মত। অসীম সৌন্দর্য্যের চরম অরাজকতা। সম্রাট সাহাজাহান এখানে আসতেন কবিদের নিয়ে, মহারাজরা আসতেন কামিনীদের নিয়ে, বহু সাধু আর সাধক এসেছেন করঙ্ক নিয়ে, সাহেবরা আসতেন কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আর শেখ আবদুল্লাহ এসেছিলেন কারাবরণের দিন গুপ্ত কমিশন নিয়ে।

ফকীর মহম্মদ এলো ভোরবেলা কাশ্মীরের পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। ও প্রকৃতির কোলে মানুষ, আলোর সঙ্গে দিন বাঁধা, সাহেবি আদব কায়দা কিছুই জানেনা। খোঁজ খবর নিয়ে ও গিয়ে হাজির হল মেজর সাহেবের বাড়ি। বেড্‌টির সময়ই হয়নি তখন, বিছানা ত্যাগ তো দূরের কথা। এই অসময় সাহেবের কাছে আসার গ্রাম্য বেয়াদপি সান্ত্রী সইবে কেন? ফকীরকে সে আমলই দিল না। ব্যস্ত হ'য়ে ফকীর যখন গলা উঁচু করল, তখন ভেতর থেকে হুকুম এলো, 'মারকে ভাগা দো'। ব্যথাহত ফকীর গেল পুলিশ চৌকিতে দারোগাবাবুর কাছে। ব্যাপারটা শুনে সে ওকে নিয়ে গেল, জানাশোনা এক সেপাইর কাছে। সে শুনল, বুঝলও

ব্যাপারটা সবই, কিন্তু এমন তার সাহস নেই যে সাহেবের কাছে ওকে পৌঁছে দেয়। ফকীরকে সে চা দিল, আর নটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখল। নটার পর মেজর সাহেব এলেন, সেলাম নিলেন, কাগজ সই করলেন, সহকারীদের নিয়ে সভা করলেন তারপর ফকীরের আসার সংবাদ শুনে বললেন, কাল আসতে বল, আজ কিছু ব্যস্ত। ব্যর্থ হ'য়ে ফকীর মহম্মদ ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু যাওয়া তার হল না। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সে পেছন ফিরে তাকালো, কি মনে হল কে জানে, ব'সে পড়ল পাশের চিনার গাছের তলায় আর কাঁদতে লাগল, ছেলেমানুষের মতন। গেটের সেপাই জিজ্ঞেস করল, অমন ক'রে সে কাঁদছে কেন? ফকার আবার সব বলল। সে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে। শোনা যায় বড় সাহেব নাকি সব শোনার পর বলেছিলেন:

'বোগাস্! হ'তেই পারে না। তূষ ময়দানের পেছনে, খাগ পাহাড়ের ওধারে আমাদের কড়া পাহারা আছে! সেখান থেকে একটা মানুষ আসতে পারে না, হাজার মানুষ তো দূরের কথা!' ক্যাপ্টেন কোহলি যখন টাকার বাণ্ডিলের কথা তুললেন তখন সাহেব টেবিল চাপড়ে বললেন:

'স্মাগলর! ওকে আটকে রাখো আর সহজে যদি সত্যি কথা না বলে তো শক্ত হাতে ওকে শাস্তি দাও!' তারপর যা হ'য়েছিল ব'লে শোনা যায় তা এমনই অবিশ্বাস্য যে ভাবতেও লজ্জা করে, লেখা তো দূরের কথা! কোহলি সাহেবের পেড়াপিড়িতে বেলা এগারোটা নাগাদ সাহেব নাকি নিমরাজি হ'লেন।

'যেতে পারো,' সাহেব বললেন, 'কিন্তু পুরোপুরি তোমার নিজের দায়িত্বে। যদি সত্যি না হয় তাহ'লে শাস্তি পাবে।'

'সঙ্গে লোক?'

'নিতে পারো, বেশী নয়, জনা পঁচিশ। জেদ যখন ধ'রেছ দেখে এসো!'

কথাটা শুনে ফকীর নাকি হেসে ব'লেছিল :

'পঁচিশজন হজরত? ওরা যে কম ক'রে দু'হাজার। দেখা ঠিকই হবে কিন্তু দেখে আর আসা হবে না।'

আসেও নি কেউ ফিরে। পঁচিশজন সেপাই, ক্যাপ্টেন কোহলি ফকীর মহম্মদ, কেউ না। ফকীরের কঙ্কাল তবু পাওয়া গিয়েছিল, অন্য কারো চিহ্ন পর্যন্ত মেলেনি।

ওদের বিনিময়ে যা আমরা পেয়েছি তার নাম কাশ্মীর।

*　　　　　　*　　　　　　*

সাদেক সাহেবের বাড়ি হল ডাল লেকের ধারে, জায়গাটার নাম গাগরিবল। ওঁর বাড়ি পেরিয়ে বাঁহাতেই যে ছোট্ট কাঠের বাড়ি তার মালিক ছিলেন কাদের মিঞা। উনি ছিলেন হাঁজি, অর্থাৎ হাউসবোটের মালিক। প্রথম পাকিস্তানি হামলায় উনি যখন মারা যান তখন ওঁর বড় ছেলে মহীউদ্দিনের বয়স ন' বছর। পুরো সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ও গেল ওদের হাউসবোটের হাল ধরতে আর ভাইকে দিল স্কুলে ভর্তি ক'রে। ভাই লেখাপড়া করল না, বললে ও হাঁজি বাচ্চার কম্ম নয়। অন্য হাঁজিরা হেসে বললে, কেমন বলিনি আমরা? বাপ ঠাকুদ্দার পথ নে!

মহীউদ্দিন অত্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ কিন্তু হাঁজিদের কথা শুনে ওর গা জ্বলে গেল। গোপনে আরম্ভ করল পড়াশোনা। সারাদিন নৌকা চালায় আর ভাড়াটেদের হুকুম খাটে আর তাদের দিন শেষ হ'লেই আরম্ভ হয় ওর ব্যাকুল সাধনা। সারা শীতটা কাজ নেই, খুব সুবিধা, লেখাপড়া নিয়েই কাটিয়ে দেয় সময়। এইভাবে আট বছর দুরূহ সাধনার পর একদিন সবাই অবাক হ'য়ে দেখল, মহীউদ্দিন হাঁজি কেবল ম্যাট্রিকই পাশ করেনি, সরকারি দপ্তরে কাজও পেয়েছে। নূর মহম্মদ ওয়ানি ন' খানা বোটের নাম করা হাঁজি। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে নূরু হাঁজি নিজের মেয়ের সঙ্গে

ওর বিয়ে দিল ঘটা ক'রে। সে রকম ঘটা নাকি ও পাড়ায় অনেক বছর ঘটেনি।

মহীউদ্দিনের কাজটা খুব বড় নয় কিন্তু দায়িত্ব অনেক। ও হল রাজস্ব বিভাগের পাটওয়ারি। জমির মালিকানা বদল হ'লে ওর মতামত চাই সবার আগে, মাপ নিয়ে ঝগড়া হ'লে ওই সেটা মেটায়। বাকি বকেয়াও ওই আদায় করে। অনাদায়ে ডিক্রি করা যেমন ওর হাতে, আবার খাজনা মাপ করাও ওরই হাতে।

বক্সি যখন কাশ্মীরের সর্বময় কর্তা ও তখন চাকরিতে প্রথম ঢোকে, বক্সিরই আমন্ত্রণে। আসলে কিছুই নয়, হাঁজি সম্প্রদায়কে হাতে রাখার একটা বনেদি চাল। ওরা ভালো মানুষ অত সত বোঝে না, তাই মহীউদ্দিন ওঁকে শ্রদ্ধা কর'ত নিজের বাপের মতন। সেই সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী সাহেবের বড় কুটুম যখন ওর এলাকায় ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়ের চেষ্টা করলেন ও তখন তাঁকে মেরে ভাগিয়ে দিল। সেই রাগে বক্সিসাহেব ওকে পাঠিয়ে দিলেন হাজিপীরের কাছাকাছি বীরুতে। ওকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর শালাবাবু কাজ সারলেন আর এই অবসরে মহীউদ্দিনের শ্বশুর যখন ওকে ফিরিয়ে আনবার দরবার করল, তখন উনি উদার আনন্দে রাজি হলেন।

মহীউদ্দিন যখন আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো, যানবাহন বিভাগের নিম্নতম কেরাণী, মন্ত্রী সাহেবের ঐ শালাবাবু তখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের (কাশ্মীরের জাতীয় কংগ্রেস। আজকাল ওর নাম হ'য়েছে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।) সেক্রেটারি। মহীউদ্দিন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে এসেই চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করল, এই দিন দুপুরে ডাকাতি চলবে না, চলবে না, চলবে না। সবাই বারণ করল, বললে, দুটি সন্তানের বাপ হ'য়েছিস, কি দরকার বাপু চেঁচামেচি ক'রে? ও বললে, কি হবে? আমায় খুন করবে? করুক! আমিও তো বাপ মরা ছেলে মানুষ হ'য়েছি।

ওরাও হবে। শালাবাবুর ষড়যন্ত্রে মহীউদ্দিন আবার বদলি হ'য়ে চলে গেল বীরু।

ন' তারিখে ছিল উরস-এর মেলা। মহীউদ্দিনের বড় সন্তান, সাত বছরের কচি ছেলে কমরু বাপকে নিজের হাতে চিঠি দিয়েছিল চ'লে আসতে, হাত ধ'রে যাবে মেলা দেখতে। মহীউদ্দিন সাতদিনের ছুটি নিয়েছিল, তিন থেকে দশ, আর সঙ্গে নিয়ে যাবে ব'লে, সন্তানদের জন্যে কিনেছিল এক শিশি লজেন্স রীতিমত শ্রীনগর থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো। বুড়ী মার জন্য আনছিল এক শিশি মধু। ঠাট্টা ক'রে ওর সহকারি লম্বরদার লাল বাহাদুর জিজ্ঞেস করেছিল, বিবির জন্যে কি নিলে? মহীউদ্দিন সমান সুরে ব'লেছিল, বিবি কি আর সহজে ছাড়ার মানুষ, কেনা জিনিসে তার মন ওঠে না, সে চায় এমন জিনিস যা কেবল আমিই দিতে পারি তাই মনে করেছি এবার দেব একটা মেয়ে।

বীরু থেকে বেরিয়ে মাইল চারেক হাঁটা পথে এলে তবে বাস পাওয়া যায়। পথটা পুরোই পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে আসে। মহীউদ্দিন মনের আনন্দে চ'লে এলো মাইল দুয়েক। সেখানে এক পাহাড়ি নদী পেরোলো কাঠের ঝোলানো পুল ধ'রে। তারপর একটু ওপরে উঠে মোড় ঘুরলেই দুই পাহাড়ের কোলে জুগু খারিয়ার মাঠ। ওপর থেকে মহীউদ্দিন মাঠটা দেখে থমকে দাঁড়াল। এই মাঠে যে এমন ভারি মেলা বসবে এ খবর তো সে পায়নি! অবাক কাণ্ড! বক্‌সির আমলে এ ধরণের বে-সরকারি কাজ দু চার বার হ'য়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাদেক সাহেব তো সে ধরণের মানুষ নন। মনে মনে ও ঠিক ক'রে নিল শ্রীনগর যখন যাচ্ছেই তখন ওকে না জানিয়ে ওর এলাকায় এই সব বে-আইনি কাজ নিয়ে একটা হৈ-চৈ করবেই। সাদেক সাহেব সরকারি কাজের মর্ম বোঝেন, তা'ছাড়া শালা পোষণের বদনাম নেই। মনে মনে মহীউদ্দিন অভিযোগের কাঠামোটা পর্যন্ত মক্‌স করে নিল।

আরও একটু নিচে নেমে আরও খানিকটা অবাক হল! মেলা নয়, কারণ মেশিনগান আছে। তাহ'লে? সোজা পথেই ও চ'লে যেতে পারত কিন্তু ওর এলাকায় এমন কাণ্ড? খোঁজ না নিয়ে যায় কি ক'রে? তাছাড়া অভিযোগ করতে হ'লে কারণটা সঠিক জানাও দরকার। কে ওরা? কি চায়? কেনই বা এসেছে ওর এলাকায় ওকে না জানিয়ে! সোজা পথ ছেড়ে ও নিচে নামার পথ ধরল, রাগে গর গর করতে করতে। রাগের আরও একটা মস্ত কারণ হল এই জুগু খারিয়ার মাঠের ধারে কাছে যত সব ধেনো জমির চাষ নিয়ে মামলা মকদ্দমার শেষ ছিল না। সন্ধি সীমানার বারো মাইলের মধ্যে ব'লে এখানকার পুরোণো বাসিন্দারা ছেড়ে গিয়েছিল প্রথম আক্রমণের পর। নতুন যারা এসেছিল তারা বেপরোয়া জংলী মানুষ। ও এসে মামলা থামিয়ে মিটমাট করার পর আজ বছর দুই হল ফসল ফলছে। নিচের বেয়াদপ লোকগুলো তারই ওপর জুড়ে বসেছে। এতে শুধু লোকগুলোর ক্ষতি নয়, কাশ্মীরের ক্ষতি।

মাঠের ধার পর্যন্ত নামতেই ওকে ঘিরে ধরল, একেবারে অচেনা অজানা মানুষগুলো। মহীউদ্দিন চালাক মানুষ, একচোখ দেখেই বুঝল ওদের মতলব ভালো নয়। ওরা কিন্তু আদরে আর আপ্যায়নে ওকে অস্থির ক'রে তুললো, পারলে যেন মাথায় তুলে নাচে! ওকে নিয়ে লোকগুলো উঠে গেল পাহাড়ের কোলে একটা গুহার মধ্যে। সর্দার ব'সে চিঠি পড়ছিলেন। লোকগুলো আলাপ করিয়ে দিল, ইনি আমাদের মোড়ল আর এই হল এ তল্লাটের হাকিম, মহীউদ্দিন। আর এক প্রস্থ আপ্যায়নের ঝড় ব'য়ে গেল। মহীউদ্দিন বুঝল, ও শক্ত হাতে পড়ছে, সহজে ছাড়া পাবে এমন আশা অল্পই।

কিন্তু পেল। মোড়ল মশাই স্পষ্ট ভাষায় দয়া ভিক্ষা চাইলেন, বললেন, আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা ওঁরা, পাকিস্তানি সৈন্যদের

অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পালিয়ে এসেছেন, স্ত্রী পুত্র পরিবার সব ছেড়ে, হিন্দুস্থানী প্রাচুর্য্যে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন বলে। বাধা দিয়ে মহীউদ্দিন বলল :

'তাহলে এতো বন্দুক কামান কিসের ?'

'এগুলো ?' সর্দার বলল, 'আমাদের সায়েস্তা করবে বলে পাকিস্তানি সৈন্য এসেছিল। আমরা সদলে তাদের ঘেরাও করে কেড়ে নিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল, আবার যদি সৈন্য আসে, লড়ে যাবো, কিন্তু শোনা গেল এবার ওরা নাকি আসছে হাজারে হাজারে। পেরে ওঠা যাবে না ব'লে পালিয়ে বাঁচলাম !'

এক মিনিট চুপ ক'রে কি ভাবল মহীউদ্দিন, বললে :

'আমায় কি করতে হবে ?'

'দয়া !' সর্দার বললে, 'দয়া করতে হবে।'

'কি রকম ?'

'আমাদের পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোক এনে দিতে হবে !'

'কেন ?' মহীউদ্দিন জানতে চাইল, 'এখান থেকে বারামূলা তো সোজা পথে যাওয়া যায় !'

সর্দার একটু থমকে গেল, কিন্তু এক পলক। হেসে বললে :

'বারামূলায় যাওয়া আমাদের চলবে না বিপদ আছে।'

'কিসের ?'

'বারামূলায় যে সব অত্যাচার হ'য়েছিল গত পাকিস্তানি আক্রমণে সে তো আপনার জানাই আছে...'

খুব জানা আছে মহীউদ্দিনের। ওর বাবা তখন ছিলেন উলার হ্রদের হাউস বোটে। ভাড়াটে সাহেবরা পালিয়েছিল ওঁকে ফেলে আর পাঠানরা হাউস বোটে আগুন লাগিয়েছিল ওঁকে তার মধ্যে বন্ধ ক'রে। মনটাকে সেই স্মৃতির জ্বালা থেকে সরিয়ে এনে মহীউদ্দিন বললে : 'হ্যাঁ, আছে, কিন্তু তাতে আপনাদের ভয় কি ?'

'সে অত্যাচারের কঠিন নিষ্ঠুরতা আজও কেউ ভোলেনি আর সেই জন্যেই আমাদের কেউ ক্ষমা করবে না, খুন করবে!'

'তাহ'লে?'

'আমরা চাই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পট্টান পৌঁছোতে। সেখান থেকে আমরা যাবো সাদিক সাহেবের কাছে, নিজেদের উৎসর্গ করব ওঁর সেবায় আর দেশের কাজে।' মহীউদ্দিনের পা জড়িয়ে ধরল সর্দার, বললে:

'দয়া করুন হাকিম সাহেব, আমাদের বাঁচতে দিন। আমরাই তারপর যাবো হাজিপীর পেরিয়ে আজাদ এলাকাকে সত্যিই আজাদ ক'রে আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে উদ্ধার ক'রে আনতে।'

উঠে গেল সর্দার, নিয়ে এলো টাকার বাণ্ডিল, বললে, 'নিয়ে যান টাকা যা আমাদের আছে, সব। আমাদের দেশ গেছে মান গেছে, সংসার গেছে সবই যখন গেছে তখন টাকা থেকে কি হবে? আরও চাই আরও দেব'। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে চিৎকার ক'রে বলল সর্দার—'নিয়ে এসো যার যা আছে, সব দিয়ে দাও হাকিম সাহেবকে এক্ষুণি।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই লোক ছুটল টাকা আনতে।

হাসতে হাসতে মহীউদ্দিন বলল: 'আমি চসম্‌খোর নই যে টাকা নিয়ে তবে সাহায্য করব!' কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর পায়ের কাছে ভারতীয় নোটের পাহাড় জমে উঠল। দু একটা তার মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে মহীউদ্দিন বলল: 'এ যে দেখছি সব ভারতীয় নোট!'

সর্দার বললে, 'হ্যাঁ! নিমক্‌হারাম সব দেশেই আছে। এগুলো সব মাড়োয়ারিদের টাকা পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে ছিল, আমরা লুঠ করেছি।'

'ওঃ!'

'তাহ'লে আর দেরি নয় হাকিম সাহেব! বাছা বাছা লোক

আসুন, এমন সব লোক যারা রাত্রে দেখে বেড়ালের মতন, আর পথ চিনে নেয় কুকুরের মতন শুধু গন্ধে গন্ধে!'

'হুম্!' উঠে পড়ল মহীউদ্দিন। সর্দার কুর্ণিস করার ছলে গুঁজে দিল কয়েকটা একশো টাকার নোট ওর পকেটে, বললে:

'বাচ্চাদের জন্যে আমাদের নজরাণা!'

বেশ একটু রাগ ক'রেই ও ফেলে দিল নোটগুলো, বললে: 'দয়া যখন ইচ্ছে হয় আমি দান করি, বিক্রি করিনা!'

গট গট ক'রে বেরিয়ে গেল মহীউদ্দিন একদম বেপরোয়া। ভয় প্রাণে অনেক ছিল, প্রাণ হারানোর নয়, পৌঁছোতে না পারার! কিন্তু সে নিয়ে ভাবনা করলে কাজ হবে না, কাজ নষ্ট হবে!

এবার আর হাঁটা নয়, রীতিমত ছুটে চলল মহীউদ্দিন। রাত হওয়ার আগে খবরটা পৌঁছে দিতে না পারলে কাজ হবে না কিছুই। রাতারাতি কোথায় সটকে পড়বে কে জানে? তখন আবার ওদের ধরাও হবে শক্ত। সঙ্গে ওদের যখন অত হাতিয়ার তখন লুঠতরাজ তো করতেই পারে! বক্সি আমলে লুঠতরাজের পর সবে দেশটা সাদেকসাহেবের আমলে স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে যদি আবার হয় অরাজকতা, তাহ'লে লোকেরা না খেতে পেয়ে প্রাণে মরবে! চক্ষের নিমেষে পাহাড় পেরিয়ে বাস ধরল আর সোজা গেল বারামূলা। গভীর উত্তেজনায় ও খেয়ালই করেনি যে চারজন ওর পেছু নিয়েছে সেই পাহাড়ের কোল থেকে।

'বরাহ মূল' কথাটার অপভ্রংশ হল বারামূলা। কাশ্মীরি হিন্দুরা কিম্বদন্তি শুনে আসছে যে এইখানেই নাকি ভগবান শ্রীবিষ্ণু বরাহ অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের কথা জানিনা কিন্তু যে সব ভাগ্যবান সাতচল্লিশের হানাদারি অত্যাচার উত্তীর্ণ হ'য়ে আজও বেঁচে আছেন তাঁদের কথা হল যে পাকিস্তান

এখানে পশুর অধম হ'য়ে দেখা দিয়েছিলে গত বারের হানায়। সে ক্ষত এখনও আছে জায়গায় জায়গায় আর সব চেয়ে স্পষ্ট হ'য়ে আছে সেই চায়ের দোকানের সামনে কাঠের থামে। শুধু সহীদ বললে, শেরওয়ানিকে অপমান করা হয়। উনি অবতার!

মহীউদ্দিন বারামূলায় নামল সন্ধ্যার ঠিক আগে আর সোজা গেল পুলিশ সাহেবের বাড়ি। ওঁর জীপের নম্বর নিয়ে যে সব খোঁজ পত্তর হয়েছিল আগের রাত্রে তারই সূত্র ধরে ওঁকে যেতে হয়েছিল শ্রীনগর, কাজেই মহীউদ্দিন পুরো সংবাদটা জানালো থানায়। থানাদার সাহেবের অপেক্ষায় সংবাদটা ফেলে রাখল, রাত এগারোটা পর্যন্ত! না যদি রাখত তো জুগু খারিয়ার হানাদাররা সময় মত স'রে পড়তে পারত না। তিনশো পঞ্চাশ টন গোলো বারুদ নিয়ে স'রে পড়া সহজ কথা নয়। তাও সম্ভব হয়েছিল ঐ থানাদারের ভুলের জন্য।

আবার বাসে উঠল মহীউদ্দিন। ও যদি শ্রীনগরের বাসে উঠত তাহ'লে এ যাত্রা ও বেঁচে যেত, কিন্তু ওর কর্তব্য পালনের নেশাই ওর কাল হল। ও উঠল পট্টানের বাসে। খবরটা ওখানকার থানাতেও দিয়ে যাওয়া দরকার। ও জানে লোকগুলোর লক্ষ্য হল পট্টান। তাও ও বেঁচে যেত যাদ না চৌকের চায়ের দোকানে ব'সে চা খেত। ঐ যে আধ ঘন্টা দেরি হল তার মধ্যেই একটা বাস বেরিয়ে গেল। ও গিয়ে উঠল শেষ বাসটায়। ও এখনও লক্ষ্য করল না যে তুজন লোক ওর সঙ্গে জোঁকের মতন লেগে আছে।

পট্টানে বাস পৌছোলো রাত নটায়। নেমে পড়ল মহীউদ্দিন। সামনেই থানা। ওর সব কথা তাদের সবিস্তারে জানিয়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। থানাদার বলল, রাত্রে ওখানেই থেকে যেতে কিন্তু মহীউদ্দিন সারাদিন নমাজ পড়েনি, মনটা কিছু ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তাই ঠিক করল, রাতটা ও মসজিদেই থাকবে।

সকালে ওকে ওখানেই পাওয়া গেল ; মৃত। মাথায় গুলি মেরে ওকে মেরে ফেলে গেছে কেউ। চিনার গাছের তলায় যে বুড়োটা সারারাত জেগে কাটায় সে বললে দুজন লোককে সে দেখেছিল অনেক রাতে মসজিদে যেতে আর একটু পরই বেরিয়ে আসতে।

নিজে ম'রে মহীউদ্দিন কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।

শ্রীনগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শান্তি রেখার ওপারে হল মুজাফারবাদ আর তারই প্রায় কাঁধ ঘেঁষে হল টিথওয়াল। গত হানাদারি যুদ্ধে এখানে বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে আর গত আঠারো বছর ধ'রে যত জায়গায় গুলিগোলা চলেছে তার মধ্যে ঐ এলাকাতেই বলতে গেলে সব চেয়ে বেশী। এই অঞ্চলের প্রাধান্য অনেকখানি কারণ লেহ আর কার্গীল যাওয়ার পথ এইখান দিয়েই। এই সব নানান কারণে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমাদের সতর্কতা এ অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী।

টিথওয়াল থেকে যদি শ্রীনগরের দিকে সরে আসা যায় তাহ'লে প্রথম আর সামরিক কারণে প্রধান বড় ঘাঁটি হল গুরেজ। সন্ধি সীমান্ত থেকে গুরেজ হাঁটা পথে আসতে লাগে প্রায় পুরোদিন কারণ অনবরত পাহাড় উঠতে আর নামতে হয়। পাখীওড়া পথে দূরত্ব হল দু মাইল, কম কিন্তু বেশী কিছুতেই নয়।

গুরেজ খুব একটা বড় জায়গা নয়, গ্রামও নয় আর শহরও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য ছাড়া এখানে আর বড় একটা কিছু নেই। বড়াই ক'রে বলবার মতন আছে হাবা খাতুনের আজব গল্প। হাবা খাতুন ছিলেন গরীব চাষীর মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই ওঁর জীবনের ধারা ছিল একেবারে আলাদা। যে বয়সে মেয়েরা পাড়াময় দৌড়ে বেড়ায় সেই বয়সে উনি ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকতেন আর একটু যেই বয়স হল সাংসারিক কাজে মাকে

সাহায্য করার, দেখ তো না দেখ উনি বেরিয়ে যেতেন গ্রামের বাইরে, গিয়ে বসতেন ঝর্ণার পায়ে কি ক্ষেতের ধারে আর আপন মনে গাইতেন গান। আজই গ্রামের মধ্যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার রীতি নেই, চার শো বছর আগে তো ছিলই না, কিন্তু হাবা খাতুন তা শুনবেন কেন। গ্রামের পীরের কাছে উনি গিয়ে বসতেন যখন তখন আর বলতেন কবিতা শুনব। একদিন দেখা গেল উনি নিজেই ছড়া কাটছেন।

বাপের তো মাথায় বাজ পড়ল। উনি ন' বছর বয়সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন গ্রামের এক চাষীর সঙ্গে। সে যেমন গরীব তেমনি গোঁয়ার। মুক্ত বিহঙ্গমের মতন যে মেয়ে মানুষ হ'য়েছে, সংসারের শৃঙ্খল পরে সে হ'য়ে উঠল শোকাচ্ছন্ন। একে গোঁয়ার স্বামী তায় আবার দজ্জাল শ্বাশুড়ি। ওঁর আর বেদনার শেষ নেই। সারাদিন উনি কাঁদেন আর চোখের জলে কবিতা বানান আর এমনই ভরা বেদনার ভাষা যে মেয়েদের মুখে মুখে সেগুলো ঘুরতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দেখতে দেখতে বছর সাত আটের মধ্যে প্রায় সারা কাশ্মীর গাইতে আরম্ভ করল ওঁর মুখে মুখে বানানো গান। ওঁর যত নাম হয়, শ্বাশুড়ির তত হয় মেজাজ আর স্বামীর তত বাড়ে অত্যাচার।

একদিন রাজা ইয়ুসুফ শাহ্ শিকার করতে করতে গিয়ে পড়লেন তাঁদের গ্রামের ধারে। ওঁকে এক ঝর্ণার ধারে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে ছড়া কেটে জানতে চাইলেন উনি কে? ছড়া কেটেই উনি উত্তর দিলেন রাজাকে। রাজা তো মুগ্ধ। এতো রূপ আর এমন গুণ যে মেয়ের সে কিনা সামান্য একটা চাষার বৌ? রাজা ওঁর স্বামীকে দিলেন চার ঘড়া মোহর আর চেয়ে নিলেন হাবা খাতুনকে। গ্রামের মেয়ে হল রাজার রাণী।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আকবর বাদশাহ-র সৈন্য এলো আর রাজা হলেন বন্দী। রাণী হাবা খাতুন বহুদিন ব'সে রইলেন স্বামীর

পথ চেয়ে তারপর একদিন শুনলেন তাঁর স্বামী মারা গেছেন, বন্দী অবস্থায় বাংলা দেশে। বেদনাহত রাণী হাবা খাতুন রাজপোষাক ছেড়ে পরলেন গেরুয়া আর চ'লে এলেন গুরেজ। পথে পথে উনি ঘুরতেন আর মুখে মুখে গান বাঁধতেন, প্রেমের গান, বিরহের গান, প্রকৃতির গান। সারা কাশ্মীর আজও সেই গান গেয়ে ধান কাটে, জল আনে, মন জানাজানি করে। অলিখিত কবিতার এতোখানি প্রচার আর এমন লম্বা টানা জীবন আর কোন দেশে অন্য কোন কবির ভাগ্যে ঘটেছে কি না আমার জানা নেই।

এঁরই কবিতা শুনে মেহজুর একদিন কাশ্মীরি ভাষায় লেখা আরম্ভ ক'রে অমর হন আর ১৯৬৩ সালে যখন উনি মারা যান পুলওয়ামা তহশিলে, সেই বছর গুরেজের এক গরীব ঘরে জন্ম গ্রহণ করে আল্লারাখা।

আল্লারাখার বাবা একজন গরীব চাষী। পর পর ছটি ছেলে মেয়ে মারা যাওয়ার পর যখন ওর স্ত্রী আবার আসন্ন প্রসবা হ'লেন তখন স্বামী স্ত্রী মানত করলেন যে ছেলে যদি হয় তো তাকে আল্লাহতালাকে দিয়ে দেবেন। ছেলে যখন হল তখন সবাই বলল, দিয়ে তো দিবি কিন্তু আল্লাহর নামে দিলে ওকে নেবে কে? অতএব উপায়? অনেক গবেষণার পর ঠিক হল যে যতদিন না আল্লাহতালার মর্জি হচ্ছে আর উনি মেহেরবানি ক'রে কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছেন ততদিন ছেলেটী হবে দেশের আর দশের, আর ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবে ওর চাষী বাপ। আল্লাহর নামে ওকে রাখা হল বলে ওর নাম হল আল্লাহরাক্খা, ডাক নাম অলি।

অলি তো অলিই, কিছুতেই ঘরে থাকে না, দিনরাত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মাঠে বনে আর গান গায় হাবা খাতুনের। গুরেজের সকলের কণ্ঠে সারাদিন ওঁর গান ব'লে অলিরও শিখতে সময় লাগেনি। তেসরা সকালে উঠেই ও প্রথম গান ধরল হাবা খাতুনের শেষ বয়সে লেখা সুন্দর গান 'ওগো, আমি তোমারই, এ পরদেশে,

পরবাসী হ'য়ে ঘুরে ঘুরে আমার যে আর দিন কাটেনা, এবার তুমি তোমার কাছে যাওয়ার পথ আমায় ব'লে দাও।' বাপের সেদিন মেজাজ বড় খারাপ, গান শুনে ক্ষেপেই অস্থির। রেগেমেগে বললে, আসিস্ কেন এখানে, গেলেই তো পারিস্ তোর আল্লাহর কাছে! হাসতে হাসতে বারো বছর বয়সের অলি বললে, তাই তো যাব। সময় হল ব'লে!

মার কাছ থেকে দুটো বাখরখানি চেয়ে নিয়ে অলি বেরিয়ে গেল রোজই ও যেমন যায়। পাহাড় বেয়ে ও নেমে গেল সেই নিচে, যেখানে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে ব'সে ও হাবা খাতুনের গান গায়। গুরেজের সবাই বলে কি যে পাগল ছেলে ওটা তার ঠিক নেই, আবার ভালোও বাসে খুব। স্বভাব বড় ভালো, সর্বদাই হাসে আর কেউ যদি কখন কোন কাজ করতে বলে তো খুশী মনে করে দিয়েই ছুটে নেমে যায় সেই নিচে ঝর্ণার ধারে! একলা এমনি ক'রে থাকতেই না কি ও ভালোবাসে!

আজ ও নিচে নেমে দেখল ঝর্ণার দু ধারে অনেক লোক আর এমন ভাষায় কথা বলে যা ওর বুঝতে খুব কষ্ট হয়। লোকগুলোর কাঁধে বন্দুক আর মুখে গালাগাল! হারামজাদা ছাড়া কথাই বলেনা। ঐ বয়সের অন্য কোন ছেলে হ'লে ভয়েই পালাতো, অলির প্রাণে ভয়ডর নেই ব'লে সোজা নেমে গেল ওদের মধ্যে। ওরা বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একজন ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেল নিজের ক্যাম্পে আর হাতে দিল ট্রানজিস্টার। রীতিমত গান শোনা যায়। ও অবাক হ'য়ে দেখল।

লোকটা হাসল। বললে, 'ওপরে কি সেপাই আছে?'

ও হাসল ফিক্ করে। বললে, 'দেখিনি তো!'

'বাঃ এই যে তুমি এলে ওপর থেকে!'

অলি আবার হাসল। বললে, 'আমি তো এলাম এই দিক থেকে আর সেপাইরা থাকে ঐ দিকে!' আসলে, আসবার সময়

ও সৈন্য ঘাঁটির পাশ দিয়েই এসেছে আর দেখেও এসেছে তাদের কুচকাওয়াজ। খুব ভালো লাগে ওর দেখতে ; রোজ তাই ঐ পথ দিয়েই আসে। সেপাইরাও ওকে চিনে নিয়েছে। একদিন যদি কোন কারণে ও না যায় ঘাঁটির দিকে তো তুচার জন ওর খবর নিতে আসেই। ও ওদের গান শোনায় আর ওরা ওকে যখন যা হাতের কাছে পায় দিয়ে দেয়—লজেন্স, টফি, চুইংগাম, যা হক একটা কিছু। আজ যে চুইংগাম দিয়েছিল সেটা বার তুয়েক ভালো ক'রে চিবিয়ে অলি বললে, 'যাবে ওদের সঙ্গে দেখা করতে?'

লোকটা বললে, 'না থাক। আমাদের অনেক দূরে যেতে হবে, আজ আর গল্প করার সময় নেই!'

অলি আবার কি ভাবল, বললে, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

'উরির দিকে।'

'ও!' বলে অলি আবার উঠে যাচ্ছিল ওপরে।

লোকটা ডাক দিয়ে বলল, 'এই শোন!'

ও আবার নেমে এলো: 'কি?'

'তুমি ঠিক জানো সেপাইরা আছে ঐ দিকে?'

'তাই তো থাকে। দেখবে এসো!'

'আর, এদিক দিয়ে উরি যাওয়া যায়? জানো?'

'হুম্ জানি। যাওয়া যায়।'

'কোন দিক দিয়ে?'

'যে দিক দিয়ে আমি এলাম। এসো, আমি রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি!'

লোকটা বলল, 'এখন নয়। তুমি গান শোন, আমরা একটু পরে যাবো!'

'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার ঠিক একটু আগে ওদের যাত্রা শুরু হল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অলি আর ওর পেছনে চলেছে শ খানেক হানাদার।

ঘাঁটির কাছাকাছি এসে ও বললে, তোমরা দাঁড়াও, আমি চট ক'রে ওপরে গিয়ে দেখি কেউ আছে কিনা। ওপরে ও খবর দিয়ে আবার নিচে নেমে বলল, 'না কেউ নেই, চল।'

ওরা ওপর থেকে অবাক হ'য়ে দেখল শ' খানেক লোক উঠে আসছে ওপরে আর সকলের কাঁধে বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সাজ সাজ রব আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই দু'দলের মুখোমুখি যুদ্ধ। হানাদারদের প্রথম গুলিতেই অলি হল নিহত।

বারো বছরের ছোট্ট শিশু একবার শুধু ডাক দিয়ে গেল, 'ইয়া আল্লাহ!'

আল্লাহতালার ছেলে ফিরে গেল তাঁরই কাছে। রেখে গেল কাশ্মীর আমাদের জন্যে।

গুলমার্গ-এর তলায় নেমে সামনের পাহাড় উঠলেই নিচে দেখা দেখা যায় শ্রীনগরের এয়ারপোর্ট। সন্ধি-সীমান্ত থেকে পাহাড় বেয়ে উঠে এলে গুলমার্গ দশ মাইল আর গুলমার্গ থেকে এয়ারপোর্ট ঐ পাহাড়ী পথে আরও কম অর্থাৎ সন্ধি-সীমান্ত থেকে কম বেশী কুড়ি মাইল এলেই এয়ারপোর্ট। গত পাকিস্তানি হানার সময় শ্রীনগর অভিমুখী হানাদারদের দল যখন বারামুলায় আটকে গেল তখন জিন্নাসাহেব নতুন একদল হানাদার পাঠিয়েছিলেন এই পথে এয়ারপোর্টটা হাত করার বাসনা নিয়ে; আর তাদের সঙ্গেই হয়েছিল ভারতীয় সৈনিকদের প্রথম যুদ্ধ এয়ারপোর্টের এক মাইলের মধ্যে।

এই এলাকাটা বড়গাম তহশিলের অন্তর্ভুক্ত আর মেহজুর সাহেবের বড় শালা শাহ আবদুল আজিজ হ'লেন এখানকার, যাকে বলা হয় ফার্ষ্ট সিটিজেন। থাকেন বটে এক হারিয়ে যাওয়া কোণে কিন্তু হ'লে কি হবে, মানুষটা এমনই জনপ্রিয় যে, এলাকার প্রত্যেক লোকটা ওঁর প্রিয়জন বিশেষ ক'রে গুলাম কাদের।

গুলাম হল শাহজীর বন্ধু আবদুল আহাদের ছোট ছেলে, বয়সে ওঁর চেয়ে কম ক'রে চল্লিশ বছর ছোট। শাহজীর মুখে গল্প শুনেছি, গুলাম যেদিন জন্মায় সেদিন উনি খুশী হয়ে এমন নাকি লাফিয়ে উঠেছিলেন যে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ছুট দেয় আর উনি শূন্য থেকে যান সোজা হাসপাতালে দুখানা ভাঙা পা নিয়ে। আবদুল আহাদ যখন ওঁকে দেখতে গেলেন হাসপাতালে তখন শাহজী এমন জোরে ওঁর পিঠে চাপড়ে ছিলেন যে শাহজীর ডান হাতের কব্জি দিন সাতেক প্ল্যাষ্টার করে রাখতে হল। এই সব নানান কারণে শাহজী ব'লেছিলেন, বড়গামের কেউ যদি আমায় হারাতে পারে কখন তো ঐ শালা গোলাম কাদের!

সেই জন্যেই বোধহয় কাদেরের সেই ছেলেবেলা থেকেই শাহজীর সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক পিঠোপিঠি দুই ভায়ের মতন। শাহজীর ভালোবাসার জোরেই যে এমনটা হ'য়েছে তা নয়। কাদেরও ওঁকে যথেষ্ট ভালোবাসে আর ভক্তি করে, ভয়ও পায় আবার ঝগড়াও করে! শাহজী ভালো ঘোড়ায় চড়েন দেখে ও সাত বছর বয়সেই ঘোড়ার পিঠে সার্কাস করতে আরম্ভ ক'রে দিল। শিক্ষাটা যদিও শাহজীর তবু ঈর্ষা আটকায় কে? দেখে শুনে শাহজী বললেন, শালা হারামজাদা, জানে কিনা আমার বুড়ো হাড় তাই আমায় লোভ দেখায়! হেমন্তের এক রঙিন দুপুরে কাদের শাহজীর গোটা কয়েক পাকা চুল তুলে এমন আরাম দিল যে শাহজী ওকে যা চাইবে তাই দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। কাদের চাইল স্কুলে পড়ার খরচ। আর দেখতে দেখতে ও ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে ফেলল। শাহজী বললেন, শালা কম হারামি, আমারই মাথায় হাত বুলিয়ে আমার চেয়ে বেশী পাশ দিয়ে ফেললে!

পঁচিশে পা দিয়েই কাদের বিয়ে করল, ফতেমাকে। মেয়ে তো নয়, পরী। আরিগামের লোক ব'লে দেশ যদি কাশ্মীর আর মেয়ে যদি তো ফতেমা! বিয়ের ঠিক আগে 'মেহদি-রাতে' যেদিন

ওকে সাজানো হল সেদিন সব মেয়েরা নজর না লাগার তুক কাটল একবার ক'রে, শাহজীর বৌ তুক্ কাটলেন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বার চারেক। সবাই বললে, ওমা, দাদি একি? দাদি বললে, বুড়োটাকে তো চেনোনা ফাঁক পেলেই নজর মারবে। আর বিয়ের পরই কাদের বললে, শাহ চাচা এবারও তুমি হারলে, আমার বৌ খবসুরৎ, তোমার বৌ বুড়ি।

ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই কাদের লেগে গিয়েছিল দেশের কাজে মীরকাশেমের চেলা হ'য়ে। বড়গাম ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর ও ছিল এক পাণ্ডা। এমনই ওর নাম ডাক যে নাইবার খাওয়ার সময় নেই। মীরকাসেম ওকে ছাড়া এক পা চলেন না, এক পলক না দেখলে, চোখে অন্ধকার দেখেন। তাই, ন্যাশনাল কনফারেন্স নাম পালটে যেদিন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হল সেদিন ও হ'য়ে গেল বড়গাম শাখার সেক্রেটারি। সংবাদটা শোনামাত্র শাহজী ছুটে এলেন আরিগামে আর নিজের কানের পেছনে হানাদারি বুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন—যতই তুই সেক্রেটারি হ না শালা, দেশের কাজে আমার মতন এমন 'পরম বীর চক্কর' কখন তোর ভাগ্যে জুটবে না। যতই তুই আমায় হারা, এই একটা জায়গায় তোকে হারতেই হবে।

হাসতে হাসতে গুলাম কাদের বললে, 'তা যা বলেছ চাচা। আমাদের সেপাইদের এমন কড়া পাহারা যে হানাদার তো দূরের কথা পাকিস্তানি হাওয়া পর্যন্ত আটকে যায়।'

শাহচাচা দমকা হাসিতে ঘর ফাটিয়ে বললেন, 'সেই জন্যেই হাড়ে বাতাস লেগেছে।'

ন' তারিখে শ্রীনগরে অনেক ঝামেলা। ঐ দিনে শেখ আবদুল্লাহ গ্রেপ্তার হ'য়েছিলেন ব'লে তাঁর চেলা চামুণ্ডারা ঐ দিনটায় হরতালের ব্যবস্থা করে। বক্‌সির আমলে বছর কয়েক ওটা বেশ

জোরদার হ'য়েছিল কিন্তু ষাট সাল থেকে আর হয়নি—দু' চারটে দোকান বন্ধ থাকত এই যা। হঠাৎ শোনা গেল এ বছর নাকি হরতাল আবার হবে এবং শেখ সম্প্রদায় না কি এমন তোড়জোড় করছে যে শ্রীনগরের বেশ্যা পল্লীতেও কারবার বন্ধ থাকবে পুরো দিন। প্রথমটা কেউ এ সংবাদ বিশ্বাসই করেনি কিন্তু হরতালের দিন দশেক আগে শালাবাবু যখন পুরো একটা হারেম নিয়ে গুলমার্গ চ'লে গেলেন, ব্যাঙ্ক থেকে হাজার পঞ্চাশেক টাকা তুলে, তখন সরকারি মহলে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। তার ওপর ছিল উরস্‌-এর মেলা দস্তগীর সাহেবের মাঠে। ঐ মেলাটা মস্ত ব্যাপার। কম ক'রে আড়াই লাখ লোক জমা হয় খানা ইয়ারির মাঠে। ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান সব। সারা শহর খালি ক'রে সবাই যায় উরস্‌-এ আর সারাদিন সেখানে কাটিয়ে বাড়ি ফেরে সন্ধ্যায়। এদিকে জোর হরতালের ষড়যন্ত্র আর ওদিকে উরস্‌-এর মেলায় আড়াই লাখ লোক সামলাবার ব্যবস্থা, কর্তাদের তো মাথায় হাত। সরকারি মহলে অনেক শলা মস্করার পর ঠিক হল হরতাল হক ক্ষতি নেই, কিন্তু কোন রকম গণ্ডগোল যেন কিছুতেই না হয়।

সব শুনে গুলাম কাদের বললে, 'কিন্তু যে হরতাল পাঁচ বছর বন্ধ ছিল সেটা হঠাৎ এমন ঘটা ক'রে এবার ওরা করছে কেন?'

সেটাও ঠিক কথা। গণ্ডগোল অবশ্যই একটা বাঁধানোর ইচ্ছা। কিন্তু...কি? কাশ্মীর কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা মীরকাসেম সাহেব বললেন, অত ভাবনায় দরকার কি। হরতাল যাতে না হয় সরাসরি সেই ব্যবস্থা করলেই তো হয়। গুলাম কাদের বললে, তাই হবে। আমি কথা দিতে পারি অন্ততঃ বড়গাম তেহশিল থেকে একটা লোকও হরতালে সামিল হবে না।

তেসরা সারাদিন তহশিলের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে এই মিটিংই করেছে গুলাম কাদের। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মিনিট সে থামেনি। কেবল কথা আর কথা; কি হবে, কেমন

করে হবে; যাতে জাতীয় জীবনে বড়গ্রামের চিরকালীন সুনাম সর্বতোভাবে বজায় থাকে। এই ভাবে মিটিং করতে করতে সে সন্ধ্যার প্রথম প্রহরে গিয়ে পৌঁছল শাহজীর বাড়ি উটরা গ্রামে। যে স্কুল বাড়িটায় তার আগের দিন সকালে রুকায়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিখিয়ে গেছে মেয়েদের, সেইখানেই ও ছেলেদের তালিম দিল, দরকার হ'লে দেশের জন্যে মরতে হবে। আর বোঝাল হরতাল বন্ধ করার জন্যে কি কি করা দরকার! মিটিং শেষ ক'রে শাহজীর সঙ্গে ও হেঁটে গেল মেহজুর সাহেবের আখরোট গাছ পর্যন্ত ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে করতে।

শেষ কথাগুলো শাহজীর বেশ মনে আছে। শাহজী বুঝি ব'লেছিলেন 'যা মনে হচ্ছে, হরতালের নাম ক'রে ওদের হাঙ্গামা বাঁধাবার ইচ্ছে।'

'সেটা আমারও সন্দেহ, কিন্তু বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না হাঙ্গামাটা কি। ছোটখাটো কিছু যে নয় তা বোঝা যাচ্ছে শালাবাবুর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার বহর দেখে। পঞ্চাশ হাজার তাও আবার হরতালের ঠিক দশদিন আগে।'

হেসে শাহজী বললেন: 'গুণ্ডা ভাড়ার টাকা!'

'কাশ্মীরে যে কটা আছে' গুলাম বললে, 'সবই প্রায় নজরবন্দী!'

'ঐ শালা বক্‌সি আর তার শালাবাবুকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই! হয়ত পাকিস্তান থেকেই নিয়ে আসবে ভাড়াটে গুণ্ডা!'

'কেমন ক'রে? পাহারা নেই?'

'কেন?' শাহজী বললেন, 'বক্‌সির আমলে যে সব লোককে জঙ্গলের ঠিকা ডেকে ডেকে দেওয়া হয়েছিল তারা তো সব কটা রীতিমত হারামজাদা! তাদের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যদি আনে?'

'ও দু চারজন লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে পারে তাতে ক্ষতি নেই...'

বাধা দিয়ে বললেন শাহজী, 'দু চারজন? বলছিস্ কি?

আঠারোজন ঠিকেদারের দু হাজার মাইল জঙ্গল, দশজন ক'রে এলেও তো প্রায় দু'শো হল।'

'সে পারবে না' গুলাম বললে, 'আমাদের সৈন্যবাহিনীর যে কড়া পাহারা।'

'ও তুই যাই বল কাদের, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ওদের। তোর চাচি বলছিল উরস্ এ যাবে পুরো খানদান নিয়ে। আমি ভাবছি পাঠাবোনা। ও হাঙ্গামা একটা হবেই।'

'কখ্খনো নয়। সদর্পে বললে কাদের, খুদার কসম্ চাচা, কিচ্ছু হবে না, আমার জান্ কবুল। আমার জান চ'লে যাবে তবু হাঙ্গামা হবে না।'

'এতো দেমাক্ ভালো নয় শালা' হেসে বললেন শাহজী, 'হেরে যাবি।'

'কবে হেরেছি তোমার কাছে চাচা?' হেসে বললে কাদের।

মাথার টুপিটা খুলে চাচা কানের পাশের বুলেটের গর্তটা দেখিয়ে বললেন, 'এর কাছে! হারিস্ নি তুই?

'খুদার যদি মেহেরবানি থাকে চাচা, তাহ'লে তোমার ঐ পরম বীর চক্করকেও আমি হারিয়ে দেব! এ তুমি দেখে নিও!'

তরতর ক'রে নেমে গেল কাদের! অনেক ডাকলেন চাচা, 'শুনে যা, খেয়ে যা, চাচির সঙ্গে দেখা ক'রে যা!'

কিন্তু কাদের আর দাঁড়ালো না! সময় কৈ? আজ তেসরা, ন' তারিখের আর ছ'দিন বাকি। তাছাড়া, ঐ জঙ্গলের কথা ওর মনে ধরেছে। কালই দল ক'রে লোক পাঠাতে হবে ওসব জায়গায় নজর রাখবার জন্যে। ঠিকই বলেছে চাচা, শালাবাবুর দল সব পারে! কথাটা কাল কাসেম সাহেবকেও বলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে গুলাম দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে ওপারের পাহাড়টায় উঠতে আরম্ভ করল। সব ঠিকাদারদের ও ঠিক মতন চেনে না, তবে সবচেয়ে খতরনাক হল খালেদ মিঞা। গত হামলায় ও

হানাদারদের সঙ্গে সামিল ছিল চুপিচুপি এ কথা সবাই জানে। পাকিস্তানি হামলা যখন মিটল ও তখন বেগতিক দেখে সরে পড়ল। ১৯৬১ সালে শালাবাবু যখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্তা হলেন আর লোকের মুখে শোনা গেল বক্‌সির ছোট ভাই হ'য়েছে ছ'কোটি টাকার মালিক তখন দেখা গেল খালেদ মিঞা আবার শহরে এসে ঘোরাঘুরি আরম্ভ ক'রেছে শালাবাবুর সঙ্গে। সাদেক সাহেব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন চোরাই কারবারের বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রতিবাদ জানালেও প্রত্যক্ষভাবে ঝগড়া করলেন না। সরকারি মহলে শোনা যায় মুখোমুখি ঝগড়া হল যেদিন বক্‌সি সাহেব ওপর-পড়া হ'য়ে পীর-পঞ্জল এলাকার বড় জঙ্গলটা খালেদ মিঞাকে সঁপে দিলেন আর সঙ্গে দিলেন চারখানার জায়গায় ষোলটা লরীর পারমিট।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই কাদের পথ হাঁটছিল, এ পাশ ও পাশ নজর ছিল না। কিন্তু কবরস্থানকে ভয় পায়না এমন লোক কাশ্মীরে নেই। দিনের বেলা হ'লে তবু এক নজর দেখেই এগিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু রাত্রে আর সেটা হওয়ার উপায় নেই। ভয় যতই করুক ভূত আছে কিনা ভালো করে দেখতে হয়। কাদের দেখল ছ'নজর—মনে হল কেউ যেন ব'সে আছে চুপটি ক'রে! কাদের আর থামল না, হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেল। পথের মোড়ে গিয়ে মনে হল দেখা উচিত ছিল। সত্যিই ভূত না ওরই দেখার ভুল? আবার ফিরে গেল কাদের, প্রাণটা প্রায় হাতে ক'রেই। গিয়ে দেখল কেউ নেই। যাক্ তাহ'লে ভুলই দেখেছিল ভূত নয়। ফিরে আবার যখন পা বাড়াবে তখন লক্ষ্য করল, কে যেন হেঁটে যাচ্ছে উটরার দিকে। সন্দেহ হল। যেইই হক পথ দিয়ে নিশ্চয় যায়নি, গেলে দেখা হতই। আর এতো রাত্রে একলা পথ হাঁটবে এমন নির্ভীক কাশ্মীরি ছ'চারটেই আছে। লোকটা তাহ'লে কে? হাঁক মেরে দেখবে কি না ভাবছে, লোকটা চট ক'রে নেমে গেল

রাস্তা থেকে নিচে। ফিরতেই হল কাদেরকে, লোকটা কে জানতেই হবে। ও যখন পাহাড়ের এ মাথায় এলো তখন লোকটা দুধ-গঙ্গার ওপর দিয়ে হন্ হন্ ক'রে হাঁটছে। ওপরে উঠলে বোঝা যেত ও গ্রামের লোক। ওপরে সে উঠল না। কাদেরের সন্দেহ আরও গভীর হল, কে লোকটা? কোথায় যাচ্ছে? কাদের পাহাড়ের এ পার দিয়ে চলল চুপি চুপি লোকটার ওপর চোখ রেখে।

উটরা গ্রাম পেরিয়ে নদীটা যেখানে বাঁক ঘুরেছে সেইখানকার পাক-দণ্ডি বেয়ে লোকটা উঠতে আরম্ভ করল ওপরে। এ পাশের পাহাড়ের ওপর থেকে কাদের দেখল, ওপারের মসজিদে আলো জ্বলছে। হাতঘড়ি দেখল। রাত তখন নটা। এ আর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। কাশ্মীরি গ্রামে রাত নটা মাঝ রাত্তিরের চেয়ে নিঝুম। দেখতেই হবে খোঁজ নিয়ে। কাদের নেমে গেল। সন্তর্পণে, বেড়াল চালে, নিঃশব্দে। ধরা না দিয়ে যতটা কাছাকাছি যাওয়া যায়। যা দেখল, ওর্ চক্ষু চড়ক গাছ। জনা পঞ্চাশ লোক জমা হ'য়েছে। কাঁধে তাঁদের রাইফেল, প্রায় সকলেরই। আর এখানে ওখানে বন্দুকগুলো মাথায় মাথায় ঠেকা দিয়ে রাখা আছে স্তূপ ক'রে। সর্বনাশ। কাদের ছুটল উর্দ্ধশ্বাসে। একেবারে এয়ারপোর্টের ঘাঁটিতে। পথ দিয়ে পনেরো মাইল হলেও পাহাড়ের গা দিয়ে হাঁটলে, এখান থেকে এয়ারপোর্ট ছ সাত মাইলের বেশী নয়!···

মাঝরাত্রে দু'দলে যে সংঘর্ষ আরম্ভ হল, সেটা চলেছিল সাতদিন আর হানাদারদের গুলিতে যে মানুষটা প্রথম মরেছিল তার নাম গুলাম মহম্মদ কাদের। বয়স তিরিশ। বিধবা মা আছে, বিধবা বৌ আছে আর আছে ছ'বছরের ছেলে।

শাহজী বললেন: 'শালা হারামজাদা শেষ পর্যন্ত আমায় হারিয়ে গেল। বুলেট আমি মাথায় নিয়েছিলাম ও শালা নিল বুকে। আমি বাঁচিয়েছিলাম গ্রাম ও বাঁচিয়ে গেল কাশ্মীর!'

॥ এগারো ॥

তেসরা বিকেল

গাড়ি এলো না, রুকায়া নিজে এলো, প্রায় সাড়ে পাঁচটায়। ঠিক তিনটে থেকে অধৈর্য প্রতীক্ষার পর তখন সবে আমি অশেষ নিরাশায় ধুতি পাঞ্জাবী ছেড়ে, একটা ছেঁড়া লুঙ্গি পরে সোফায় শুয়ে কাগজ পড়ছিলাম। আমার পোষাক দেখে ও হেসেই অস্থির। হওয়ারই কথা, কারণ ওর লাল কাশ্মীরি সিল্কের ঝোব্বাটায় ওকে মনে হচ্ছিল সগু ফোটা পদ্ম। আমি কথা হারিয়ে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গিয়েছিলাম। সামনের চেয়ারে না ব'সে ও কর্পেটে বসল, বললে:

'দেরি হল; দোষ কিন্তু আমার নয়, দরজির!'

'অর্থাৎ?'

'তিনটের সময় দেওয়ার কথা ছিল, পাঁচবার তাগাদা দিয়ে তবে সোওয়া পাঁচটায় পাওয়া গেল।' পেছনে ছড়িয়ে দেওয়া হাতের ওপর দেহের ভর দিয়ে রুকায়া হেলে বসল ওর অজন্তা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমায় ব্যগ্রভাবে সচেতন ক'রে দিয়ে। আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম। ও অদিতি-সৌন্দর্য্যে বলল:

'মতামতটা শোনা যাক!'

'এখানে নয়,' আমি বললাম উঠতে উঠতে, 'এতোখানি সৌন্দর্য্য একটা ঘরে ধরেছেনা।' তারপর মেহজুরের টাইপ করা জীবনীটা ওর দিকে এগিয়ে বললাম, 'এটা ততক্ষণ উল্টে দেখো, আমি পোষাকটা বদলে আসি।' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হঠাৎ যদি দেখো ফোকলা দাঁতের একটা বুড়ো ঘরে এসেছে…'

বাধা দিয়ে ও বললে :

'সর্বনাশ, সে আবার কে ?'

'ভাইয়াজী।'

'চিনব কি ক'রে ?'

'খুব সোজা।' আমি বললাম, 'মাথা ভরা টাক্‌ আর গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বদ্ধ কালা।'

'চেনা গেল। তারপর ?'

'বেমালুম বোবা বনে যেও, নাহলে কথার ঠেলায় পাগল বানিয়ে ছাড়বেন।'

পোষাক বদলে এসে দেখলাম, মেহজুরের জীবনীটা সোফার ওপর খোলা আর ও জানলার ধারে, স্তব্ধ। পড়ন্ত বিকেলের প্রয়াণ আলোকে ওকে মনে হল অত্যন্ত অসহায় ; পুড়ে যাওয়া মোমবাতির নিচে প'ড়ে থাকা মোমের মতন হতাশার স্তূপ। ডাকতে গিয়ে ডাকা হল না, কিছু বলতে গিয়ে কথা হারালাম। হাতটা ওর তোলা ছিল জানলার ওপর, মাথাটা হেলানো ছিল হাতের ওপর, কোমরের কাছটুকু ভাঙা। আমার সারা শরীর বেয়ে নব জাগরণের সাড়া শুনলাম, অজানা ভয়ের গভীর আশঙ্কা, যেমন শুনেছিলাম ছেচল্লিশে দিল্লীর রায়টে—রাইফেলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সেদিন ছিল মরণের ভয়। আজ নিজেকে হারাণোর ভয়। একলা ঘরের এই সচেতন স্তব্ধতায় দৈহিক সত্বা ঊর্দ্ধশ্বাসে চিৎকার ক'রে বলল, এতো বড় বাড়ির এতোখানি নির্জনতায় অতোখানি সৌন্দর্য্য আমার কিছুতেই সইবে না। নিবিড় আকাঙ্খা আর গভীর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে অস্পষ্ট বললাম :

'আমি কিন্তু তৈরি।'

রুকায়া এমন চমকে গেল, যেন আমি ওর অসীম নীরবতাকে অসভ্য রকম আঘাত ক'রেছি। এবার ওর চেয়ে থাকার পালা ; আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে। ওর অনিমেষ দৃষ্টিতে অসহায়ের

আর্তনাদ। একটা হালকা উত্তপ্ত শিহরণ আমার পা থেকে আরম্ভ হ'য়ে শরীরের মাঝ পথে এসে করুণা ভিক্ষা করল।

ও জানলার পর্দাটা ধরে বলল:

'চল।'

'কোথায়?'

মেহজুরের জীবনীটা মুড়ে রাখতে রাখতে ও বলল: 'ফুলের প্রাচুর্য্য যদি চাও, সালিমার আছে, পাইনের বন যদি চাও হারওয়ান আছে, পাহাড় যদি চাও শঙ্করাচার্য্য আছে আর...' একটু থেমে, খুব আস্তে বলল, 'আপত্তি যদি না থাকে তো আমার বাড়ি আছে।'

'এমন জায়গা নেই কিছু যেখানে কাছে লোক থাকবে অথচ আমরা একলা?'

রুকায়া হাসল, বললে:

'আমাকে এত ভয়?'

মেহজুরের জীবনীটা ওর হাত থেকে নিতে নিতে বললাম:

'তোমাকে নয় নিজেকে। চল।'

জীবনীটা ছাড়ল না। কিশোরী ভঙ্গিমায় মাথা নেড়ে বলল:

'যদি না যাই?'

'তাহ'লে, আর হয়ত যাওয়াই হবে না।'

'কি হবে?'

'বিপদ!'

ও জীবনীর ফাইলটা টেনে ধ'রেছিল। এবার টানটা হাল্‌কা করে কাছাকাছি স'রে এসে বলল: 'সত্যি?'

নিজেকে কিছু সামলে নিয়ে বললাম:

'আর ভাইয়াজী যদি এসে পড়েন তাহলে ওঁর গল্পের গুঁতোয় প্রাণ একেবারে অতিষ্ঠ!'

'সর্বনাশ!' জীবনীটা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তাহ'লে পালানো যাক!'

'চল।'

ও পাশে হাঁটছিল, আমি পেছিয়ে বললাম: 'তুমি আমার সামনে সামনে চল।'

'কেন?'

'তোমার সৌন্দর্য্য সত্যিই আর সইছে না।'

শ্রীনগরকে ঝিলাম নদী ঘিরে আছে কিশোরী-কোমরে চন্দ্রহারের মতন। নদীর দু'ধারে বাঁধ আর উজান বেয়ে চলেছে আমাদের বাঁধনহারা শিকারা। ও অনেক খুঁজে এটা ঠিক করল নামটা সুন্দর ব'লে 'ইভনিং মেলডি'। আমি বললাম, শাহানা। আনত সন্ধ্যা, অকীক নদীর জল আর অচিন্ত্য আবেশে, ঐ সুরটাই মনের মধ্যে গুন গুন করছিল। তার কারণও আছে। বহুকাল আগে সাহানার সঙ্গে এমনি এক সন্ধ্যায় আর এমনি এক শিকারায় এমনি ভাবেই ভেসে গিয়েছিলাম ভরা যৌবনের জোয়ারে। নবীন বয়সের মূল্যবোধে তখন তার দাম দিই নি। আজ মনটা কিছু বেদনায় ম্লান হল—ঐ সুরের মতন। রুকায়া পরম আরামে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল পেছনের বালিশে মাথা দিয়ে। আমি পাশে ব'সে দেখলাম ষ্টেট ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, শ্রীনগর ক্লাব সব একে একে পেরিয়ে যাচ্ছি; কোথায় তা জানিনা, কেন, তাও জানিনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা জলে ফেললাম। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে সেটা নিভে গেল। আকাশের বহু রং বদলালো, একটা দুটো তারা উঠল, পারে কিছু আলোও জ্বলল। যেতে যেতে দেখলাম বড় বড় হাউসবোটে আলো জ্বলছে, ট্রানজিস্টার বাজছে, মদের বোতলও খোলা হয়েছে। আর দেখলাম ছোট ছোট ডুঙ্গায় জাপানী পুতুলের মতন কাশ্মীরি শিশু অবাক হ'য়ে আমাদের দেখছে।

রুকায়া পাস ফিরে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে বলল:

'কিছু কথা বল।'

'কি?'

'যা ইচ্ছে।'

'যেমন?'

'যেমন, তুমি কে, তুমি কি, তুমি কেন?'

'শক্ত প্রশ্ন, সহজে বলা মুস্কিল। এক জীবনের অভিজ্ঞতা এক কথায় বলি কেমন ক'রে?'

আসলে ও প্রসঙ্গ আমি এড়িয়ে যেতেই চাইছিলাম। তার অনেক কারণ আছে। জগৎ জোড়া রাজনৈতিক জুয়াখেলায় মানুষ মরছে। আমি মানুষের অংশ। সাংসারিক গণ্ডির স্বার্থ সংঘাতে, সন্তান থেকেও হারিয়েছি। তারা আমার অংশ। তাই নিজের দিকে তাকালেই জীবনের বিরুদ্ধে আমার জমাট অভিমান বিভীষিকার মতন আমায় পেয়ে বসে।

রুকায়া ছোট্ট করে জবাব দিল:

'তবু?'

হেসেই তখন বলতে আরম্ভ করি:

'আমি সংসারের উদ্বাস্তু। কৃপার মুষ্টি ভিক্ষা কারো কাছে চাইব না বলে উঁচু গলায় আদর্শের আফিং খাই আর চাপা গলায় আর্তনাদ করি। জীবন কাটাই মিথ্যা অজুহাতে। এখানে এসেছি তারই কিছু অন্বেষণে। পাবোনা কিছুই তাও জানি।'

আমার দিকে না তাকিয়েই ও বলে:

'তোমার কাছে সবই তাহ'লে মিথ্যে?'

'সব। এই নদী, নৌকো, সন্ধ্যা। পুরো জীবনটাই। আরও যদি তোমার সত্যি কথা শোনার সাহস থাকে—তাহ'লে শোন তুমিও। তোমার সৌন্দর্য্য তোমার সান্নিধ্য সব।'

ও ঘাড় কাৎ ক'রে আমায় অনিমিখ দেখে বলল:

'তাহ'লে এলে কেন?' ও মুখটা আবার ঘুরিয়ে নিল।

'মনটাকে যখন বাঁচার অজুহাত দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি তখন দৈনন্দিন জীবন বলে মিথ্যাটাই বা মন্দ কি ? তাই এসেছি, কথা বলছি, ভালোও লাগছে তোমাকে।'

ও না তাকিয়েই বলে :

'মিথ্যা তো বটেই।'

'সত্যিই বা বলি কোন সাহসে ? আজ এই মুহূর্তে আমরা অনেকখানি কাছাকাছি আছি। ভালো লাগছে। কাল যখন কাজ ফুরোবে, দুজন দুপথে চলে যাবো। ভুলেও যাবো। আসলে, ভবিষ্যতের ভারে আমরা অসহায় ব'লেই এই বর্তমানটুকুর প্রতি আমাদের এতো আকর্ষণ।'

ওর কাছে স'রে ওর কাঁধের ওপর মুখটা রেখে বলি :

'তাই নয় কি ?'

রুকায়ার হাতখানা ছিল জলের ওপর প্রকাণ্ড পূর্ণিমা চাঁদের ঠিক মাঝখানে। অঙ্গ স্পর্শের শিহরণে ওর হাতটা কেঁপে উঠল। চাঁদটা ভেঙে গেল। ও বলল :

'তোমার মতন ক'রে একটা জিনিষ আমিও বুঝতে চাই।'

'কি ?'

'এই জীবন—এই তার আরম্ভ। অন্তহীন সৌন্দর্য্যকে পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিক সাধনা দিয়ে আমরা জীবন শুরু করি। এটা অসীম, নিঃশেষ, অথচ পরিপূর্ণ। হঠাৎ কার খামখেয়ালের ধাক্কায় সব ভেঙে তছনছ হ'য়ে যায়। আমার সে ক্ষতিতে কারো কিছু যায় আসে না। ওরা যে অচেতন তা নয়, ওরা আসলে বোঝেই না যে আমি ওদের কারণে অকারণে কি হারালাম। বোঝা উচিৎ।' থেমে আবার বলে : 'আসলে, আমি নিজেই বুঝি না, সেটা কি, সেটা কেন। তুমি বলতে পারো ?'

ওর মাথার চুল থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছিল। হাতের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললাম :

'তোমার স্বামীর কথা বলছ, না?'

রুকায়া মাথা নাড়ল, 'শুধু স্বামী নয়।' রুকায়া বললে. 'শেখ আবদুল্লাহও।'

'সে কি? বলত, শুনি।'

'শেখ আবদুল্লাহ যেদিন স্বাধীনতার পতাকা তুললেন, আমি বোর্খা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম কামালের ডাক শুনে।'

'আর পরদিনই গেলে বারামূলায়, সেবার কাজে।' অবাক হ'য়ে তাকাল আমার দিকে। গালে ঠোঁটের স্পর্শ লাগল।

মুখটা নামিয়ে ও বললে:

'তুমি কি ক'রে জানলে?'

'আবদুল্লাহ ওয়ানি আমায় বলেছে।'

'ও!'

চুপ ক'রে গেল রুকায়া। তাড়া দিলাম:

'তারপর?'

'আমি ওকে বাঁচিয়েছিলাম ওর স্ত্রী আর মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে দিয়ে। সেই কথাই ও তোমায় বলেছে কিন্তু ওর জন্যেই যে আমি আমার নিজের মৃতদেহ কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি তা ও জানেনা।'

'কি ক'রে?'

থেমে থেমে আর থেকে থেকে রুকায়া বলল:

'ওকে পুলাওয়ামা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমি আর কামাল ফিরছিলাম হেমন্তের প্রথম পূর্ণিমাতে। পামপোরের কাছে এসে দেখলাম পথের দুধারে জাফরাণ ফুলের যাকে তোমরা বল নন্দন কানন। আমার পঞ্চদশী মনের পরিকীর্ণ আনন্দে হাততালি দিয়ে কামালকে বললাম জীপটা থামাতে। জ্যোৎস্না রাত্রে জাফরাণ ক্ষেতের গানই শুনেছিলাম, দেখিনি কখন। আমি আত্মহারা হ'য়ে দেখছিলাম ঐ ঐশ্বরীক সৌন্দর্য্য, কামাল জীপ থেকে নেমে বললে, এসো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন নেমে গেলাম। তিন দিন

তিন রাত পৈশাচিক মৃত্যুর মধ্যে আমি ওকে দেখেছিলাম পৌরন্দর পুরুষের মতন। ভক্তি আর শ্রদ্ধায় মন আমার পরিপূর্ণ ছিল।

'ও আমার হাত ধ'রে নিয়ে গেল প্রান্তরেখার পানে, পাহাড়টা যেখানে প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন ছিল। ঘন নীল আকাশের তলায়, নিপীত নীলিমায়, আধো-নীল জাফরাণ ফুলগুলো পূর্ণযৌবনের প্লাবনে ভাসছিল। ও আমার গাল দুটো ধ'রে মুখখানা তুলে ধরল, শুধু বলল, 'রুকায়া'। চোখ দুটো আমার জলে ভেসে গেল। আমি কিচ্ছু চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম ওর শক্ত মুঠোয় আমার জীবনটা ও ধ'রে রাখুক, চাঁদের মায়া যেমন ঐ ফুলগুলোকে ধ'রেছিল। অব্যক্ত আনন্দে আমি অসহায়ের মতন ওর বুকে মাথা রাখলাম।'

গভীর নিশ্বাসের ঘন অবসাদ উত্তীর্ণ হয়ে রুকায়া বললে :

'আমার আধ-ফোটা জীবনের সেদিনই হল আকস্পিত জাগরণ।'

'তারপর?'

'শেখ আবদুল্লাহ দেশটাকে বানালেন নয়া কাশ্মীর আর আমরা দু'জন ঘর বাঁধলাম নবীন আনন্দে। কামাল হল দেশের এক মস্তবড় কর্তা। আমার কোলে এল সন্তান। তারপরই আরম্ভ হল পরিবর্তনের ঝড়। ইউ. এন. ও.-তে গেলেন শেখ সাহেব, ফেলে এলেন তাঁর শেরওয়ানি আর নিয়ে এলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। কামালও বদলে গেল, একেবারে অন্য মানুষ। যে মানুষের মনটা ছিল ফুলের মতন কোমল, সে হ'য়ে উঠল পাথরের মতন কঠিন। কিছু জানতে চাইলেই বলত, নিমকহারাম! খুদা পর্যন্ত নিমকহারাম!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা বলছ?' কামাল জবাব দিল না, উঠে চ'লে গেল। তখন বুঝলাম, লোকটা আর কেউ নয়, শেখ আবদুল্লাহ।

'অনেক রাত্রে একদিন যখন ও মিটিং ক'রে বাড়ি ফিরল, মদের নেশায় চুর হ'য়ে তখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। কামাল বললে, শালা নেমকহারাম, বেইমান। ওরই কাছে শুনলাম, রাজার আমলে একবার না কি মন্ত্রীর হুকুমে চালের মন হয়েছিল পাঁচ টাকা থেকে ছটাকা। সেই রাগে এক বুড়ি মাঝপথে রাজার গাড়ি থামিয়ে নিজের জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল রাজাকে। তিনি সেইদিনই চালের দর কমিয়ে করেছিলেন চার টাকা মন। অথচ চালের দর যেদিন বারো আনা থেকে হল এক টাকা সের আর এক অসহায় বুড়ি গেল শেখ সাহেবের কাছে দয়া চাইতে, উনি তাকে চড় মেরে চ'লে গেলেন নেডোস্ হোটেলে ডিনার খেতে বৃটিশ রাজদূতের সঙ্গে। পরদিন কামাল বললে, এর চেয়ে গ্রামে গিয়ে পাকিস্তানি চর মারা অনেক ভালো। ও চ'লে গেল বন্দুক কাঁধে আর আমি ব'সে রইলাম বাচ্চা কোলে।

'তারপর এলেন আমেরিকা থেকে আদলাই স্টিভেনসন্ আর আরম্ভ হল শেখ সাহেবের নতুন প্ল্যান্। সাদেক ভাই যখন সাবধান করতে গেলেন ভারতীয় নেতাদের। ওরা ওকে ভাবলেন রাশিয়ার চর। পণ্ডিতজী ব'লে দিলেন আমেরিকা আমাদের মিত্র ; ভয়ের কিছু নেই। অথচ সবাই জানে স্টিভেনসন্ কি ব'লেছিলেন।'

'কি ?'

'ব'লেছিলেন, তোমরা স্বাধীন হও, আমরা স্বীকার ক'রে নেব। বৃটেনও করবে। সুইটজারল্যাণ্ডের মতন তোমরা হবে নিরপেক্ষ। আমরা সব দেব তোমাদের। তোমরা শুধু দেবে আমাদের বেস্! হিন্দুস্থান? মানতে বাধ্য হবে তোমাদের স্বাধীনতা। পাকিস্তান ? ভয় নেই, আমরা সামলাবো! কি ভাবে সেইটা পাকিস্তানের কাছ থেকে জানতে গিয়েই উনি ধরা পড়লেন স্বাধীনতা ঘোষণার আগে গুলমার্গে শেষ মিটিং করার সময়।

'বক্‌সি ছিলেন ওঁর ডান হাত। শেখ সাহেবকে যখন গুলমার্গে

বন্দী করা হল, বক্‌সি তখন উপমন্ত্রী দর সাহেবের বাড়িতে বন্দী। সাদেকভাইকে বলা হল, উনি রাজি হ'লেন না। উনি বোঝালেন দুজনকেই যদি সরানো হয় তাহ'লে পৃথিবী বলবে এটা ভারতের ষড়যন্ত্র। তার চেয়ে ডান হাতকে যদি গদিতে বসানো যায় তাহ'লে সবাই বুঝবে শেখের ষড়যন্ত্র। বক্‌সি সাহেব রাজি হলেন। আরম্ভ হল দেশে নতুন অধ্যায় আর আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আমি স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলাম, কাশ্মীরে প্রথম হ'য়ে।'

কথার মাঝখানে কখন যে আমরা সোজা হ'য়ে ব'সেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে ওর হাতখানা আমার হাতে ধরাই ছিল। ইতিমধ্যে আমরা উজান বাইতে বাইতে শ্রীনগরের সীমানা ছাড়িয়ে এসে পড়েছি সিড ফারমের সামনে, নদীটা যেখানে মোড় ঘুরেছে আর বন্যার খাল শুরু হয়েছে। দুধারে আঁধার ঘন প্রান্তর আর উঁচু মাটির ঢিপি। চাঁদখানা বেশ বড় হ'য়ে মাঝ আকাশে ঝুলছে আর ভরা জ্যোৎস্না শিকারার পাশ দিয়ে এসে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। হিসেব ক'রে দেখলাম, নৌকাটা ডান দিকে বাঁধলে ওটা ওর পা থেকে মুখে উঠে আসবে। লোভ হল। জিজ্ঞেস করলাম :

'কখন ফিরতে চাও?'

'যখন তুমি চাইবে।'

'যদি না চাই?'

ও হাসল, বললে 'মিথ্যার প্রতি এতো মোহ কেন?'

আমিও হেসেই বলি, 'দৈনন্দিন জীবনে একটু আনন্দের তাগিদ!'

নৌকাটা ধারে বাঁধা হল। মুখ বাড়িয়ে দেখি ঠিক ওপরেই বলরাজদের মস্ত বাগান। ও ঘাড়টা কাৎ ক'রে মুখ বাড়াতেই ভরা জ্যোস্নার নীল আলো ওর কাঁধে, কালো ঘন বাদামি চুল

আর লাল ঝোব্বার মাঝখানে ঠিকরে পড়ল। লোভ আরও বেশী হল। বললাম:

'সুন্দর বাগান!'

'কি কি হয়?'

'ফলের গাছ অনেক আছে।' থেমে বলি, 'ফুলের কথা জানিনা!'

ও দুষ্টুমি ভরা চোখে হেসে বলল, 'চল, দেখে আসি!'

খানিকটা বালুর চর তারপরই একটু চড়াই। ওর নরম হাতটা আমি শক্ত মুঠোয় ধ'রে উঠে গেলাম ওপরে। জনহীন প্রান্তরে এতোখানি জীবনের কোলাহল কখন আগে অনুভব করিনি। ছ' বিঘে জমির ওপর ছড়ানো বাগান। আপেল আর আলুচা গাছের সারির মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড লম্বা পপলারের সারি। তাদের সাদা সাদা ডালগুলো যেন জ্যোৎস্না ভরা আকাশটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে আমরা হাঁটছি, হাত ধ'রে, পাশাপাশি।

রুকায়া ঠাট্টা ক'রে বললে:

'সামনে সামনে হাঁটি?'

আমি একটানে ওকে অনেকখানি কাছে এনে ওর হাতটা ঠোঁটে রেখে বলি:

'যদি পারো!'

ও পারল না। আরও কাছে স'রে এলে আমি আরও একটু কাছে টেনে কোমরটা জড়িয়ে ধরলাম। আমাদের পায়ের তলায় ঘন সবুজ ঘাস আর ওপরে পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের যে আলো মাঠে এসে পড়েছে তার মায়ামিছিল কোন শিল্পীরই জানা নেই। চারিধারে এমন নিবিড় নিশুতি যে আমাদের পায়ের শব্দও যেন সসম্ভ্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণের নিরঞ্জনা পৃথিবীর রংটাই শুধু নিংড়ে নেয়নি। শব্দও সব থামিয়ে দিয়েছে। আমরা যেন পৃথিবীকে ছাড়িয়ে গেছি।

বুড়ো চৌকিদারের ছোট্ট কাঠের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাবার আমলের বুড়ো বলে গণি মিঞার ওপর কোন বাধ্যবাধকতার বেড়াজাল নেই। ও যখন ইচ্ছে থাকে, যেখানে ইচ্ছে যায় এমন কি গাছের ফলও ইচ্ছে মাফিক ফলায়। দেখা গেল ওর ঘরে তালা ঝুলছে। আটটার সময় ও ঘরে নেই? রুকায়া বলল :

'অবাক কাণ্ড!'

বুড়োর খাটটা গাছের তলায় দাঁড় করানো ছিল। ও সেটা পেতে বসতে বসতে বললে :

'শহরের বাইরে সাতটার পর যে জেগে থাকে হয় সে রোগী না হয় চোর!'

ওর পাশে বসতে বসতে আমি বললাম :

'তাহ'লে আমরা? সহরের বাইরে আছি। সাতটার পর আছি আবার জেগেও আছি।'

'তাই তো ভাবছি সারাক্ষণ। আমরা কি?'

আমি পা ছুটো তুলে বসলাম ওর মতন। ও আমার হাঁটুর ওপর গালটা রেখে বলল :

'আর আমাদের নিয়ে কেনই বা নিয়তির এই সমারোহ?'

আমি আলতো ভাবে হাতটা রাখলাম ওর মাথার ওপর কপালটা ছুঁয়ে। ও আমার হাতটা টেনে নিল ঠোঁটের ওপর :

'ভেবে লাভ কি?'

ও বললে, 'বুঝতে চাই। জানতে চাই। আমিও জীবনটাকে পেতে চাই আর সকলের মতন সহজ আনন্দে। উপভোগ করতে চাই অসীম উৎসাহে। কেন পারিনা?'

'তোমার স্বামীর ওপর ক্ষুব্ধ অভিমানে।'

'ভুল ভুল!' ও বললে, আমার হাতটা দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে। 'আমার প্রতি কোন দুর্বলতা কখনই তার ছিল না।

আজও নেই। সে আমায় পরিকীর্ণ পঞ্চদশীতে উজাড় ক'রে নিয়েছিল। ভালোবেসে নয়, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বেসামাল দুর্বলতায়। কাশ্মীরের চেয়ে কাউকে সে বেশী ভালোবাসে না। বন্দুকের চেয়ে বড় বন্ধু তার কেউ নেই।'

'তাহ'লে?'

'তাই তো জানিনা। কত লোক, কত ভাবে কত আবেদন জানিয়ে গেছে আমায় এখানে, বিলেতে, আমেরিকায়। মন আমার কখন সায় দেয়নি।'

'কেন?'

ও ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করল।

'তুমিই বল।'

জবাব দেওয়ার আগে আমি ওকে আমার দিকে ঘোরালাম। আমার পা বেয়ে ও কোলের ওপর গড়িয়ে এলো। পাতার ফাঁকে চাঁদের আলো ওর চোখে পড়ল।

'বোধ হয়...'

থেমে গেলাম।

'থামলে কেন?'

'বলাটা বোধ হয় উচিত হবে না।'

'আমি শুনব।'

'বোধ হয় প্রথম পাওয়ার আগে প্রাণে তোমার চাওয়ার স্পন্দন ছিল না। কিম্বা হয়ত তোমার মধ্যে এমন একটা গভীর শূন্যতা আছে যা সব কিছুই মলিন ক'রে দেয়। নয়ত একটা মিথ্যা থেকে আর একটা মোহে যেতে তোমার মন চায়না। আর নয় তুমি হিম। রাগমোচন কাকে বলে জানোনা।'

ওর গাল দুটো ধ'রে মাথাটা তুলে বলি:

'এবার বল কোনটা?'

'তুমিই বল।'

'জানিনা।'

'তাহ'লে জেনে নাও!'

আমি জানতাম। আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা জানতাম যে এইটাই তার একমাত্র পরিণতি। ঘরে ওকে প্রথম দেখার সময়, তারও আগে, গত রাত্রে খাওয়ার ঘরে এবং তারও আগে উটরার স্কুল বাড়ির সামনে ওর দৃষ্টিতে যে ইশারা ছিল, আমার চোখের সামনে ওর চোখ দুটো তুলে এনে দেখলাম তারই পরিপূর্ণ বিকাশ। মেয়েদের মঞ্জিমা দৃষ্টি নয়, মধুৎসবের মনোলোভা চেয়ে থাকা; কিছুটা জল ভরা, বেশীটা ঝাপ্‌সা। মুখ চোখ ওর টানা টানা; কঠিন তনু কমনীয়; পরিষ্কার, পবিত্র, পরিপূর্ণ। ঠোঁট দুটো ভেতর দিকে অল্প চাপা, তাতে চোখ দুটো আরও কিছু বড়, আরও কিছু বোজা। সারা দেহ ছেয়ে আবেশ ছড়াল আমার কণ্ঠ থেকে কোমর পর্যন্ত। দমটা যেন বন্ধ হ'য়ে এলো। বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে কিছুতেই পারলাম না যে 'হ্যাঁ, তবে তাই হবে, আমি নিজেই জেনে নেব···আজ, এখন, এই মুহূর্তে।

অস্পষ্ট নিজেকে বলতে শুনলাম। 'তাই?'

ও আভাসে হয়ত বোঝালো; 'হ্যাঁ।'

এইটাই হল তাহ'লে আমাদের জীবনের সমারোহ, প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ, নিয়তির বিধান। আমাদের লম্বা টানা ক্লেদাক্ত অতীতে আমরা যা কিছু পাইনি তার সব ক্ষোভ নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দেব পাওয়ার পরিপূর্ণতায়। এইটাই হবে রিক্ত ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে আমাদের রিরংসা বিদ্রোহ। হক ক্ষণিক, তবু ক্ষয়হীন আবেশে আর পরিনির্বাণীয় আনন্দে আমরা সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে এই মুহূর্তের অসীম সত্যকে উপলব্ধি করব।

দেহের এমন তীব্র দাহন আগে কখন দেখিনি। অন্তরের এই অবিমিশ্রিত আকাশকুসুম আগে কখন কল্পনাও করিনি। মনের

এই আকীর্ণ আবেগ, আগে কখন অনুভব করিনি। সান্নিধ্যের এতোখানি সম্পূর্ণতা আগে কখন উপলব্ধি করিনি। সব মিলিয়ে কি সৃষ্টি করলাম অধৈর্য্যতায় অনন্তকাল ধ'রে অসম্ভবকে পাওয়ার ঐকান্তিক সাধনায়? আস্তে আস্তে বাগান হারালো, জ্যোৎস্না হারালো, কাশ্মীর হারালো, আমরা হারালাম আর হঠাৎ এক সময় মনে হল জীবনটাই বোধ হয় হারিয়ে গেল।

একটু যখন শীত শীত ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল দেখি চাঁদটা প্রায় মাথার ওপর। বাঁ হাতের ওপর মাথা দিয়ে আর মুখটা আমার বুকের ওপর গুঁজে রুকায়া অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমাদের সারা দেহের ওপর ফাটা জ্যোৎস্নার মায়াজাল বেছানো। ওর ঠোঁটের পাশে একটা ছোট্ট কাটার ওপর এক বিন্দু জমাট বাঁধা রক্ত আর ঝোব্বাটা বুকের কাছে অল্প ছেঁড়া।

'এবার ওঠো, অনেক রাত।'

রুকায়া ছেলেমানুষের মতন মুখটা আরও একটু গুঁজে দিয়ে গুণ গুণ ক'রে বলল: 'শীত করছে।'

'বাড়ি যেতে হবে না?'

'না।'

'ঘুমোও তা'হলে।'

তখন ও চোখ মেলে চাইল। ঠোঁটের কোণে সতৃপ্ত মনের অল্প আভাস ঘেরা হাসির ইশারা। রক্তবিন্দুটা তারই যেন বিজয় পাতাকা। ভার-মুক্ত দেহ, তাই দৃষ্টিতে কোন ওজন নেই, চেয়ে থাকাটা ওর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চুলের একটা গুচ্ছ কানের এ পাশ দিয়ে গলার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ওর সালোক্য পরিতৃপ্তির তলায় নিজের স্বাক্ষর লিখেছে। ও শুধু তাকিয়ে রইল। যেমন ইচ্ছে করার মতন, যা ইচ্ছে বলতেও পারি, তারি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে।

অনেক কথা মনে ভীড় ক'রে এলো। কিন্তু ভীড় ঠেলে একটাই কথা মুখে এলো: 'জেনেছি।'

'আমিও।'

'তা'হলে শুনি আর আমার জানার সঙ্গে মিলিয়ে নি।'

'তুমি বল।'

'সারা জীবনের ব্যপ্তিতে তুমি পেয়েছ এক মুহূর্তের সত্য।'

'ঠিক উলটোটা।' রুকায়া বললো, 'জীবনটাই মিথ্যার মুহূর্ত। এটাই আমার সত্যের ইতিহাস।'

ওর বাড়ি যখন আমরা পৌঁছোলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা। কামাল বারান্দায় খাঁচায় বন্দী বাঘের মতন পায়চারি করছিল। ওর দিকে অবাক হ'য়ে তাকাল। ও আরও অবাক হ'য়ে অস্পষ্ট বললে: 'তুমি? কখন এলে?···আলাপ করিয়ে দি···'

বাধা দিয়ে কামাল বললো: 'আমি জানি। কিন্তু আজ তো সময় নেই ভাইজান, কোন একদিন গুছিয়ে গল্প করব।'

ওকে বললো: 'শিগ্‌গীর চল। ভয়ানক বিপদ।'

'কি হল?'

'পুরোটা জানিনা, তবে পাকিস্তান দেশটাকে ঘিরে ফেলেছে চারিদিক থেকে। কি ভাবে আর কতটা এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খোঁজ খবর চলছে সারা দেশ জুড়ে।' আমায় বললো, 'আসবেন একদিন, অনেক কথা আছে। বাড়িতে পাবেন না আমায়। কোথায় পাবেন আমি নিজেই জানিনা। খুঁজে নিতে হবে। নেবেন কিন্তু!'

'নেবো।'

খেতে গিয়েছিলাম। খাওয়া আর হল না। গাড়ি ছুটল, ঊর্দ্ধশ্বাসে। স্বাধীনতার সংগ্রামে আরও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে, কাশ্মীর ঘুমিয়ে রইল আমাদের পথের দুধারে।

বারো

তেসরা রাত্রি

শমিত মনের সৌম্য আবেশে আমার এক পাশে রাতের মায়া দেখি আর ডান পাশে রুকায়ার মাধুরী। সামনে মায়িক রাস্তা। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জ্যোৎস্নার যে প্লাবন ছিল সেটা বোধহয় আমাদের জন্যেই, কারণ, মাথা হেলিয়ে দেখলাম আকাশটা ঘষা মেঘে মেঘে ময়লা। কারাণপুর থেকে গাগরিবল্ কম বেশী ছ মাইল কিন্তু পথ যেন আজ আর ফুরোতেই চায়না। কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য শহরের বাইরে কিন্তু লোকালয়ের জন্য মনটা অস্থির হ'য়ে উঠল। বিপদের সংবাদ পেয়েছি কিন্তু ওজনটা ঠিক জানা নেই ব'লে কিছুটা, আর পরিপূর্ণ পাওয়ার পর ব্যবধানের বোঝায় বোধ হয় বেশীটা, মন কেবলই বলছিল ওটা বেশ ব্যপ্ত। মৃত্যুর ছায়া পড়ে শুনেছি কিন্তু মনে তার এতো খানি ভার কখন উপলব্ধি করিনি। অজানা আশঙ্কায় নিজেকে বেশ অসহায় বোধ করছিলাম। ঠিক তখনই রুকায়া আমার হাতটা আলতো চেপে ধরল। হাতটা ওর একদম ঠাণ্ডা। হীম শীতল।

কাশ্মীরে এ সময় ঠাণ্ডা বড় একটা পড়ে না। টিনের ছাদ যদি মাথার ওপর থাকে তাহ'লে কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে নিতে হয় তাও শেষ রাত্রে। আজ প্রথম রাতেই বেশ শীত শীত করতে লাগল। ঝিল্লির ডাকে আর গাড়ির আওয়াজে নীরবতা আগেই বেশ গভীর হ'য়ে উঠেছিল, রুকায়ার হাতের ছোঁওয়া পেয়ে এবার সেটা যেন ক্ষুব্ধ বেদনার মতন অসহনীয় হ'য়ে উঠল। তার আরও একটা কারণ ছিল, কামাল সাহেবের কঠিন গাম্ভীর্য্য। উনি রাইফেলের নলটার মাথায় একটা হাতের ওপর অন্য হাতটা রেখে

চোখ বুঁজে ছিলেন। আমাদের প্রথম দেখার থমকে থেমে যাওয়া মুহূর্তে, রুকায়ার চাউনি আর আমার চাঞ্চল্য, ওঁর প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের কতখানি উন্মুক্ত করেছে, তা উনি বুঝতে দেন নি ; আমিও বুঝতে পারিনি। কিছু যদি উনি বলতেন, তা সে যাই হক না কেন, এই কঠিন নীবরতার বোঝা সহ্য করা সহজ হত। রুকায়া আমার ধরা হাতে ওর মুঠোটা শক্ত করল। তখনই ঐ অক্লিষ্ট নিস্তব্ধতা অসহ্য হ'য়ে উঠল। কেউ কিছু বলুক এই ভেবে নিজেই বলতে চাইলাম :

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে ' কিন্তু বলা শেষ হল না। মাঝপথেই কথা অস্পষ্ট হ'য়ে শেষ হওয়ার আগেই থেমে গেল। রুকায়া আমার দিকে তাকাল। কামালসাহেব বন্দুকের মাথা সমেত হাত দুটো নিজের দিকে টেনে নিয়ে তার ওপর কপালটা রাখলেন আর অস্পষ্ট শব্দ করলেন। 'হুম্।'

বুঝলাম, আমার কথা ওঁর ভাবনার কণ্ঠরোধ ক'রেছে। বাকি পথ আমি বাক্য হারা হ'য়ে ব'সে রইলাম।

নয়া সেক্রেটারিয়েট পেরিয়ে যখন আমরা সহরে ঢুকলাম তখন রুকায়া মাথাটা সিটের পেছনে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কামালসাহেব সোজা হ'য়ে ব'সে সামনের সিট থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে ওর গায়ে জড়িয়ে দিলেন মায়ের মতন সস্নেহে। দিয়েই উনি আমার দিকে চাইলেন। আমি হাসলাম। বললাম :

'পরিশ্রান্ত।'

উনি হাসলেন। বললেন :

'না। পরিতৃপ্ত।'

রুকায়া একবার চোখ মেলে চাইল। আবার চোখ বুঁজল আরও একটু হেলান দিয়ে। অস্পষ্ট বললে :

'তাও না। পরিপূর্ণ।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। সারা সহর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে এক আধটা কুকুর কি বেড়াল, বড় জোর দু একটা মানুষ। গাড়ির শব্দ, ছোট ছোট ঝোলানো বারান্দা দেওয়া বড় বড় কাঠের বাড়িগুলোতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, আর নীরবতা আরো নিবিড় হয়। কাঠের সাঁকো পার হয়ে গেলাম। আবার দোকান। সব অন্ধকার। ট্রেনিং কলেজ পেরিয়ে যখন নেডোস্ হোটেলের কাছাকাছি এলাম তখন কিছু মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। ব্যাণ্ড বাজছে। বাইরে অনেক গাড়ি। ভেতরে নিশ্চয় কারো পার্টি হচ্ছে। কোন বড় ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার এসেছে হয়ত গার্ল ফ্রেণ্ড নিয়ে, কিম্বা কোন বড় কণ্টাক্টর আরও বড় কণ্টাক্টের দাঁও মারছে মদ খাইয়ে। আর নয়ত আরও একটা 'কাশ্মীর কি কলি' বাংলাদেশের দেবীত্ব ছেড়ে বোম্বাই সহরের ভেনাস্ হ'য়েছেন। পরে জানা গিয়েছিল, ওটা ছিল বৈদেশিক সাংবাদিকদের আড্ডা। ওঁরা এসেছিলেন ৯ তারিখে শ্রীনগরে জনাব ভুট্টোর প্রেস কন্‌ফারেন্সে ভুট্টো সাহেবকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে!

গতকাল রাত্রে গেটের মাথায় পুলিশ ছিল, আজ সশস্ত্র সৈনিক। একজন নয় একদল। আগের বারেই শুনেছিলাম প্রায় প্রতিদিনই সাদেক সাহেবের জীবন হানির প্রচেষ্টা হয়, কখন ওঁর বাথরুমে টাইম বম্ রাখা হয়, কখন মোটরের তলায় মাইন। উনি কিছু তোয়াক্কাই কখন করেন না। আজ ওঁর গেটে পাহারার বহর দেখে বোঝা গেল, বিপদ বেশ ব্যপ্ত।

কামাল সাহেবের সঙ্গে আছি বলে আমি ওদের সন্দেহের বাইরে তো বটেই, সেলামেরও যোগ্য। পাহারা ব'সেছে মিলিশিয়ার। মিলিটারি শ্রীনগরে নেই বলা যায় না, তবে যা আছে তা যৎসামান্য। বিপদ যতই আসুক আর যে ভাবেই আসুক, সরাসরি সেটা শ্রীনগরে আসতে পারেই না। এটাই ছিল

নাকি সেনাদপ্তরের সদম্ভ উক্তি। সেটা যে কত ভুল তা বোঝা গেল দুদিনের মধ্যেই। পার্লিয়ামেণ্টে এ নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছিল তখন মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন, সবই আমরা জানতাম, কারণ কিছু ছিল বলে কথা কিছুই বলিনি! এটা যে কত বড় মিথ্যার প্রহসন তা বলার সাহস আছে, ভাষা নেই। এ যেন ঠিক জলন্ধরে আমাদের চৌকিদার সর্দার কর্ণায়েল সিংয়ের মতন। রেডিও ষ্টেশনের ষ্টোর পুড়ে একবার ছাই হ'য়ে গেল। কর্ণায়েল সিং তখন সেখানে উপস্থিত। ওকে প্রশ্ন করলাম, দেখলে যখন দাউ দাউ করে পুড়ছে তখন ডাকোনি কেন কাউকে? ও বললো, ডাকব কি করে সাহেব? পাশের ষ্টুডিওতে যে প্রোগ্রাম হচ্ছিল! ওখানে তো কথা বলাই বারণ।

আমার আর রুকায়ার দৌড় বারান্দা পর্যন্ত। ঘরে চাপা কণ্ঠে জোর কথা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ কেটা বেরিয়ে আসছে, ছুটকো ছাটকা দু কথা কানে দিয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। শ্রীনগরের যত বড় বড় মাথা সব ঐ ঘরে ঘন ঘন নড়ছে। বাইরে থেকে ওদের যেটুকু শোনা যায় তার বেশীর ভাগই ট্রাঙ্ক কলের চিৎকার—হ্যালো দিল্লী, হ্যালো বারামূলা, হ্যালো গুলমার্গ...হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। লোক আসছে অনবরত। সব বড় বড় কর্তা। কেউ হোম, কেউ মিলিশিয়া, কেউ কর্ণেল, কেউ কাগজওয়ালা। যে যাচ্ছে, ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। আমি আর রুকায়া বারান্দায় কাগজওয়ালাদের ভীড় ঠেলে এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হ'য়ে এসে আমাদের একটি সন্ধ্যার যে একাত্ম সান্নিধ্য, এই অজানা আশঙ্কার গভীর অন্ধকারে তার সবটুকুই হারালো, একদম নিঃশেষে। কথাও আমাদের কেড়ে নিয়েছে কাশ্মীর। হঠাৎ এক সময় রুকায়া বলল ঃ

'নাঃ এই অনিশ্চয়তার অসহ্য যন্ত্রণা আর সইছে না। তুমি দাঁড়াও। আমি আসছি।'

রুকায়া যখন যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো তখন সামনের ভীড় আপনা থেকেই দু আধখানা হ'য়ে গেল। মনে মনে হাসলাম। সামনে যত বড় বিপদই থাক না কেন, পেছনে যদি সুন্দরী কোন মেয়ে থাকে তাহলে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তাকে ঘিরে থাকবেই। সেইজন্যেই বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের স্থান নেই, নইলে মানুষ মারার অত বড় যন্ত্র পৃথিবীতে আর কি আছে ?

রুকায়া ফিরে এলো রফিক সাহেবকে নিয়ে। তাঁরই কাছ থেকে জানা গেল যে চারিদিক থেকে বিপদের চিৎকার আসছে। প্রায়তঃ বলা যায় যে, উনিশ শো সাতচল্লিশে পাকিস্তান যে ভাবে হানাদার পাঠিয়েছিল এবারের ব্যবস্থা হুবহু না হ'লেও অনেকটা অনুরূপ। জানা গেছে যে, ক্যাপ্টেন কোহলির অধীনে যে পঁচিশজন সৈনিক ফকীর মহম্মদের সঙ্গে সকালে গেছে তুষ ময়দানে তাদের একজনও ফেরেনি এখনও পর্যন্ত। তাদের ফেরা উচিত ছিল পাঁচটার আগে। তুষ ময়দানের তিন মাইল এদিক পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রেডিওতে। বেলা একটায় সেই যে সংযোগ ছিন্ন হয়েছে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। ওখানকার বড় কর্তা সেই থেকে অনবরত চিৎকার করছেন লোক পাঠাও, লোক পাঠাও। কোহলির মতন বিচক্ষণ অফিসার যখন সময়মত ফেরেনি তখন কোন বড় ধরণের বিপদ অবশ্যই আছে।

ওদিক থেকে সংবাদ এসেছে টিথওয়াল এলাকার। আর গুরেজে হানাদাররা উঠে এসেছিল একেবারে সৈন্য শিবিরে, সেখানে আন্দাজ পঞ্চাশ জনের যে প্রথম দল এসেছিল তাদের মধ্যে মারা গেছে আন্দাজ তিরিশ। বাকি লোকগুলো আবার নেমে গেছে নিচে। ওদের পুরোভাগে ছিল যে ছোট্ট ছেলেটি সে প্রথম গুলিতেই মারা গেছে আর গ্রামের লোক তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে বলে নিচে নেমে গিয়ে দেখেছে সেখানে দ্বিতীয় দল এসে হাজির হয়েছে প্রায় আরও পঞ্চাশ। গ্রামবাসীরা সৈন্য সাহায্য

না নিয়ে নিজেরাই ওদের সঙ্গে লড়ছে, ওপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে। হানাদার রাইফেল, ষ্টেন আর ব্রেন্ গান নিয়ে অনবরত চেষ্টা করছে ওপরে উঠে আসবার কিন্তু নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের গড়িয়ে ফেলা পাথরের ধাক্কায় বারে বারেই তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। ওপারের পাহাড়ে উঠে গেছে বহু হানাদার আর সেখান থেকে অনবরত গুলিবর্ষণ করছে এ পাহাড়ে গ্রামবাসীদের ওপর, আর সৈন্য শিবির তাক্ ক'রে। আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য তাদের সঙ্গে লড়ছে। আমাদের ঘাঁটির ডান দিক বাঁ দিক সামলাবার লোক নেই। গ্রামবাসীরা যদি তাদের ঐ পাথর গড়িয়ে ফেলা যুদ্ধ থামিয়ে স'রে যায় তাহ'লে গুরেজের পতন অবশ্যম্ভাবী! আর গুরেজ যদি যায় তাহ'লে ঐ এলাকাও চ'লে গেল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কজন মরেছে এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি আর আপাততঃ জানা সম্ভবও নয় কারণ, যারা মরেছে তারাও ঐ পাথরের মতন গড়িয়ে পড়ছে নিচে আর ছ একটা হানাদারকে যে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে না তাও নয়। একমাত্র ভরসা হল ওখানকার গ্রামের বুড়ো জালালউদ্দিনের কথা। সে বলেছে ওরা শেষ পর্যন্ত লড়বে। যতক্ষণ কারণা তহশিলের একটা লোক বেঁচে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা হানাদার ওপরে উঠবে না। তারপর কি হবে তা কেউ জানে না কারণ সেটা খোদাতালার মর্জি!

পুলিসসাহেব খবর দিয়েছেন বারামূলা থেকে। মহীউদ্দিন পাটোয়ারি এসে যা তথ্য জানিয়ে গেছে তাতে জুগু খারিয়ার ময়দানে লোক আছে কম ক'রে দেড় হাজার। উনি একশোজন লোকের একটা পার্টি নিয়ে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সামঝোতা করতে কিন্তু তাতে ওঁর নিজের যতই বিপদ থাক, বিপদ বেশী বারামূলার। হাজিপীর অঞ্চল থেকে যারা এসেছে তারা সম্ভবতঃ সবাই জুগু খারিয়ার ময়দানে জড় হ'য়েছে; কিন্তু উরি? সেদিক থেকে যদি কোন সমাবেশের সংবাদ আসে তাহ'লে কে সামলাবে? ছোট

সাহেব রাজি কিন্তু লোক কোথায়। তাছাড়া, উনি জানালেন, ওদিক থেকে যদি কোন আক্রমণ হয় তাহ'লে পথে পড়বে মোহারা পাওয়ার হাউস। সেটার যদি সামান্য ক্ষতিও হয় তাহ'লে সারা শ্রীনগর অন্ধকার। গতবার এইটাই তারা ক'রেছিল। এখন হুকুম? জানা গেল, তাঁকে হুকুম দেওয়া হ'য়েছে জুগু খারিয়ার পানে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে। উরি অঞ্চল থেকে যদি কেউ আসে তখন দেখা যাবে।

সদলবলে ওঁর যাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই এলো দীন মহম্মদ, সোজা শ্রীনগর, সরাসরি সাদেক সাহেবের বাড়িতে।

গেটের লোক তাকে গলা ধাক্কা দিল। যেখানে ওপরওয়ালাদের অনবরত আনগোনা সেখানে দীন মহম্মদের মতন দীন দরিদ্রের তো আসাটাই অন্যায়। সকাল থেকে সারা পথ দীন মহম্মদ ছুটতে ছুটতে এসেছে, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সোজা শ্রীনগর। গেটের কাছে এসে সে আর দাঁড়ালো না, সাদেক সাহেবের নাম অতি কষ্টে অত্যন্ত অস্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়ে গেল। সবাই বললে, ও শালা ভিক্ষে চায়। অমরনাথ বল, মিলিশিয়ার মস্ত সাহেব; তিনি ওকে ওখানে ঐভাবে পড়তে দেখে পা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডিস্‌গাষ্টিং!' সেই সময় সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হোম্ মিনিষ্টার দুর্গা দর। দীন মহম্মদ তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললে:

'হুজুর কাশ্মীরকে বাঁচান!'

উনি হেসে ওকে সরিয়ে বললেন, 'সেই জন্যেই তো যাচ্ছি!'

ঐ মুমূর্ষু মানুষটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বললো:

'একলা তো পারবেন না হুজুর, সেখানে তো কম ক'রে দু হাজার লোক আর দুশো লরী বোঝাই গোলাবারুদ!'

চমকে উঠলেন দুর্গা দর। বললেন, 'কোথায়?'

'য়ুশ মার্গের ময়দানে।'

'কি ক'রে জানলি?'

'আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।'

'কখন?'

'আজ সকালে। সেইখান থেকেই আসছি।'

ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন দুর্গা দর একেবারে খাস্ মহলে। ওরই কাছে জানা গেল, য়ুশ মার্গে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের কথা আর জানা গেল, হিন্দুস্থানি রক্ষাকর্তাদের আরও জঘন্য মনোবৃত্তির কথা।

অন্যান্য সব জায়গায় পাকিস্তানি সৈন্য আর মার্কিনী মারণাস্ত্র এসেছে অজানা অন্ধকারে কিন্তু এই এলাকায় সব এসেছে সরাসরি লরীতে, সকলের চোখের সামনে দিয়ে টাকায় সতর্ক দৃষ্টি অন্ধ করে আর সকলের মুখ বন্ধ করে। ওই বলল, যে 'চেনারি' অঞ্চলে ঠিকাদার ওদের পুরো গ্রামের সব চাষীদের মাঠ ইজারা নিয়েছিল প্রত্যেককে দুগুণ দাম দিয়ে, ধান পাকবার অনেক আগে। তারপর, মাঠে কাজ করতে গেলেই ওদের নাকি ঠিকাদারের লোক খেদিয়ে দিত, বলত, ছমাস এখন এসব মাঠ আমাদের, যেমন ইচ্ছে চাষ করব, তোদের তাতে কি? জমির মায়া ছাড়তে না পেরে যারা জোর করত, প্রাণের মায়া ক'রে তাদের পালাতে হত, আমাদের সেপাই আর সৈন্যদের হুমকিতে। ধান তো কেবল ওদের ধন নয়, সন্তানও। তাই, মাঠ ছেড়ে সব থাকতে পারবে কেন? যে দুচারজন প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে রাতবেরাতে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখতে যেত ক্ষেতগুলো, তারা দেখত, অনেক লোকের আসা যাওয়া, অনেক লরীর আনাগোনা আর সারারাত ধ'রে মোট নিয়ে মানুষদের পাহাড়ে ওঠা নামা।

গত অমাবস্যার অন্ধকারে ওর সঙ্গে ফতা গিয়েছিল মাঝরাতে তার মাঠ দেখতে। এবার অনেক খরচা ক'রে ফতা সারের সঙ্গে

চায়ের পাতা মিশিয়েছিল ফসল ভালো হবে ব'লে। তাই দেখতে গিয়েছিল আর থাকতে না পেরে। দূর থেকে ভালো ক'রে দেখা যাবে কেন? চুপি চুপি মাঠের ধারে গিয়ে দেখে, ইয়া আল্লাহ, ফসল তো নয় মোটা মোটা, নধর পুষ্ট, ঠিক বকরি-ঈদের জন্য অনেক আদরে পোষণ করা বকরার মতন। অধীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই কথাই যখন ও দীন মহম্মদকে বলেছিল আর লোভ ক'রে লড়কা বিকিয়ে দেওয়ার মতন শোকে হা হুতাশ করছিল তখন খানদশেক লরী সোজা ঢুকে গেল ওর ক্ষেতের মধ্যে। তাই দেখে ফতা এমন বিকট আর্তনাদ ক'রে উঠল, যেন লরীগুলো ওর সারা খানদানকে চাপা দিয়েছে। ব্যস্ এতোদিন যে সব সেপাই কেবল গুঁতোর ভয় দেখাতো তারা দমাদম গুলি ছুঁড়লো চারিদিকে। নেহাৎ অন্ধকার ছিল তাই কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ওরা পালিয়ে এলো এক দৌড়ে একেবারে গ্রামে।

পরদিন রাত্রে ফতা বলল, চ' দেখে আসি কত ক্ষতি হল আমাদের ক্ষেতগুলোর। দীন মহম্মদ বললে, ক্ষেপেছিস্, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। যা হওয়ার তাতো হ'য়েই গেছে, এখন আল্লাহ আল্লাহ কর। রসুলিল্লাহর মর্জি হ'লে সামনের ফসল তোর আরও মোটা হবে, বেটাকে ছাড়িয়ে তোর বিবির মতন। তা যদি হয়, ফতা বললে, সারারাত বুকে চেপে পড়ে থাকব। তুই ঠিকই বলেছিস্ জমিন থাকলে আর জান থাকলে ফসলের ভাবনা কি।

মুখে যাই বলুক, মন মানবে কেন? খবসুরৎ বিবি আর ভালো ফসল, শালা খোওয়াবেও ছাড়েনা। মাঝরাতে ফতা ঠিক এসে হাজির, বললে, খোদার কসম নিচে আর নামবোনা, পাহাড়ের ওপর থেকে দেখেই চ'লে আসব। দীন মহম্মদের বৌ তখন সবে দরি বিছিয়েছে। সে তো ক্ষেপেই আগুন অথচ ফতাও ছাড়বার ছেলে নয়। শেষকালে অনেক সাধ্য সাধনার পর বৌর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া গেল, আর কখন না যাওয়ার কসম কবুল করে

ঘর থেকে বেরিয়েই দান মহম্মদ বললে, দিলি শালা সব মাটি ক'রে! আজ পাঁচদিন বৌটা কাছে ঘেঁষতে দেয়নি, খোদার কসম্! ফতা হেসে বলল, তা যা বলেছিস্! বিকেলে বৌটাকে যেই বললাম, চ' ভেড়াগুলো গুনে গেঁথে তুলে আসি খামারে, সে তো আমায় মারেই আর কি? বললে, ইয়া আল্লাহ, সকাল থেকে তিনবার তো হল ভেড়া গোনা, আবার। দরকার নেই বাপু দু গুণ টাকায় আর কখন জমিন ইজারা দিলে জেনানাও খান দশেক ইজারা নিস্। আমার একার কম্ম নয়।

দুজনে ওরা উঠে গেল পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখে শান্তি পাওয়ার মানুষ ফতা নয়; বললে, চল, নিচে যাই। ব্যস্ একবার, আর কোনদিন যাবোনা, আল্লাহর কসম্! বাধ্য হ'য়ে নিচে নামতে গিয়ে ওরা দেখলো মোট মাথায় অনেক লোক সার বেঁধে ওপরে উঠে আসছে আর সঙ্গে তাদের বন্দুক-কাঁধে সেপাই। কে আসছে? কি আনছে? আর কোথায়ই বা যাচ্ছে! লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে ব'লে ওরা এক গুহায় ঢুকল পাহাড়ের গায়ে! ইয়া আল্লাহ! এ যে একেবারে গোলাবারুদের গুদাম। লোকগুলো ও পাশ দিয়ে পাহাড়ের ওধারে চ'লে গেল। ওরা ঘুরে ঘুরে দেখল গুহার পর গুহা গুদাম হ'য়ে আছে গোলা বারুদ আর বন্দুকে। পাহাড় পেরিয়ে ওরাও এলো এপাশে। য়ুস ময়দান ভর্তি খালি লোক আর লোক। ফতাকে নজর রাখবার জন্য বসিয়ে রেখে সেই যে ছুটতে আরম্ভ করল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে, পথে কোথাও আর পিশাব করতেও থামেনি!

এদিকে খবর এসেছে বড়গাম থেকে। খবর দিয়েছে এয়ার-পোর্টের নাইট ওয়াচম্যান, নসীরউদ্দিন। ও বললে, ঘণ্টা খানেক হল ভাই সাব গুলাম কাদের এসেছিলেন পাগলের মতন ছুটতে ছুটতে, কেন ও জানেনা। তার অল্পক্ষণ পরেই এয়ারপোর্টের ক্যাম্প থেকে সব সেপাই বেরিয়ে গেছে দল ক'রে বড়গামের দিকে

আর মিনিট কয়েক হল গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছুটা দূর থেকে। কতদূর থেকে? নসীরউদ্দিন বললে, তা হবে কোশ দু'চার। আর ক'জন লোক আছে এয়ারপোর্টে এখন? ও বললে, তা হবে জনা দশেক। দুজন মিস্ত্রী, দুজন ওরা নাইটওয়াচম্যান আর ছ'সাতজন সেপাই। তবে ভয় নেই, সকলের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার আছে—ওদের দুজনের হাতে লাঠি, মিস্ত্রিরা নিয়েছে হাতুড়ি আর সেপাইদের হাতে তিন শো তিন নম্বর রাইফেল তো আছেই! যে ক'জনই আসুক ওরা মুকাবলা করতে কসুর করবে না কিছুতেই।

বড়গাম থেকে সংবাদ এলো আরও মারাত্মক। উটরা গ্রামের মধ্যে ওরা জমিয়ে ব'সেছে কম ক'রে শ দুয়েক লোক। সামনের পাহাড়ে হিন্দুস্থানি ফৌজ জমা হয়েছে জনা কুড়ি। তিনজন ইতিমধ্যেই মারা গেছে; গুলাম কাদের সবার আগে। ঝানঝ পাহাড়ের তলা দিয়ে লোক আসছে আরও কম ক'রে হাজার খানেক। সারা গ্রামে গিস্ গিস্ করছে হানাদার। যেন মেলা বসেছে। লাইট মেশিন গান্ আর হাতে বোমার ফোরায়া ছুটছে আর কিছুলোক দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে ও পারের পাহাড়ের তলায় পৌঁছে গেছে। হিন্দুস্থানি ফৌজ প্রাণপণ লড়ছে কিন্তু তিন শো তিন নম্বর রাইফেল দিয়ে সামলাবে কতক্ষণ? ওরা সামনের পাহাড়ের হানাদারদের সঙ্গে বেসামাল বুঝছে আর পাহাড়ের ঠিক নিচে যেসব হানাদার জমা হয়েছে তাদের সঙ্গে ওপর থেকে লড়ছে গাঁয়ের লোক, বড় বড় পাথর গড়িয়ে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার খবর এলো। উটরা গ্রাম ওরা দখল ক'রে গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। ক্ষেতের ওপর ওদের তাঁবু পড়েছে, খাবারের জন্য লুঠতরাজ হচ্ছে আর যারা সাহায্য করছে প্রাণের ভয়ে তাদের ওপর টাকার বৃষ্টি পড়ছে! এদিকে, দুধ-গঙ্গা পেরিয়ে যে লোকগুলো এ পাহাড়ের

তলায় এসেছিল তারা গ্রামবাসীদের পাথর বর্ষণে ওপরে উঠতে না পেরে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। কিছু পাহাড় ঘুরে ও পাশে গেছে ওপরে উঠবার জন্য আর বেশী গেছে দু-গঙ্গার ওপর দিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে। আরিগামে ওদের না আটকালে এয়ারপোর্ট সামলানো শক্ত হবে।

রাত একটা নাগাদ বড় ধরণের বিপদের সংবাদ এলো গুলমার্গ থেকে। এনেছে ফকীর মহম্মদেরই লোক, সম্পর্কে ওর চাচাতো ভাই। ফকীরকে সে সৈন্যসমেত ওপর দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল কি ব্যাপার। জানতে পেরে সে ছুটেছিল পাহাড়ে পাহাড়ে সবাইকে সতর্ক করার জন্যে। বেলা চারটের সময় সে যখন ফিরে যাচ্ছিল নিজের মাঠে তখন হঠাৎ দেখল, নিচে থেকে উঠে আসছে একদল লোক আর সঙ্গে আনছে ফকীরের বৌ আর দুদিনের ছোট ছেলেটাকে। ব্যাপারটা দেখে তার যত হল ভাবনা তত হল ভয়। একবার ভাবল গিয়ে জিজ্ঞেস করে কি ব্যাপার? কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। আড়ালে থেকে ওদের ওপর দৃষ্টি রেখে ওপরে উঠে দেখল ঝর্ণার ঠিক ধারে জনা কুড়ি পঁচিশ সেপাই মরে পড়ে আছে আর ফকীরের বৌকে তারা নিয়ে যাচ্ছে মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে। পাঁচটা পর্যন্ত সে মাঠের ধারে ছিল। আরো থাকত যদি না পাহাড়তলির লোকগুলো দলে দলে এদিক ওদিকে ছিটকে পড়তে আরম্ভ করত। ওদের দলে দলে এদিক ওদিক যাওয়া দেখে বুঝল ওর দিকে আসতেও তাহ'লে আর দেরি নেই। সেই ভয়ে ও পালিয়ে সোজা এসেছে সংবাদ দিতে। ফকীরই না কি ওকে বলেছিল, কাশ্মীর আমাদের বাঁচাতেই হবে, যেমন ক'রে হক।

আসবার সময় ও যখন বাবা মাঋষির জিয়ারত পেরিয়ে ধোবি

ঘাটের দিকে আসছিল তখন ও নিজের চোখে দেখেছে কম ক'রে শ' ছয়েক লোক আর খচ্চরের পিঠে অনেক 'সামান' নিচে নামছে। ঐ পাহাড়ি পথে 'পাট্টান' খুব বেশী হ'লে তিন ঘণ্টার পথ। পাট্টান থেকে শ্রীনগর পিচ ঢালা পথে আঠারো মাইল। এইখানেই পাহাড়ের শেষ আর উপত্যকার শুরু। একবার যদি ওরা পাট্টান পৌঁছে যায় তাহ'লে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে যাবে, আর ধরা সহজ হবে না। পাট্টান থেকে চার মাইল দূরে আছে 'মিত্রগুণ্ড'। ওটা রাজার আমলে ছিল শ্রীনগর আগলবার সৈন্য-ঘাঁটি। এখনও সেটা ঘাঁটি, তবে নামমাত্র। সোজা পথে যদি ওরা যায় তাহ'লে হয়ত আটকানো যাবে কিন্তু তা কি ওরা যাবে? এখবর থেকে বোঝা গেল টন্‌মার্গ দিয়েও ওরা ভেতর ঢুকেছে আর সোজা নেমে আসছে শ্রীনগরের দিকে।

জীবনের সব থামে শুধু সময় থামে না। দেখতে দেখতে রাত দুটো বাজল। লোকের আসা যাওয়া থামেনি। ঘন ঘন সৈন্য দপ্তরের বার্তাবহ লোক আসা থামেনি। টেলিফোন তো কান থেকে নামেইনি। সারা সন্ধ্যা আর মাঝ রাত পর্যন্ত ছোট ছোট যে সব খবর এসেছে সেগুলো মুখে মুখে সাজিয়ে দেখা গেল যে মাথার ওপর এতোবড় বিপদ কাশ্মীরের ইতিহাসে কখন আসেনি আর কাশ্মীরবাসীরা এমন একাগ্র মনে কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, চেয়ার টেনে যে বসব তাও ভুলে গেছি। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল, ভেতর থেকে। সচকিত হয়ে ঘুরে দেখি সাহেবরা সব সদলবলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। সবার পেছনে কামাল সাহেব। উনি আমাদের দিকে চলে এলেন বারান্দার কোণে, রুকায়াকে বললেন, ও যেন বাড়ি চলে যায় আর কাল সকালে সময়মত আসন্ন সংগ্রামে নিজের দায়িত্বটা ভাইজানের কাছ থেকে বুঝে নেয়। আভাষে যা বললেন তাতে বোঝা গেল,

আসন্ন সংগ্রামটা সহজ নয় এবং সহজে থামবার তো নয়ই। পাকিস্তানে এর প্রস্তুতি বহু দিনের আর পরিমিতি অনেকখানি। আরও বোঝা গেল বড় একটা কিছুর এটা ব্যপ্ত পূর্বাভাষ।

কথা বলতে বলতে কামাল সাহেব আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন। উনি রুকায়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন আর আমি ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম কোন ভাষায় ওঁকে ব্যক্ত করা যায়। সুপুরুষ বললে সব বলা যায় না। সাধু পুরুষ বললে অনেকখানি বলা হয় কিন্তু হয়ত ওঁর বীরত্বটা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে যায়। দেখতে দেখতে মনে হল উনি আসলে ও দুটোর কোন একটা নন। এক সঙ্গে দুটোই তার সঙ্গে বীর পুরুষও। ভালো লাগল ওঁকে। চেহারার জৌলুস নেই ঠিকই কিন্তু বিরাটাকার পৌরুষের একটা বিশাল জ্যোতি আছে। এখন বোঝা গেল, আসবার সময় ওঁর চারিধার ঘিরে যে কঠিন গাম্ভীর্য্য গাড়িতে থম থম করছিল সেটা কোন বেদনার নয়, ব্যক্তিগত বিরক্তিরও নয়; বিপদের পরিমাণটা সঠিক ভাবে না জানার অসহিষ্ণু অধৈর্য্যতা। এখন বিপদের সবটা না হ'লেও বেশীটা জানেন তাই ভাবনার বোঝা নামিয়ে উনি ভারমুক্ত।

রুকায়ার সঙ্গে কথা শেষ ক'রে উনি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, যেন কতদিনের জানাশোনা। রুকায়া কাশ্মীরি ভাষায় কিছু একটা ব'লে চ'লে গেল। তখন দ্বিতীয় হাতখানা উনি আমার অন্য কাঁধে রাখলেন। খুব সহজ ভাবে বললেন:

'আপনার সঙ্গে আলাপটা আমার বাকি র'য়ে গেল।'

'ফিরে আসুন। হবে।'

উনি আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। এ পাশ ও পাশ থেকে লোক ঘুরে তাকালো। বললেন:

'বন্দুক নিয়ে যারা খেলা করে তারা যাওয়ার জন্যে তৈরী থাকে ফেরার কথা জানে না।'

'বেশ তো', আমি বলি, 'কাল কোথায় থাকবেন বলুন, আমি নিজেই যাবো আপনার কাছে!'

'থাকবো শত্রুর মুখোমুখি। কোথায় তা জানিনা।'

'কি ক'রে জানা যাবে?'

'আমি খবর দেবো। কাল নয়, কোন একদিন।'

'আমার কিন্তু থাকার মেয়াদ অল্প। কাজ অনেকটাই হ'য়েছে। যেটুকু বাকি আছে সেটা সারতে দিন চারকের বেশী লাগবে না। হ'য়ে গেলেই চ'লে যাব।'

উনি আবার হাসলেন, সেই আগের মতন ক'রে, বললেন: 'যেতে চাইলেই কি যাওয়া যায়?'

'আমার তো পিছু টান নেই!'

ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে উনি ছোট্ট ছেলের মতন দুষ্টুমি ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন:

'নেই? ঠিক ক'রে বলুন তো? দিল সাফ ক'রে বলুন!'

ওঁর কথা এমন সহজ, এমন সরল আর এতোখানি স্পষ্ট যে লজ্জায় মনটা আমার কেঁচোর নতন কুঁকড়ে গেল। উনি যে কি বলতে চাইছেন সেটা তো আমি বুঝি কিন্তু বলি কি ক'রে?

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

অল্প হেসে বললেন:

'বুঝছেন ঠিকই, বলবার সাহস নেই।'

থেমে, আমার হাত দুটোকে মুঠোর মধ্যে সাদরে ধরে বললেন:

'কৈ বাৎ নেই। আজ থাক, আর একদিন ও কথা হবে যখন আমায় আপনি আরও একটু চিনবেন, আমাদের জীবনটাকে আরও একটু জানবেন আর রুকায়াকে আরও একটু বুঝবেন। চলি!'

আমরা দুজনে যখন বারান্দার এ কোণে এলাম তখন রুকায়া ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বোঝা গেল ও আমাদের কথা

বলবার সুযোগ ক'রে দিয়ে আড়ালে ছিল, কথা শেষ করার অপেক্ষায়।

কামাল সাহেব ঘুরে বললেন : 'তোমার জন্যে গাড়িটা রইল, ইনি তোমায় বাড়ি পৌঁছে আসবেন!'

'এতো রাত্রে আবার ওঁকে কেন?' রুকায়া বললে, 'আমি একলাই চ'লে যেতে পারব।'

'পারবে জানি। সারা পৃথিবী তুমি একলা বেড়িয়েছ, কখন আমার মনে এতটুকু ভাবনা হয়নি!'

'তাহ'লে?' রুকায়া প্রশ্ন করল, 'আজ এতো ভাবনা কিসের?'

এক পলক অনিমেষ ওর দিকে তাকিয়ে আর দু'হাত ওর সস্নেহে মুঠোর মধ্যে ধ'রে কামাল সাহেব বললেন :

'ভাবনা তোমার জন্যে নয়, আমার জন্যে।'

ওঁর কথায় এতো করুণ আবেদন যে রুকায়া রাজি হল।

'আচ্ছা!'

ইতিমধ্যে সবাই চ'লে গেছে। এখানকার এতো চাঞ্চল্য এক মুহূর্তে সব শেষ। অখণ্ড নীরবতা ভেদ ক'রে কামাল সাহেবের জীপ গর্জন ক'রে উঠে উল্কার মতন যেন উবে গেল। সিঁড়ির ধাপে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। ও এবার আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'আমারও ইচ্ছে ছিল তোমায় ধ'রে নিয়ে যাবো।'

'তাহ'লে আপত্তি করলে কেন?'

'ও দেশের জন্যে লড়তে যাচ্ছে।' রুকায়া বললে, 'তাই সন্দেহের বোঝা সঙ্গে দিতে চাইনি। সেটা অন্যায় হত।'

'সন্দেহ?' হেসে বললাম, 'তার কোন অবকাশই ওঁর মনে নেই। চল যাওয়া যাক।'

'একটা জিনিষ দেখে যাও।'

ও আমায় মিটিং ঘরে নিয়ে গেল। দেয়ালজোড়া কাশ্মীরের

প্রকাণ্ড ম্যাপখানা ছোট ছোট লাল ফ্ল্যাগে ছেয়ে আছে, এদিক থেকে ওদিক।

'কি ব্যাপার?'

'যেখানে ওদের পৌঁছোনোর সংবাদ পাওয়া গেছে, ঐ চিহ্ন দেওয়া হ'য়েছে।'

পরীক্ষা ক'রে দেখলাম দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দেখা গেল বৃত্তাকারে সারা কাশ্মীরে লোক ঢুকেছে, সাত জায়গা দিয়ে—নিচে য়ুস মার্গ থেকে আরম্ভ ক'রে, পুঞ্চ, গুলমার্গ, টনমার্গ, হাজিপীর, উরি, টিথওয়াল হ'য়ে ও মাথায় কারগিল পর্যন্ত। যাকে ব'লে রীতিমত সাত পাকে বাঁধা! লোক সংখ্যার হিসেব স্পষ্ট ভাবে কোথাও কিছু লেখা নেই তবে ঐ ফ্ল্যাগের উপরই যে কাটাকাটি তাতে আন্দাজ করা যাচ্ছে কম ক'রে হবে ওরা চার হাজার তো বটেই। কাগজে অবশ্য বলা হয়েছিল বারো শো!

এতো দুঃখেও হাসি পেলো। আঠারো বছর ধ'রে যে দেশ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এতো আন্দোলন আর পাকিস্তানের সঙ্গে দৈনন্দিন গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি তার নিরাপত্তার এই ব্যবস্থা? ভারতের সামরিক খরচা কেউ জানেনা কারণ ওটা গোপন তথ্য কিন্তু শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এই বিরাট ফাঁক এলো কোথেকে আর কেমন করেই বা? মনে পড়ে গেল কোন এক উচ্চ পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষের হাহুতাশ। গত হাঙ্গামার সময় পণ্ডিতজীর দপ্তর থেকে সামরিক বিভাগকে নাকি নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছিল যেগুলি যেন এমনভাবে ছোঁড়া হয় যাতে কোনমতেই ব্যুলেট পাকিস্তানের সীমানায় না পড়ে। অর্থাৎ শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের হতভাগ্য সৈনিককে হিসেব করে নিতে হবে:—(১) যেখানে দাঁড়িয়ে সে গুলি ছুঁড়ছে সেখান থেকে পাকিস্তানের সীমানা কত দূর, (২) ব্যুলেটটা যদি শত্রুর গায়ে না লেগে সোজা বেরিয়ে যায় তাহ'লে কোথায় গিয়ে সেটা পড়তে পারে এবং (৩) যদি ওপারে গিয়ে ব্যুলেটটা পড়ার

এতোটুকু সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তাকে হিসেব মাফিক কতটা আন্দাজ পেছোতে হবে এবং (৪) যদি কোন কারণে গুলিটা গিয়ে পড়েই পাকিস্তানে আর তার ফলে চাকরি যায় তাহ'লে কি করবে?

পণ্ডিতজী মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। আন্তর্জাতিক বৈঠকে বসবার অধিকারও আমরা পেয়েছি অনেকখানি তাঁরই কারণে এটাও ধ্রুব সত্য, কিন্তু বন্ধু কজন পেয়েছি ভাববার কথা। তাঁর পরমতম বন্ধু মাউন্টব্যাটেন কি ক'রেছেন কাশ্মীরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাঁর বন্ধু আমেরিকা কি করেছে, আদলাই ষ্টিভেনশনের কাশ্মীর ভ্রমণ আর তার পরই শেখ আবদুল্লাহর কার্য্যকলাপ তার সাক্ষ্য। সারা আরব কি করেছে গত যুদ্ধের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাঁর বন্ধু চীন তাঁর জীবিতকালেই বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছে আর তাঁর বন্ধু ইন্দোনেশিয়াও গত যুদ্ধেই তাঁর বন্ধুত্ব সুদ সমেত আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতের সীমানায় যদি আসি তাহ'লে উড়িষ্যার কোটিপতি বিজু পট্টনায়েক আছেন তাঁরই অক্ষয়কীর্তি! ১৯৪৭ সালে ইনি প্লেন উড়িয়ে আর সাপ্লাই ড্রপিংয়ের কণ্ট্রাক্ট নিতেন দিল্লী শহরে। আজ উনি কোটিপতি। মোরারজী দেশাই ওঁর অনৈক্য সৃষ্টি। প্রতাপ সিং ম'রে বেঁচেছেন এবং সবাই জানে, ম'রে বাঁচিয়েওছেন। আরও ওদিকে গেলে মহানুভব শেখ আবদুল্লাহ যিনি আজ জেলে, মহাপ্রাণ বক্সি গুলাম মহম্মদ যিনি হকি ষ্টিক হাতে বাসের আড্ডায় ভাড়াটে ডাকতেন ১৯৪৬-এ, আর লোকে বলে কোটি টাকার মালিক হ'য়ে বসলেন কুড়ি বছরের মধ্যে। আজ তিনি তাঁর নাতনীর সমবয়সী খুরসিদ বেগমকে নিয়ে খোস্ মেজাজে আছেন পাকিস্তান থেকে কম ক'রে পনেরো হাজার ঘরজামাই আনবার পর। পণ্ডিতজীরই অমর সৃষ্টি কৃষ্ণ মেনন আর জেনারেল কল যাঁরা চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় খাঁকি হাফ প্যাণ্ট পরিয়ে আর বাটার কাপড়ের জুতো পায়ে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়েছিলেন হিমালয়ের জ'মে যাওয়া ঠাণ্ডায় লড়াই

করতে। সেই পনেরো দিনে কম ক'রে তিরিশ হাজার সৈন্য যে আমাদের ম'রেছিল, এটা আমার সৈন্যদের মুখে শোনা কথা, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তিরিশ না হ'য়ে যদি ষাট হত ক্ষতি ছিলো না, যদি সৈন্যরা আমাদের যুদ্ধ ক'রে মরত। তারা বেশী মরেছিলো নিউমোনিয়া আর ফ্রষ্ট বাইটে। বলা বাহুল্য, এটাও সৈন্য মহলের কথা, আমার নয়।

এহেন পণ্ডিত নেহেরু যদি দেশের শাসনভার ছেড়ে বিশ্বমৈত্রীর সংস্থা খুলে জীবন কাটাতেন তাহ'লে কাশ্মীর নিয়ে এই হাঙ্গামা আমাদের আজ কিছুতেই হত না। দেশ ভাগ হওয়ার আগেই সর্দার প্যাটেল স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছিলেন। পারেন নি শুধু কাশ্মীরকে তার কারণ কাশ্মীর নয়, উনি নিজেও নন—পণ্ডিত নেহেরু। মহারাজ রাজি ছিলেন, সর্দারজী রাজি ছিলেন, ছিলেননা শুধু বৃটেন আর মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে ছিলেন না আমাদের পণ্ডিতজী। কাশ্মীর নিয়ে ওঁর দুর্বলতা তবু যাহক ক্ষমা করা যায় কিন্তু সামরিক বিভাগে অযথা হস্তক্ষেপ অসহ্য। শুধু তাই নয়, ক্ষমাতীত। সারা জীবন অহিংসা নীতি জোর গলায় প্রচার ক'রে আর চীনের সঙ্গে পঞ্চশীলের ছেলেখেলা ক'রে মার খাওয়ার পর উনি জেনারেল থিমায়াকে নাকি বলেছিলেন, 'যুদ্ধ জিনিষটা আর আমায় শিখিও না, তোমার চেয়ে ওটা আমি ভালোই জানি।' কথাটা হয়ত অতিরঞ্জন ঠিকই কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা-কাটাকাটির পরই যে জেনারেল থিমায়া কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন এটা স্বীকৃত ইতিহাস!

রুকায়া চুপ করে দাঁড়িয়েছিল এক কোণে। বললে: 'আজ আর দুঃখ ক'রে লাভ কি! বিপদ যখন মাথার ওপর তখন সে কথা ভাবাই ভালো। আড়াইটে বাজল। চল।'

গেট খুলে বেরিয়ে আসতেই ড্রাইভার সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা

খুলে দিল আর হাতের কম্বলটা আমাদের গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে বলল :

'সাহেব এটা দিয়ে গেছেন গায়ে দেওয়ার জন্যে।'

অবাক মানলাম। যে মানুষটা এক মাথা বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রাণটাকে পায়ের তলায় দুমড়ে নিয়ে সে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে এই ছোট্ট জিনিষটা ভোলেনি এটা যেন অবিশ্বাস্য মনে হল। অথচ এটা সত্যি। যে মানুষটা আঠারো বছর ধ'রে কেবল মানুষ মেরেছে আর না হয় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে তার মনটা যে এতোখানি মমতাময় হ'তে পরে এ যেন আমার কল্পনারও বাইরে। চাঁদটা আবার চোখ মেলেছে; আকালিক কুয়াসার একটা আস্তরণও পড়েছে সারা সহর জুড়ে। পথের আলোগুলো ম্লান, হেডলাইটের বাইরে পথটা নিঃশব্দে হারানো, দুধারের বাড়িগুলো নিঃস্বতার হাহাকারে নিমগ্ন। আমি ভাবনার মধ্যে ডুবলাম, ও আমার কাঁধে মাথা রেখে আর হাতখানা মুঠোর মধ্যে ধ'রে অকাতরে ঘুমোলো।

বাড়ির গেট থেকে বরাবর সিঁড়ি উঠতে হয় ছ সাতখানা, তারপরই বাগান। দুধারে গোলাপের ঝাড় আর পপলার সারির মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা। মিনিটখানেক হাঁটার পর ঝর্ণা ব'য়ে গেছে, তার ওপর কাঠের সাঁকো। সেইটা পেরিয়ে গিয়ে আবার দুটো সিঁড়ি উঠলে তবে বারান্দা। চৌকিদার বারান্দার এক কোণে ব'সে ঝিমোচ্ছিল, রুকায়ার ডাকে উঠে দাঁড়াল, মস্ত সেলাম ঠুকে। রুকায়া তাকে হুকুম দিল, চায়ের জল বসিয়ে চ'লে যেতে।

'এতো রাত্রে চা?' হেসে বললাম, 'বিলেতের কথা মনে পড়েছে।'

উইকার চেয়ারে বসতে বসতে রুকায়া বললে :

'শোনা যাক।'

আমি আর বসলাম না, বারান্দার কোনে কাঠের থামটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম, বললাম :

'ওখনকার মাটীতে পা দিয়েই আলাপ হ'য়েছিল এক মহিলার সঙ্গে। তখন আমি পুরোপুরি বেকার আর ও দেশে আনকোরো নতুন। মহিলাটি আমায় তাঁর গাড়িতে নিয়ে ঘুরতে থাকেন যখন যেখানে ইচ্ছে। প্রথম দুদিন আলাপের পরই উনি আমার চেহারার গুনগান আরম্ভ করলেন আর তৃতীয় দিনই ব'লে বসলেন আই লাভ ইউ! কথাটা শুনতে মন্দ লাগল না কিন্তু আমার কাছে ঐ কথাটার মূল্য অনেক ব'লে হেসেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলাম।'

'তারপর?'

'পরদিন গেলাম অক্সফোর্ড বেড়াতে, খেলাম টেমস্ নদীর ধারে ছোট্ট রেস্তোরাঁয়, বিকেলে দেখলাম থিয়েটার আর ডিনার খেলাম দিশী হোটেলে। বাড়ি ফেরার পথে অন্ধকার এক রাস্তায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে উনি আমায় জড়িয়ে ধ'রে বললেন 'ডার্লিং আই ওয়ান্ট ইউ!' ওয়ান্ট তো বুঝি কিন্তু এই প্রশস্ত রাজপথে? রবিঠাকুর আউড়ে দিলাম 'এক কানের কথা পাঁচ কানে গেলে মূল্য হারায়।' মেয়েটি বললে, ঠিক। ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি ভারতের সন্তান, সংস্কৃতি তোমাদের মজ্জায় মজ্জায়! ভাবলাম বাঁচা গেল। মেয়েটি নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে বললে, এসো কফি খাবে! বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত থাকলাম, সবই হল কিন্তু কফি আর এলোনা! নেমে এসে মেয়েটিকে বললাম, সবই হল কিন্তু কফিটাই আমার খাওয়া হল না। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'চল তাহ'লে, আবার যাওয়া যাক্!'

কথার ফাঁকে এক সময় রুকায়া চেয়ার থেকে উঠে এসেছে আমার কাছে; দাঁড়িয়েছে আমার কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে আর আমার হাতখানা ধ'রে। বাঁ হাতটা আমার ছিল থামের ওপর ভর দেওয়া। ঘড়ি দেখে বললাম :

'তিনটে।'

'কেন যাবে এতো রাত্তে' রুকায়া বললে, 'আজ তুমি এখানেই থেকে যাও।'

'না।'

'কেন?' ও বললে, 'কি হয়?'

'অনেক কারণ আছে।'

'একটা বল।

'বলরাজ। বিপদের খবর ও নিশ্চয় পেয়েছে। না গেলে ভাববে।'

'গেলে, আমি ভাবব।'

'ভয় নেই কিছু। আসবার সময় দেখলাম সহরটা জনশূন্য। আধ ঘণ্টায় কত আর বদলাবে?'

রুকায়া আমার দিকে চাইল মুখ তুলে, বললে:

'অনেক। সারা জীবন।' থেমে বলল 'আমায় দেখে, বুঝতে পারোনা? কাল সকালে ছিলাম রুক্ষ, জীবনের ওপর গভীরতম বিতৃষ্ণায় জর্জরিত। বিকেলে ছিলাম আশঙ্কা আর আকাঙ্খায় অধৈর্য্য, রাত্রে ছিলাম পথ হারা পথিকের মতন উদ্‌ভ্রান্ত, বিরাট এক আশার কুহকে অস্থির। আজ সারাদিন ছিলাম কিশোরী বালিকার মতন চঞ্চল আর সারা সন্ধ্যা ছিলাম অক্লান্ত অপেক্ষায় আত্মহারা।'

আমি ওকে ছোট্ট ক'রে প্রশ্ন করি:

'আর এখন?'

'মায়ের গর্ভে সন্তানের মতন সম্পূর্ণ।'

'তাহ'লে কেন থাকতে বলছ আমায়?'

রুকায়া শুধু বললো,

'যেওনা।'

ওকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে বলি:

'না চেয়ে পাওয়া আর চেয়ে নেওয়া কি এক জিনিষ? যা

পেয়েছ, সেটা ছিল পরিকীর্ণ প্রকৃতির কোলে মুক্ত মনের আনন্দ। যা চাইছ সেটা হবে সমাজের কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া অভিসার।' থেমে আবার বলি, 'তাছাড়া আমার দিকেরও একটা কথা আছে।'

'কি ?'

'যখন কামালকে জানতাম না, তখন আমি ছিলাম স্বাধীন। আমার কাছে তখন আমার চেয়ে বড় কেউ ছিলই না। আমায় বন্ধু ব'লে ডেকে আর তোমার কাছে রেখে, আমার সে স্বাধীনতাও নিয়ে গেছে।'

অবাক হ'য়ে ও চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হাতখানা ছেড়ে আর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে :

'চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কখ্‌খনো না।'

'কেন ?'

'জানই তো দেশের অবস্থা।'

'সেই জন্যেই তো যেতে চাই।'

আমি হেসে বলি, 'সেই জন্যেই তো আমি চাই না।'

'জেদ ?'

আমি বললাম, 'না 'হুকুম।'

ও হেসে বলল :

'কামালও কখন করেনা।'

'আমি কামাল নই।'

তখন ও আমার বুকের ওপর ভেঙে পড়ে বলল :

'তুমি কে ? তুমি কে ? তুমি কে ?

বাড়ি ফিরলাম ভোরবেলা। দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকে দেখলাম টেবিল ভর্ত্তি খাবার আর টেবিলে মাথা দিয়ে ভাইয়াজী

ঘুমিয়ে আছেন। লোকটার ওপর মায়া হল। ওঁর চেয়ে বেশী হল নিজের ওপর। জীবনে আমি সব পেয়েও আমার আসল পাওয়া আজও হলনা। জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ভোরের আলোয় আকাশটা রুকায়ার মনের মতন ঘন ঘন রং বদলাচ্ছে। তখনই শুনলাম প্রথম গুলির আওয়াজ ; এয়ারপোর্টের দিক থেকে আসছে।

॥ তেরো ॥

চোউঠা সারাদিন

ঘুমোবার আগে অনেক ভেবেছিলাম রুকায়ার কথা বলরাজকে কি বলব, কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনি। কিছুই বলতে হল না, ও বুঝে নিয়েছিল ঠিকই, না হ'লে কালকের কথা জিজ্ঞেস না ক'রে ও সোজাসুজি কাশ্মীরের কথাটা পাড়ত না। ওরই কাছে জানা গেল, যে শ্রীনগরে কার্ফু জারি হয়ে গেছে বিকেল চারটে থেকে সকাল আটটা। এটা রেডিওর সংবাদ। তার মানে বেরোন যাবে কিন্তু বেড়ানো যাবে না। মনটা বিগড়ে গেল। গভীর অবচেতনায় নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল আজও ভেসে যাই এদিক ওদিক যেখানে হয়। তাই যদি না থাকবে তাহ'লে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতে বসব কেন শ্রীনগরের কাছাকাছি অথচ লোকালয়ের থেকে দূরে রুকায়াকে নিয়ে যাওয়ার মতন জায়গা কি কি আছে?

চায়ের টেবিলে ব'সে পাকিস্তানি চক্রান্তের কথা আলোচনা করা গেল। ভাইয়াজী কানে কম শোনেন ঠিকই কিন্তু শুনেছেন অনেক কথা। ওঁরই কাছ থেকে জানা গেল, যে এই হাজার হাজার হানাদার আসবার মূল কারণ কেবল পাকিস্তান একলা নয়, কাশ্মীরেরও কিছু লোক আছে, তাদের সবার মাথা হ'লেন দুজন— বক্‌সি গুলাম মহম্মদ আর শেখ আবদুল্লাহ। আরও যাঁরা যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন বক্‌সি সাহেবের শালাবাবু।

একে একে ধরতে গেলে সবার আগে হলেন শেখ আবদুল্লাহ আজও কেউ সঠিকভাবে জানেনা ওঁকে অমন হঠাৎ ছাড়া হল কেন। কেউ বলেন, ওটা পণ্ডিতজীর আরও একটা বোকামির চূড়ান্ত, কেউ

বলেন, ওটা কৃষ্ণমেনন সাহেবের ষড়যন্ত্র. লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আর নন্দা সাহেবকে ফাঁদে ফেলবার প্রচেষ্টা। কাশ্মীরিরা বলেন ওটা বক্‌সি সাহেবের বদমাইসি। লোকে বলে উনি যখন দেখলেন যে ভারতের পয়সায় ওঁর গুষ্টির পকেট এতো ভরেছে যে রাখবার আর জায়গা নেই আর সেই নিয়ে গণ্ডগোলের সীমাও নেই তখন তাক্ বুঝে ঐ বোমাটি ছাড়লেন। উনি ঠিকই জানতেন যে শেখ সাহেবকে ছাড়লেই উনি স্বাধীনতার ধুয়ো তুলবেন আর সেই ঝড়ে লোকে টাকা হজমের কথাটা ভুলে যাবে। ভুলে ঠিক না গেলেও লোকে ভাববার অবকাশ পাবে না। হলও তাই। এ বিষয় সাদেক সাহেবের প্রচুর আপত্তি ছিল কিন্তু বক্‌সির ছিল ভারতীয় সরকারী মহলে অগাধ প্রতিপত্তি। ওঁর আপত্তি তাই ধোপে টিকল না এবং একদিন মহাসমারোহে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন লক্ষ লক্ষ লোকের কাঁধে চেপে। কাশ্মীরে সেইদিনই হল ভারত বিরোধী দলের প্রথম সদম্ভ আত্মপ্রকাশ। কিন্তু ছাড়া যখন হ'য়েছে তখন উপায় নেই। মীর কাসেম সাহেব মন্ত্রীপদ ছেড়ে চলে গেলেন গ্রামে গ্রামে—শেখ আবদুল্লাহর উসকানির বিরুদ্ধে ঘর সামলাতে। ওঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে মাস ছয়েক পর দেখা গেল শেখ সাহেবের সাধারণ মিটিংয়ে আর লোক হয় না। তিনি মাঠ ছেড়ে ঢুকলেন মসজিদে আর আরম্ভ হল প্রতি শুক্রবার নমাজের আগে তাঁর স্বাধীনতার বাণী প্রচার।

এই সময় কাশ্মীর সরকার একবার উঠে প'ড়ে লেগে গেলেন ওঁকে বন্দী করার ব্যবস্থায়—অপরাধ রাজদ্রোহ। ভারত সরকার আবার বাধ সাধলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ধরা চলবে না, নজর রাখো। ওঁকে আবার ধরলে পাকিস্তান চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে বিশ্ব মাথায় করবে। বাধ্য হ'য়ে কাশ্মীর সরকার চুপ ক'রে গেলেন আর কাশ্মীরবাসী ওঁর কথা শুনতে লাগল। হিটলারের একটা উপদেশ ছিল, মিথ্যে কথাকে যদি সত্যি ব'লে চালাতে চাও তাহ'লে

সেটা বাড়িয়ে বল, বড় গলায় বল। শেখ সাহেবও তাই আরম্ভ করলেন। বক্‌সি সাহেবের যত কুকীর্তি উনি সব চালিয়ে দিলেন ভারত সরকারের নামে আর কাশ্মীর সরকারের বদনামে। যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝল কিন্তু জনসাধারণ কবে কোন জিনিষটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রেছে? কাশ্মীরের লোক বলতে আরম্ভ করল, তাইতো! তাহ'লে?

হিটলারের কথা যেমন সত্যি, ফ্রয়েডের কথাও তেমনি কম সত্যি নয়। ফ্রয়েড বলেছেন, মন যদি ময়লা হয় তাহ'লে মুখের কথায় একদিন না একদিন তা প্রকাশ হ'তে বাধ্য। হলও তাই। এমনি ধারা এক মসজিদের মিটিংয়ে শেখ আবদুল্লাহ মহা সমারোহে ঘোষণা করলেন এলজিয়ার্সে যা ঘটেছে, কাশ্মীরেও তা একদিন ঘটবেই অর্থাৎ গোরিলায় দেশ ছেয়ে যাবে আর শাসনতন্ত্রের পতন ঘটবে। আর আসবে পাকিস্তানি। এটা আজ নয়, অনেক আগেকার কথা—ওঁর বিদেশ যাওয়ার ঠিক আগে। কাশ্মীর সরকার আবার বললেন, এইই ধরার অপূর্ব সুযোগ। ভারত সরকার ধরলেন তো নাইই উল্টে বড় রকমের 'ফরেন এক্সেচেঞ্জ' দিয়ে দিলেন হজ করতে যাওয়ার জন্যে। ওঁর পাসপোর্টের ব্যাপারটাও রীতিমত হাস্যকর। আমরা যখন দরখাস্ত করি পাসপোর্টের জন্যে আর তাতে যদি ভুল থাকে একটা ছোট্ট কমার, তো ছুটে বেড়াতে হয় ছ'মাস। ওঁর পাসপোর্টের আবেদনে জন্মস্থানের জায়গায় উনি লিখলেন 'স্বাধীন কাশ্মীর।' পাসপোর্ট কেরানী শেখ সাহেবের এই বিচিত্র 'স্বাধীনতা' মানতে রাজি হয়নি এবং আবেদন পত্রটি ফেরৎ দেয় ফলে শেখ সাহেব 'চাই না তাহ'লে' বলে হাত গুটিয়ে নিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী মহলে যেন বাজ পড়ল। কেরানীটির চাকরি কোন মতে বাঁচল আর শেখ সাহেবের পাসপোর্ট তাঁকে লোক মারফৎ কাশ্মীরে পৌঁছে দেওয়া হল।।

শেখ সাহেবের হজ যাত্রা আর আমাদের তারিণী খুড়োর মা মরা এক জিনিস। তারিণী ছিল আমার এক কেরাণী। সে একবার 'মা মরেছেন' শ্রাদ্ধ করতে হবে বলে ছুটি নিল। বছর তিন চার পরে তার আবার মা মরলো এবং আবার শ্রাদ্ধের জন্য দরখাস্ত এলো। খোঁজ ক'রে জানা গেল যে প্রথমবার তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মরেছিল আর দ্বিতীয়বার সে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিল। শেখ সাহেব হজের নামে হাজির হ'য়ে গেলেন এদিকে পাকিস্তান আর ওদিকে এলজিয়ার্স। এটা তাঁর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল কারণ ষড়যন্ত্র সবটা চিঠিতে বা লোক মারফৎ হয় না। এখানে ব'লে রাখা ভালো এবং দরকার যে সাদেকসাহেব এই পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতেন না।

শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে ছিলেন আফজল বেগ। শেখ না হয় কোরাণ আউড়ে বক্তৃতা করেন বলে হজের দাবী করতে পারেন কিন্তু আফজল বেগ? মন্ত্রী থাকাকালীন বেশ জোর গলায় বলতেন আমি 'কম্যুনিষ্ট', ধর্ম মানিনা। হঠাৎ তাঁর ধর্ম্মভাব হল কেন আর ভারতই বা তাঁকে যাওয়ার জন্যে পাসপোর্ট দিলো কেন? কেউ কেউ জোর গলায় বলেন, পাসপোর্ট দপ্তর পনেরো হাজার টাকা ঘুঁষ খেয়েছিল! দপ্তরের কর্তা এ বিষয় কি বলেন আমার ঠিক জানা নেই।

ঠিক যাওয়ার আগে যে লোকটা 'কাশ্মীরে এলজিয়ার্সের অবস্থা হবে' বলে শাসিয়ে যায় এবং গিয়েই যে লোকটা পাকিস্তানি হুকুমৎ, আর চীনের চাউ এন লাই-র সঙ্গে দেখা করে এবং যে লোকটা এলজিয়ার্স ঘুরে দেশে ফেরার অল্পদিনের মধ্যেই কাশ্মীরে এতো বড় একটা কাণ্ড ঘটে যায়, সে লোকটা আর যাই হক, ঠিক নির্দোষ নয়। আরও একটা তাজ্জব ব্যাপার হল, যে লোকটা কাশ্মীরের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এতো উৎসাহী সে কাশ্মীরের এতো বড় বিপদে একটা কথা বলেনি, পাকিস্তানের

বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তো দূরের কথা। আজ উনি বন্দী আছেন। কবে দেখা যাবে ভারতের দুর্মতি হ'য়েছে আর উনি মুক্তি পেয়েছেন!

ওঁর পরই হলেন বক্‌সি গুলাম মহম্মদ। ছোট্ট ক'রে বলতে গেলে, হকিষ্টিক হাতে বাস স্ট্যাণ্ডে লোক ডাকার পরই উনি ছিলেন খাদি ভাণ্ডারের কেরাণী। ১৯৩৯ সালে যখন শেখ আবদুল্লাহ মুসলীম কনফারেন্স নাম বদলে ওটা করলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স আর সাদেক সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়া কাশ্মীরের পরিকল্পনা পেশ করার জন্যে মিটিং ডাকলেন তখন আবার হকিষ্টিক হাতে বক্‌সি হ'লেন ভলেণ্টিয়ারদের নেতা। সেই থেকে উনি ছিলেন শেখের যাকে বলে বডিগার্ড। ১৯৪৬এ যখন 'কুইট কাশ্মীর' আন্দোলন হল তখন শেখের সঙ্গে উনিও গেলেন জেলে আর জেল থেকে বেরিয়েই হ'য়ে বসলেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর কাজ হল—মনে হয় মন্ত্রণা দেওয়া। উনি নাম করলেন যন্ত্রণা দেওয়ায়। পিটিয়ে কাকে সোজা করতে হবে—ডাকো বক্‌সি সাহেব, মেরে কাউকে ঠাণ্ডা করতে হবে, ডাকো বকসি সাহেব—এইটাই ছিল ওঁর রেওয়াজ। ওঁর সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

গুণ্ডামিতে ওঁর পাকা হাত দেখে সবাই বললে, পুলিশে যা। কথাটা মন্দ নয়, মনে ধরল। উনি চাকরির দরখাস্ত ক'রে ইণ্টারভ্যু পেলেন। মহারাজের মন্ত্রী কাক সাহেবের খাঁটি বিলেতি শালা তখন ওখানকার পুলিশ সাহেব। তিনি ইংরেজিতে দু'চারটে প্রশ্ন করলেন, বক্‌সি সাহেব মাথা নাড়লেন, জবাব দিলেন না। তখন সাহেব হিন্দিতে শেষ প্রশ্ন করলেন, বাপু হে, ঠিক ক'রে বল দেখি তুমি কি পারো? বাপু সাহেব রাজকীয় ইংরেজিতে বললেন, 'থ্রি ডে আই বিট, ইউ বিকাম মাই শালা!'

এ হেন বক্‌সি সাহেব হলেন উপপ্রধান মন্ত্রী আর ডাকাবুকো মানুষ ব'লেই বোধহয় উনি হ'য়ে উঠলেন পণ্ডিত নেহেরুর পেয়ারের

লোক। এখনও অনেকের মত যে পণ্ডিত নেহেরু যদি ওঁকে আমল না দিতেন তাহ'লে ওঁর এবং সেই সঙ্গে কাশ্মীরের আজকের দুরবস্থা হত না। কথাটা বোধহয় ঠিক। সাতচল্লিশে আমি যখন কাশ্মীরে ছিলাম তখন উনি ছিলেন অন্য মানুষ। বহুদিন আমরা কাশ্মীরের গ্রামে গ্রামে একসঙ্গে ঘুরেছি, উঠেছি ব'সেছি, কখন একথা মনে হয়নি যে উনি টাকার কাঙাল হ'য়ে উঠবেন। আজও কথাটা আমার বিশ্বাস করতে মন চায় না।

শেখ আবদুল্লা ধরা পড়ার পর উনি হ'লেন প্রধানমন্ত্রী আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল ওঁর পতন। পাওয়ার এলো আর এলো পয়সার লোভ। আমাদের কংগ্রেস মন্ত্রীমহলে এ বিষয় উনি একক নন। মাদ্রাজ ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই টাকা-বানানো মন্ত্রী বহু হয়েছেন, আছেন এবং থাকবেন। দুঃখের কথা যে ওঁকে নাকি হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া সত্বেও পণ্ডিতজী ওঁকে কথাটি বলেন নি। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন!

টাকা-বানানোর পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। ভারত সরকার টাকা দিতেন যাতে কাশ্মীরে চাল বিক্রি হয় ছ'আনা সের। হতও তাই, কেবল কাগজ কলমে। কেনা দাম পড়ত, চার আনা সের, ভারত সরকারকে হিসেব দেওয়া হত আট আনা সের। আর বাজারে চাল বিক্রি হত আট আনা সের (রসিদ চাইলে লেখা হত ছ'আনা সের)। অর্থাৎ ভাই সাহেবরা সের প্রতি ভারত সরকারের কাছ থেকে পেতেন চার আনা আর মার্কেট থেকে পেতেন চার আনা। এ ছাড়াও ছিল চিনির ব্যবসা আর ছিল কেরোসিন তেলের ব্যবসা। কাশ্মীরের জন্যে যে সব চিনি আর তেল যেত, শ্রীনগরের বাজারে তা ঠিকমত পাওয়া গেলেও আর কোথাও কখন পাওয়া যেত না, কারণ বেশীটাই চ'লে যেত আজাদ কাশ্মীরে!

সে যাওয়ার পথ করা হ'য়েছিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, মনের

মতন ঠিকাদার রেখে। সারা কাশ্মীর ভর্তি জঙ্গল। বাছা বাছা জায়গায় নিজের পছন্দমত ঠিকাদার রাখা হ'য়েছিল বাছা বাছা প্রো-পাকিস্তানি আর ইচ্ছে মত তাদের দেওয়া হ'য়েছিল লরীর পারমিট। এই নিয়েই সাদেক সাহেবের সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয় সে কথা আগেই শুনিয়েছি : শোনা যায়, বাইশজন বড় ঠিকাদরের সাতাত্তরটা লরীতে কাঠ আসত আর লরী বোঝাই ক'রে আজাদ কাশ্মীরের জন্যে চাল যেত, চিনি যেত, কেরোসিন যেত। এই যাওয়া আসার ব্যাপারে কর্ম-কর্তা ছিলেন শালাবাবু এবং ভাইসাহেব আর মেরুদণ্ড ছিলেন কয়েকজন নাম করা মাড়োয়ারি বংশের ছেলেরা—যারা ঐসব জিনিষ চালান দিত কাশ্মীরে। বোঝাই যাচ্ছে, এই মাড়োয়ারিরা বিরল ব্যবসাদার। লয়ালও শুনেছি।

সবাই বলে রাজ্যভার ছেড়ে সাহেব যখন ব্যবসায় মন দিলেন আর বিশেষ ক'রে ঠিকাদার নিযুক্ত করার ব্যাপারে হ'য়ে উঠলেন হিটলার তখন সাদেক সাহেব গেলেন দিল্লী আর ফিরে এলেন ভদ্রভাবে'বিতাড়িত' হ'য়ে। শেখ আবদুল্লাহর পর নিজে প্রধান-মন্ত্রী না হ'য়ে উনি প্রথম ভুল করেছিলেন। এবার দ্বিতীয় ভুল করলেন সেই অভিমানে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে। উনিই ছিলেন অরাজকতার একমাত্র প্রতিবন্ধক। ওঁর মন্ত্রীত্ব ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহেব হাতে চাঁদ পেলেন আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। লাখপতি দেখতে দেখতে হয়ে উঠলেন ক্রোড়পতি।

সত্যিই ক্রোড়পতি। একটি নাবালিকাকে প্রথমে ক্রোড়ে বসিয়ে এবং ন' মাস পরে তার পতি হ'য়ে। সেই মেয়েটি শুনেছি এক বড় অফিসারের সুন্দরী কন্যা। ওঁর মা একজন কৃতি মহিলা। শোনা যায় যে স্বামী মারা যাওয়ার পর উনি প্রথমদিন কাঁদার সময়েই পরবর্তী কোপমারার ঘাড়টা ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে কেঁদে। নিজে কোপ মেরে এবং মেয়েদের দিয়ে

কোপ মারিয়ে তাঁর দিন কাটছিল এক রকম মন্দ নয়। এমন সময় তাঁর ভাগ্যাকাশে উদয় হ'লেন বড় সাহেব বাসের পারামট নিয়ে। কথায় বলে, পকেটে উটকো টাকা থাকলে চোখটা যায় উটতি ছুঁড়ির দিকে। সাহেবের প্রথম নজর গেল পড়তি নারীর দিকে। বাসের পারমিট দিয়ে উনি বসবাসের পারমিশন পেয়ে গেলেন।

দিন যত যায় মায়ের আশা তত বাড়তে থাকে। কিন্তু বাসের পারমিট আর লরীর লাইসেন্সে যখন তাঁর আঁচল ভরল, তখন হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আঁচলের টানটা কমেছে। সাহেব যাই যাই করছেন। উনি মেয়েকে এগিয়ে দিলেন পথ আটকাবার কাজে এবং মাস তিনেক পরে বার ক'রে দিলেন হুলিয়া—হয় বিয়ে কর, আর না হয় খেসারত দাও, কন্যা সন্তানসম্ভবা। বড় সাহেব বাধ্য হ'য়ে বিয়ে করলেন।

নামে কামরাজ হ'লে কি হবে লোকটা একেবারে অ-কংগ্রেসী আর ব্রহ্মচারী। কাশ্মীর কাহিনী শুনে উনি গেলেন ক্ষেপে। মোরারজী দেশাই, বিজু পট্টনায়েক প্রমুখ কিছু লোক ইতিমধ্যেই ওঁর প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছিলেন—এবার তাঁদের সঙ্গে জুটলেন বক্‌সি। হল কামরাজ প্ল্যান। বক্‌সি সাহেব ইতিমধ্যে পণ্ডিতজীকে ম্যানেজ করলেও কামরাজের সঙ্গে ঠিক পেরে ওঠেন নি—তাই প্ল্যানের কথা শুনে ভাবলেন কামরাজকে জয় করার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। উনি মাথা নেড়ে বললেন, 'আহা সাহেব কি প্ল্যানই ক'রেছেন। আমিও যে একজন আদর্শ কংগ্রেস কর্মী এবং দেশের সেবক, এইবার তার প্রমাণ দেব—এই নিন্ আমার রেজিগনেশন্।' কামরাজ বললেন, 'সে কি ক'রে হয়? তুমি তো এখনও চার আনার সভ্যও নও!' বক্‌সি সাহেব তক্ষুণি চার আনা দিয়ে মেম্বার হ'য়ে গেলেন। কামরাজ জানতেন, মেম্বার না হ'লে রেজিগনেশন পত্র যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে, কারণ ঐ প্ল্যানটা ছিল কংগ্রেস কর্মীর প্রতি প্রযোজ্য। বক্‌সি

সাহেব খুশী হ'য়ে কাশ্মীর ফিরলেন আর কামরাজ খুশী হ'য়ে কানে তুলো দিলেন।

বক্‌সি ভেবেছিলেন ওঁকে ছাড়া কাশ্মীর চলবে না, অতএব কামরাজ প্ল্যানটা ওঁর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সাতদিন পরও যখন দিল্লী থেকে কোন উচ্চবাচ্য হল না ঐ নিয়ে তখন বক্‌সি সাহেবের টনক নড়ল। কামরাজ কানে তুলো দিয়েছেন, কথাটি বললেন না। বাধ্য হ'য়ে নতুন প্রধান মন্ত্রীর সন্ধান আরম্ভ হল এবং শালাবাবু হ'য়ে দাঁড়ালেন প্রার্থী। কামরাজ বললেন 'অসম্ভব'। ভারত সরকার বললেন 'সাদেক সাহেব', বক্‌সি বললেন 'অসম্ভব'। অতএব মিটমাট হল 'সামসুদ্দিন'।

মাস দুয়েক সামসুদ্দিন সানন্দে বক্‌সি সাহেবকে গুরু মানলেন। ওঁর কথায় ওঠেন বসেন। কিন্তু যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। সামসুদ্দিন উলটো সুর ধরলেন। বক্‌সি সাহেব আর পাত্তাই পাননা। শালাবাবু তখনও ন্যাশনাল কনফারেন্সের সেক্রেটারি। তিনি তো ক্ষেপেই অস্থির। আবার আরম্ভ হল ষড়যন্ত্র। কোন রকমে যদি সামসুদ্দিনকে হটানো যায় কিছু হট্টগোল ক'রে তাহ'লে বক্‌সি আবার ফিরে আসতে পারেন।

এই সময় বক্‌সি সাহেবের নিষ্ঠাবতী ধার্মিক মা ছিলেন জম্মুতে। তাঁর হল অসুখ আর ডাক্তাররা ছাড়লেন হাল। উনি আর ভালো হওয়ার নন। মারা যাওয়ার দিন দুয়েক আগে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যদি হজরতের চুলটা একবার দেখা যায়। সেটা তো রীতিমত অমূল্য। হজরতবলের মসজিদে লোক যায় সেটা দেখতে আর দেখে আল্লাহতালার দুয়া কুড়োতে। মাসে একদিন সেটা বড় মোল্লাহ সাহেব কোলে ক'রে নিয়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ান আর নিচের মাঠে হাজার হাজার লোক—হিন্দু মুসলমান, শিখ সব হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। এতো বড় পবিত্র জিনিষ কাশ্মীরে আর নেই।

বক্‌সি সাহেব মাতৃভক্ত ছেলে, লোক পাঠালেন কাশ্মীরে—আনো হজরতের চুল, মা দেখবেন। চুল এলো জম্মু। আনলেন শালাবাবু। মা চুলটা মন ভ'রে দেখে চোখ বুঝলেন। শালা ভগ্নীপতি চুলটা দেখে চোখ টিপলেন। মাসখানেক পরে একদিন সংবাদ র'টে গেল, হজরতের চুল চুরি!

শুধু শ্রীনগর নয় সারা ভারতে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। হাজারে হাজারে নয়, লাখে লাখে লোক এলো দুদিনের মধ্যে। শাসনতন্ত্র হার মেনে হাল ছাড়ল। প্ল্যান ছিল দু ফেরতা—হিন্দুর নামে অপবাদ দিয়ে সামসুদ্দিনকে অকর্মণ্য প্রমাণ করা হবে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। প্রথম যেদিন 'মাতম' শুরু হল সারা শ্রীনগর জুড়ে সেদিন দেখা গেল, শুধু মুসলমানই নয়, সঙ্গে আছে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, সব। আরও একটা খবর বাতাসে রটল—বক্‌সি সাহেবের মার অসুখের সময় ওটা গিয়েছিল জম্মু তারপর আর কেউ ওটা দেখেনি। ব্যস্‌ জনতা ক্ষেপেই অস্থির। বক্‌সি ব্রাদার্সের যত সম্পত্তি সব পুড়তে আরম্ভ হল। এদিক থেকে সারা ভারতের সেরা বুদ্ধি ওখানে গিয়ে হাজির আর সাতদিনের মধ্যে হজরতের চুল পাওয়া গেল মসজিদের বাগানে।

এখন প্রশ্ন হল, কে নিয়েছিল? কে বের করল ওটা? আর কেইই বা রাখল ওটা বাগানে? লালবাহাদুর শাস্ত্রী গিয়ে বললেন, আমরা জানি কে নিয়েছিল। তারপর যদি বলতেন, 'কিন্তু বলব না' তাহ'লে অন্য কথা ছিল। উনি জোর গলায় বলে বসলেন, 'বলব, দিন পনের পর যখন সব মিটে যাবে।' উনি আজও তাঁর সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেননি বলে কাশ্মীরিদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, এই চুরির ব্যাপারে ভারতের কোন বড় একজন কেউ জড়িত। প্রশ্ন হল কে? ওঁরা বলেন, এই চুরির কিছুদিন আগেই নাকি কোন একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ওখানে গিয়েছিলেন এবং বক্‌সির কাছে ছিলেন। কেন তা তিনিই জানেন। আরও একটা

গল্প শোনা যায় যে, বক্‌সি নাকি ভারতের সঙ্গে একটা রফা ক'রেছিলেন এই বিষয়। উনি নাকি ব'লেছিলেন যে কে নিয়েছে যদি বলা না হয় তাহ'লে উনি নাকি ওটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই জন্যেই নাকি কে নিয়েছিল সেটা ভারতীয় শাসনতন্ত্র কখনও প্রকাশ করেনি।

প্রকাশ না করার কারণ অবশ্যই কিছু আছে, তবে কথা দিয়ে সেটা না রাখার ফলে ভারতের সুনাম যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং বহু নির্দলীয় কাশ্মীরি ভারতের ওপর আস্থা হারিয়ে আজ পাকিস্তানের দিকে পাল্লা ভারি করেছে। বক্‌সি আজও কাশ্মীরে বর্তমান এবং বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি বহু অর্থ আত্মসাৎ করার অজস্র কাহিনী আছে, কেউ কেউ বলেন, জলজ্যান্ত প্রমাণও আছে। এ কথা সবাই বলেন, অথচ ভারত কেন যে কোন উচ্চবাচ্য করে না তা কেউ বোঝে না। লোকে বলে, বিশেষ মাড়োয়ারি সম্প্রদায় ঐ ব্যাপারে জড়িত ব'লেই ভারত সরকারের এই ঢাক ঢাক গুড় গুড়। আরও শোনা যায়, এবং সেটা আরও অনেক বেশী কলঙ্কিত যে বহু স্বনামধন্য কাউল পরিবার এবং কম ক'রে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং পার্লিয়ামেন্টের বহু নামকরা সদস্যও নাকি এই ষড়যন্ত্রে সামিল আছেন। যাঁদের নাম হয়ত অকারণেই এ প্রসঙ্গে শোনা যায়, ওখানকার জনসাধারণের মুখে, তাঁদের মধ্যে আছেন বিজু পট্টনায়ক, রেড্ডি সাহেব, কে. ডি. মালব্য এবং সিনহা মেমসাহেব। আরও শোনা যায় যে, বক্‌সি সাহেব বেশ লম্বা চওড়া একটা তালিকা আর সঙ্গে কার গাঁটে কত লাখ টাকা উঠেছে তার সঠিক হিসেব দাখিল ক'রে পণ্ডিতজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবেই! কথাটা যে কতখানি সত্যি তা জানবার সম্ভাবনা একদম নেই, কারণ এসব ব্যাপারে মুখ খুলতে মনুষ্যত্ব লাগে। আমাদের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীতে সেইটাই নেই।

ভাইয়াজী চুপ করলেন। বলরাজ মাথা নিচু ক'রে চামচি দিয়ে পেয়ালার মধ্যে চায়ের পাতা ঘাঁটতে লাগল। যাদের আমরা মাথায় ক'রে রাখি তারাই আমাদের মাথা সব চেয়ে নিচু করেছেন এর চেয়ে বড় কলঙ্ক স্বাধীন ভারতে আর কিছু নেই। আমি উঠব উঠব করছি। বলরাজই তার পথ ক'রে দিল। বললে,

'বেরুবে না কি কোথাও ?'

'ভাবছি।'

ও হেসে বললে :

'না যাওয়ার মতন যদি মনের জোর থাকে তাহ'লে নাই বা গেলে !'

হাসলাম। ওর ইঙ্গিতটা বেশ স্পষ্ট। ভাইয়াজীর কথায় মনটা ভুলে ছিল। ও দুষ্টুমি ক'রে আবার সেটা দুমড়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম :

'ঘুরেই আসি।'

'কখন আসবে ?'

'এখন এগারোটা—ধর একটা।'

'ও আবার হাসল'—এবার বেশ উচ্চৈস্বরে, বললে :

'ধরলাম। না ধ'রে উপায় কি !' থেমে আবার বললে, 'তুমি যাবে জানি আর একটার আগে আসবে না তাও জানি। তবে চারটের আগে আসতেই হবে কারণ কারফ্যু !'

আমিও ছাড়বার পাত্র নই :

'অতো জোর দিয়ে কি বলা যায় ?'

ও ছেলেমানুষের মতন হেসে বললে :

'যায় যায় ! যে বয়সে মানুষ প্রেমের জন্যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, সে বয়স তোমার বহুকাল পেরিয়ে গেছে !'

শহরে পা দিয়ে দেখি গুজবের আগুন দাউ দাউ ক'রে

জলছে। দোকানপাট খোলা, স্কুল কলেজ খোলা, হাট বেশ জমে ব'সেছে তবে মুখে কারো অন্য কথা নেই—হানাদার আর হামলা। ট্যাক্সি একটাও পাওয়া গেল না আর পাট্টন থেকে খবর এসেছে যে মহীউদ্দিন পাটোয়ারির গুলি করা মৃতদেহ মসজিদে পাওয়া গেছে অতএব বাস বন্ধ। মরিয়া হ'য়ে টাঙা ধরতে গেলাম। তারা বললে, সর্বনাশ, যেতে আসতেই কারফ্যু হ'য়ে যাবে। হেঁটে গেলে ফেরার ব্যবস্থা হ'য়েই যেত কিন্তু হেঁটে? অতদূর? শরীর সায় দিলো না। বলরাজ ঠিকই বলেছে।

রুকায়ার আকর্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে রেডিও ষ্টেশনে পৌঁছোনো গেল। ওখানে আমার পুরোণো সহকর্মীরা আছে আর সহরের সংবাদও কিছু পাওয়া যাবে। গিয়ে দেখি গেটে সেপাই বসেছে আর কর্মীরা সব ব'সে পড়েছে। সহরের খবর সব ভালো কিন্তু সহরের বাইরে সবিশেষ দুরবস্থা। কাশ্মীরের কোনা কোনা থেকে সংবাদ আসছে হানাদারি হাঙ্গামায় দেশ তোলপাড়। হাজারে হাজারে লোক ঢুকেছে সারা সীমান্ত-রেখা জুড়ে আর পাহাড় পাহাড় দিয়ে চ'লে আসছে শ্রীনগরের দিকে। আমাদের সৈন্যরা সামলে উঠতে পারছে না, মিলিশিয়ার সাধ্যে কুলোচ্ছে না, গ্রাম-বাসীরা সাধ্যমত লড়ছে আর মরছে। ওখানে ব'সেই খবর পাওয়া গেল যে উটরা গ্রামে হানাদারদের হেড কোয়ার্টার হ'য়েছে—সামনের পাহাড়ে আমাদের বাইশ জন সৈন্য মারা পড়েছে, দুজন এখনও সমানে লড়ছে তবে তাদের সংবাদ ঘণ্টা চারেক পাওয়া যায়নি।

আমি থাকতে থাকতেই সংবাদ এলো, যে চোদ্দ হাজার হিন্দু যাত্রী অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন দিন দশ আগে, তাঁদের বেশীর ভাগই 'ট্যানিন' বা চন্দনবাড়ীতে আটকে আছেন। পহেল গাঁও থেকে আন্দাজ দশ মাইল দূরের এই ছোট্ট গ্রামটি সমুদ্র থেকে হাজার দশেক ফুট উঁচু আর গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে

যাওয়া নীল গঙ্গার কিনারায় অবস্থিত। যাওয়া আসা কোন সময়েই ওখানে যাত্রীদের থাকতে হয়না তাই দোকান পাটের বালাই নেই। সেখানে একসঙ্গে বারো চোদ্দ হাজার লোক আটকে থাকা মানেই অনাহার। সরকার লোক পাঠিয়েছেন খাবার সঙ্গে দিয়ে কিন্তু সেপাই পাঠানো সম্ভব নয়। ওদিকে হানাদার নেই, চট ক'রে যাওয়াও সম্ভব নয় কিন্তু যদি কোন ক্রমে ছ'দশ জনও পৌঁছে যায় বন্দুক নিয়ে তাহ'লে নীল গঙ্গা লাল হ'য়ে যাবে নিঃসন্দেহে! পাকিস্তানের পক্ষে একসঙ্গে এতো লোক কোতল্ করার মতন পুণ্য কাজ কি আর হ'তে পারে! আরও বিপদ হ'য়েছে বর্ষার প্রাবল্যে। ছ'দিন থেকে ওখানে অঝোর ধারে বর্ষা, মাঠের মাঝখানে লোক ব'সে ব'সে ভিজছে। ওখানে থাকে খুব বেশী হ'লে পঞ্চাশ ঘর লোক—সবই মুসলমান। তারা সবাই ঘর ছেড়ে দিতে রাজি কিন্তু যাত্রীরা নারাজ! মাথা খারাপ —তারা নাকি ব'লেছে—অমরনাথজী দর্শনের এতোখানি পুণ্য এইভাবে বিসর্জন দেব, ম্লেচ্ছের বাড়িতে থেকে তাও কি কখন হয় নাকি? অতএব তাঁরা মাঠে ব'সে ভিজছেন। ঐ বরফ পড়া ঠাণ্ডায় সারা দিনরাত জলে ভিজে সর্দ্দি কাশী আর জ্বরে গ্রাম ছেয়ে গেছে। ডাক্তার দরকার, সঙ্গে ওষুধ! একদিকে বারো হাজার হানাদার অন্যদিকে বারো হাজার হিন্দু। একদিকে হানাদারি অস্ত্র, অন্যদিকে হিন্দুয়ানি শাস্ত্র! সরকার মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েছেন। কোন কারণে যদি হানাদারি আঘাত ঐ তীর্থযাত্রীদের ওপর পড়ে তাহ'লে সারা ভারতে হৈ হৈ পড়ে যাবে। আবার এদিকে যদি হানাদার আটকানো না যায় তাহ'লে কাশ্মীর ডুববে। বোঝা গেল বিপদ বাড়ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। উঠে পড়লাম। বেলা তখন তিনটে বাজে।

বাড়ীর সামনে জীপ দাঁড়িয়ে। তাতে আবার ছ'জন রাইফেল-ধারী প্রহরী। বোঝা গেল রফিক সাহেব এসেছেন, সঠিক সংবাদ

পাওয়া যাবে। এক ছুট্টে উঠে গিয়ে দরজায় থমকে দাঁড়ালাম। রফিক সাহেব নন। রুকায়া।

আজ আর ঝোব্বা পরা নারী নয়, শাড়ী পরা সুন্দরী নয়, শালোওয়ার কামিজপরা কাজের মেয়ে। রুকায়ার এ রূপটা দেখা ছিল না ; দেখতে ভালোই লাগল। আমি এক মন দেখে বললাম :

'কতক্ষণ ?'

'আগে তুমি বল, কোথায় ছিলে এতোক্ষণ !'

'রেডিও দপ্তরে !' বলেই আমি বলরাজের দিকে তাকালাম। ও মুচকে মুচকে হাসছে। ওকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললাম :

'তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম কিন্তু না বাস, না ট্যাকসি আর না টাঙা !'

'ভাগ্যিস হেঁটেই রওনা দাওনি !'

বলরাজ ঠাট্টা করতে ছাড়ল না, বললে : 'দিতো, বয়সটা কিছু কম হ'লে !'

'দিতাম' আমি বললাম, একটু বেঁকিয়েই, 'বকুনির ভয় না থাকলে !' কথাটা শুনে রুকায়া যে খুশী হ'য়েছে বেশ বোঝা গেল। তাছাড়া, বলরাজ বেরিয়ে যেতেই ও বলেই ফেলল :

'যাক, আমার কথা তবু একটু ভাবো তাহ'লে। যা ভাবনা হ'য়েছিল।'

'কেন ?'

'সে কি ? শোন নি ?'

'কি ?'

'চেনারির পুলের দুধারে পাকিস্তানি হানাদারদের হামলা চলছে কাল রাত থেকে।'

'চেনারি তো অনেক দূর।'

'ওখান থেকে ওদের আক্রমণ শুরু। শ্রীনগরের কাছাকাছি হল এদিকে পট্টান, দক্ষিণে এয়ারপোর্ট থেকে বড়গাম তহশিল

পুরো। পুবে মাগাম পর্যন্ত ওরা এগিয়ে এসেছে আর নিচে, শোনা যাচ্ছে অনন্তনাগ।' মনে মনে ম্যাপটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললাম :

'সর্বনাশ! শ্রীনগর তো তাহ'লে ওদের বেড়াজালে!'

'সেই জন্তেই এসেছি', রুকায়া বললে, 'তোমাদের নিয়ে যেতে।

'তা তো হয় না!'

'কেন হয়না?—প্লিজ চল......'

আমি ওর হাতটা চেপে ধরলাম, বললাম :

'লোভ দেখিও না। জনহীন সহরের জাগরী সৌন্দর্য্য আমার জানা আছে, এক্ষুনি ইচ্ছে করবে তোমায় নিয়ে ঘুরে আসতে।'

ও আমার হাত দুটো বুকের কাছে টেনে বললে : 'চল।'

ঘরে ঢুকল বলরাজ। বললে :

'কোথায়?'

রুকায়া ধরা পড়ে লজ্জায় চুপ ক'রে গেল। জবাবটা আমিই দিলাম।

'ভাবছি এই জনাকীর্ণ ঘর ছেড়ে ঘুরে আসি জনশূন্য সহরের মাঝখান দিয়ে। যাবে?'

ও বললে :

'আমি প্রেমিকও না, পাগলও না! যেতে হয়, তোমরা যাও।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম :

'চল!'

যাওয়া হল না। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন ভাইয়াজী, একেবারে হস্তদস্ত হ'য়ে, বললেন :

'শিগ্‌গীর এসো হানাদাররা আগুন লাগিয়েছে!' বলেই আবার ছুট দিলেন। ওঁর পেছনে পেছনে ছুটে বেরিয়ে গেল, রুকায়া। বারান্দা পেরিয়ে, রান্নাঘর পেরিয়ে খোলা ছাদ পেরিয়ে, এসে দাঁড়ালাম ভাইয়াজীর ঘরে। রেডিওতে তখন সংবাদ দিচ্ছে :

'গুলমার্গ আর শ্রীনগরের ঠিক মাঝামাঝি পথে প্রায় ষাটজন হানাদার হঠাৎ পার্বত্য এলাকা থেকে নেমে এসে মাগামে উপস্থিত হয়। মাগামের পুলিশ চৌকিতে যে ছ'জন লোক ছিল তারা দু'ঘণ্টা শত্রুর সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করার পর দুজন হত আর চারজন আহত হয়। হানাদাররা তখন হাজার হাজার দশ টাকার ভারতীয় নোট ছড়িয়ে গ্রামবাসীদের কাছে আশ্রয় চায় এবং অন্ন কিনতে চায়। গ্রামবাসীরা অস্বীকৃত হয়। ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে হানাদাররা বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে এবং সারা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে ত্রিশটা ঘর পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। তার মধ্যে সাতটা ঘর হিন্দুদের এবং বাকি সব মুসলমানদের। গ্রামবাসীরা গ্রামের দখল ছাড়েননি, যুদ্ধ জারি আছে।'

মাগাম সহর নয়, বড় গ্রাম বলা চলে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কাশ্মীরের অনৈক্য সম্পদ। পূবদিকে এর পীর পঞ্জল পাহাড়, সারা বছর বরফের মুকুট মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে আর গুলমার্গের ধ্যান করে। এখানে সরকারের চেক পোষ্ট আছে, ছোট বাজার আছে আর এর পা স্পর্শ ক'রে আছে—দু সারি পপলার গাছের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসা হ্যাপি ভ্যালি রোড। এখানকার ধান আর মেয়েদের রূপ লাবণ্য কাশ্মীরের অনৈক্য ঐশ্বর্য্য। শ্রীনগর থেকে মাগাম মাত্র চোদ্দ মাইল পথ।

বাকি খবর না শুনেই রুকায়া উঠে দাঁড়ালো।

'আমি যাই।'

'ছেলে তোমার একলা আছে।'

'হ্যাঁ।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার হাতখানা ধ'রে রুকায়া বললে, 'না হ'লে যেতাম না।'

'আমিও যেতে দিতাম না।'

ও থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়ালো, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'কারণ, মাঝে মাঝে আমার খুব ইচ্ছে করে এমন কাউকে হাতের কাছে পেতে, যে আমার মুখের দিকে চেয়ে বাঁচবে, মনটাকে হাতড়ে বেড়াবে। যার জন্যে ভাবনায় আমি অস্থির হব আর বিপদের সময় প্রাণটাকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে যাবো। আমার একলা পৃথিবীতে আমি কেউ নই বলেই ইচ্ছে ক'রে কারো একটা ছোট্ট পৃথিবীতে আমি কিছু একটা হই।'

রুকায়া আমার সার্টটা ধ'রে নিজেকে সামলালো। তারপর বললে,

'একটা কথা দাও।'

'কি ?'

'তুমি বেরোবে না কোথাও।'

'না।'

আমার ছোট্ট কথার ওপর ও ঠোঁটের প্রকাণ্ড শীলমোহর এঁটে দিয়ে নেমে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, এতো কাছে যখন কোন মানুষ আসে আমার জীবনে তখন তার যাওয়াটাও সুনিশ্চিত। ওর মেয়াদ কতদিন ?

॥ চোদ্দ ॥

পাঁচ আর ছয়

চার তারিখের রাত থেকেই এমন গুজবের ঝড় শুরু হল যে মনে হল কাশ্মীর তো গেছেই, ওদিকে বোধহয় কেপ কমোরিণ পর্যন্ত ভারতও গেছে। কারফ্যু আরম্ভ হ'লে কি হবে, লোক আসা যাওয়ার বিরাম নেই। বললেই বলে, ব'য়ে গেছে। রাত আটটার সময় কালা ভাইয়াজীও কানে মাফলার জড়িয়ে রওনা দিলেন। উস্‌কানি দিল বুড়ো চাকর বাজার ঘুরে এসে। সে বিচক্ষণের মতন মাথা নেড়ে বললে, কারফ্যু তো আছে ঠিকই কিন্তু সহরে সেটা মোতায়েন করার মতন পুলিশ কৈ? রাত্রে হিসেব ক'রে দেখা গেল নিয়মবাদী হিরো আর ভীরু আমি ছাড়া সবাই কারফ্যু দেখে আর কাশ্মীরের খবর জেনে এসেছে। আমি জোর করলে বলরাজ বোধহয় রাজি হত কিন্তু যাওয়ার সময় যে অধর আদরে রুকায়া আমায় যেতে বারণ ক'রে গেছে তারপর যাওয়া মানে নিজের কাছে নিজেই ছোট হ'য়ে যাওয়া।

ভাইয়াজীর কাছে ওঁর খেয়ালখুশী মতন খবর শোনার পর যখন শুতে গেলাম, রাত তখন প্রায় বারোটা। এয়ারপোর্ট অঞ্চলে গুলির আওয়াজ সারাদিনই থেকে থেকে শুনেছি কিন্তু রাত্রে সেটা কমে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই মনে হল ভাইয়াজীর খবরটা তাহলে ঠিকই। উনি সংবাদ এনেছিলেন যে, আর সব জায়গা ছেড়ে সরকার ঐ এলাকাটা কামানের চিরুনি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছেন কারণ মাঝরাত থেকে সৈন্য নামবে এয়াপোর্টে। অবাক মানলাম। যে দেশটা আঠারো বছর ধরে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বিরোধ-কেন্দ্র সে দেশটাকে সেই শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে

শেষকালে প্লেনে ক'রে সৈন্য আনতে হল শেষ মুহূর্তে? এ যেন ক্যানসার রোগের কোন রকম চিকিৎসা না করে শেষ সময়ে ভগবানের কাছে করুণা ভিক্ষা।

পরে রুকায়ার কাছ থেকে জানা গেল সৈন্য আসেনি, সারারাত ধ'রে এসেছিল আর্মড পুলিশ সারা ভারতবর্ষ থেকে।

পাঁচই সকালে রেডিওতে খবর পাওয়া গেল, কারফ্যুর বদলে জারি হয়েছে 'মার্শাল ল' অর্থাৎ পুরোপুরি মিলিটারি ব্যবস্থা, দেখলেই গুলি চলবে। বাজার ইত্যাদি করার জন্য সাতটা থেকে দশটা খোলা। তার আগে আর তারপর পথে বেরুলেই বিপদ। বুড়ো চাকরটা বাজার থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে জানালো পথের মোড়ে মোড়ে রাইফেল হাতে লোক দাঁড়িয়ে গেছে! হায়—রামজী, এখন কি হবে?

আমারও ঐ একই প্রশ্ন, কি হবে? মার্শাল ল' যখন জারি হ'য়েছে তখন প্লেন বন্ধ, বাস বন্ধ অর্থাৎ ইচ্ছে থাকলেও আর আমাদের শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই—যতদিন না যাতায়াতের পথ খোলে। কালা ভাইয়াজী কান খাড়া ক'রে কথা শুনছিলেন, কিছু বলেননি। হঠাৎ বলে ফেললেন:

'হয়েছে।'

'কি?'

'কেন মারশালা ল' হল!'

ওঁর থিওরিটা শোনা যাক। 'কেন?'

'ওরা নিশ্চয় খবর পেয়েছে যে হানাদার শ্রীনগরে হাজির হ'য়েছে! নইলে কারফ্যুই থাকত। কেবল পুলিশ দিয়ে সেটা মোতায়েন করার ব্যবস্থা করত। ওরা সব লোক সরিয়ে দিল বাইরের লোক আটকাবার জন্য।'

ঠিক সেই সময় সবেগে ঘরে ঢুকল, বুড়ো চাকর। সে নিচের ভাড়াটের রেডিওতে সংবাদ শুনে এসেছে পাকিস্তানি আর এক

যন্ত্রণা 'আজাদ কাশ্মীর রেডিও' থেকে। তারা নাকি সংবাদে বলেছে :

'সারা কাশ্মীরে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। শুধু শ্রীনগর নয় কাশ্মীরের প্রত্যেক অংশে স্থানীয় লোকেরা এক সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, হিন্দুস্থানী সৈন্য আড্ডা লুঠ ক'রে সব অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে শ্রীনগর রওনা হ'য়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামবাসী এই বিদ্রোহে সামিল আছেন এবং তাঁরাই আছেন বিদ্রোহীদের পুরোভাগে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে কাশ্মীর সরকার যে কারফ্যু চালু ক'রেছিলেন, শ্রীনগরের বিদ্রোহী জনতা তা অস্বীকার করায়, সরকার 'মার্শাল ল' জারি করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নিরীহ, নির্জাতিত কাশ্মীরিদের রক্তে শ্রীনগর লাল হ'য়ে গেছে। পাছে সরকারের এই কুকীর্তি ধরা পড়ে যায় তাই সব লাস ঝিলামের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

তারপরই এক বক্তা জোর গলায় সারা কাশ্মীরকে এই নবজাগরণের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সকাতর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

'ভাই সব, হিন্দুস্থানের নিষ্ঠুর জুলুম আর কাশ্মীরি কুত্তা সরকারের কামড় খেয়ে তিলে তিলে প্রতিদিন মরার চেয়ে এই গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে মৃত্যু বরণ ক'রে বেহেস্তে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।'

আর তারপরই ছিল এই সব বড় বড় কথা জোর গলায় বলার পেছনের আসল সত্যটুকু :

'কাশ্মীরের নব-জাগরিত বিদ্রোহীরা ঠিক ক'রেছেন, যে সব গ্রামবাসীরা তাঁদের এই সংগ্রামে যোগ দেবেন না, অথবা সাহায্য করবেন না তাঁদের স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে কুকুরের মতন গুলি করা হবে এবং দরকার হ'লে গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে। যাতে তাঁরা সময়মত সাবধান হ'তে

পারেন তাই এই সাবধানতার বাণী প্রচার। পাকিস্তান জিন্দাবাদ! আমরা আশা করি বারামূলায় গত নব-জাগরণের সময় যে অত্যাচারের নমুনা বিদ্রোহী কাশ্মীরিরা দিয়েছিলেন তা কুত্তা কাশ্মীরিরা আজও মনে রেখেছে। এবারকার অত্যাচার গতবারের চেয়ে কম তো হবেই না। বেশীই হবে। আল্লাহ হো আকবর!'

থেমে, বোধহয় বার কয়েক গাঁজায় দম দেওয়ার পর বক্তা আবার বলেছেন:

'আমাদের মাইক্রোফোন যদি এখন আমরা নিয়ে যেতে পারতাম শ্রীনগরের মধ্যে, তাহলে আপনারা শুনতে পেতেন লক্ষ লক্ষ নর-নারীর আকুল ক্রন্দন। তাদের কুত্তা বিল্লীর মতন গুলি ক'রে তাদের বাড়ি ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ তারা মনে প্রাণে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী। আমরা আরও সংবাদ পেয়েছি [কোথা থেকে তা ভগবানই জানেন!] যে স্থানীয় হিন্দুস্থানী সৈনিক এবং কুত্তা কাশ্মীরি পুলিশের ক্ষমতায় কুলোয়নি ব'লে সারা হিন্দুস্থান থেকে সৈন্য আনা হয়েছে এবং [ডাল] কুত্তা হিন্দুস্থান সরকার মনস্থ করেছেন যে, কাশ্মীরে প্রত্যেক নরনারীকে হত্যা ক'রে তারা হিন্দুদের এনে এনে কাশ্মীরে বসাবে। বিদ্রোহী কাশ্মীরিরা লড়ছে। ভাই সব, আপনারাও লেগে যান। প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কাশ্মীরকে বাঁচান!'

সবিশেষ বিচলিত বুড়ো চাকর কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলরাজের হাত দুটো চেপে ধ'রে বলল:

'কি হবে?'

বলরাজ কিছু অসহায় বোধ করল। ঐ লম্বা চওড়া মানুষটা পাঠানের মতন শক্ত হ'লে কি হবে, মনটা ওর মেয়েদের মতন নরম। ও জীবন-ভোর ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, অনাহারে থেকেছে,

কাঁধে কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে দরজায় দরজায় ফিরি ক'রে বেড়িয়েছে আর বম্বে সহরে স্টুডিও স্টুডিও ঘুরে এক্সট্রার কাজ ক'রেছে কিন্তু মনটাকে এখনও চোখের জলের বিরুদ্ধে বাঁধতে শেখেনি। ওঁর ঠোঁট কাঁপার বহর দেখে মনে হল বোধহয় বৃদ্ধের হাতখানা ধ'রে ও নিজেই এবার কেঁদে ফেলবে! বুড়ো আবার বললে :

'হায় রাম, কি হবে ?'

'রান্না! এবার রান্না হবে!' বলে, ওকে রান্নাঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে ভাইয়াজী বললেন, 'বেকুফ! যুদ্ধ হচ্ছে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে আর কাঁদছেন উনি! হানাদারদের হাতে মরবার আগে দেখছি আমাদের না খেয়েই মরতে হবে!' বৃদ্ধ চাকরের পেছনে পেছনে রান্নাঘরে ঢুকলেন আর আমরা সোফায় পা তুলে ব'সে রেডিও শোনায় মন দিলাম।

যুদ্ধের সময় খবর শোনার অদ্ভুত এক মজা আছে। অভিজ্ঞতা আছে ব'লে জানি সব খবর থাকেনা। সাধারণতঃ পরাজয়ের খবর কমানো থাকে আর বিজয়ের ঘোষণা একটু বড় গলায় বলা হয়। প্রথমটা পলিসি, দ্বিতীয়টা যে সংবাদ পড়ে তার সাধারণ অনুভূতি। খবর যা শুনলাম তা কানে যা শোনালো তার সঙ্গে মনে যা গেল, তার অনেক তফাৎ। বোঝা গেল [এবং পরে জানা গিয়েছিল] যে আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় নাহ'লেও, আশাপ্রদ নয়। হানাদাররা এক জোট হ'য়ে আর কোথাও লড়ছে না, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অত্যন্ত সুচতুর গোরিলার মতন গোপন আক্রমণ চালাচ্ছে। ওদের প্রবল ও প্রধান আক্রমণ হল সৈন্য গতিবিধি বন্ধ করার প্রচেষ্টায় যত সব ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া আর একমাত্র লক্ষ্য হল শ্রীনগর! যে খবরটা সত্যিই ভাল লাগলো, সেটা হল বড়গামের বিষয় :

'আমাদের আর্মড পুলিশ হানাদারদের হটিয়ে নিয়ে গেছে একেবারে বড়গাম তহশিলের শেষ প্রান্তে এবং ওদের কোণঠাসা

করেছে উটরা গ্রামের পাহাড়ে। ঐখানকার গ্রামবাসীরাও ওদের সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।'

[পরে জানা গেল, ঐ গ্রামবাসীদের অনন্যসাধারণ সাহসের কথা। যখন সামনের পাহাড়ে আমাদের সৈন্য ঘাঁটিতে হানাদাররা প্রায় গিয়ে পড়েছে এবং যে দুজন সৈন্য তখনও প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল তারা নিহত হয় আর কি, তখন এ পাহাড় থেকে চিৎকার ক'রে গ্রামবাসীরা বলতে থাকে যে, ওধার থেকে ভারতীয় সৈন্য আসছে! তাই শুনে হানাদাররা আবার উটরা গ্রামের পাহাড়ে সদলবলে ফিরে আসে—ফলে ও পাহাড়ে আমাদের দুজন সৈন্য বেঁচে যায় আর ইতিমধ্যে আরও আমাদের সৈন্য এসে পড়ে। এই মিথ্যা কলরব করার জন্য উটরা গ্রামের ছজনকে হানাদাররা গুলি ক'রে মারে।

এ পাহাড় আর ও পাহাড়ে যখন আবার নতুন ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন গ্রামবাসীরা রাত্রের অন্ধকারে দড়িতে পাথর বেঁধে পাথরগুলো ভারতীয় সৈন্য মারার অজুহাতে নিচে গড়িয়ে দেয় আর নিচে থেকে ভারতীয় সৈন্য সেই দড়িতে বন্দুক গুলি ইত্যাদি বেঁধে দিলে, ওরা দড়ি টেনে টেনে সেগুলো ওপরে তুলে নেয়। এইভাবে তিন রাত গুলি বারুদ আর বন্দুক তোলার পর গ্রামবাসীরা হানাদারদের আক্রমণ করে এবং সেই অবসরে আমাদের ভারতীয় সৈন্য ওপরে উঠে যায় আর হানাদারদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। এই সংগ্রাম চলে সাতদিন এবং হানাদার ধরা পড়ে সাতাশ জন। গ্রামবাসীরা মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় মৃত্যু দিয়ে। ধৃত হানাদারদের হত্যা করা ভারতীয় নীতি বিরুদ্ধ বলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে এই নিয়ে বেশ খানিকটা গণ্ডগোল হয়।]

বাকি সব খবরই মন খারাপ ক'রে দিল। মাগামে হানাদাররা যে ত্রিশটা বাড়িতে আগুন দিয়েছিল—এখন জানা গেল তাতে লোক মারা গেছে প্রায় একশো জন। তার মধ্যে প্রায় আশী

জনকে মারা হ'য়েছে পুড়িয়ে আর বাকি মারা হয় গুলি ক'রে যেহেতু তারা মুসলমান হ'য়েও হিন্দুদের আশ্রয় দেয়।

সরলদ্রুম জঙ্গলের মধ্যে মোগল আমলের সিদ্ধ পুরুষ বাবা পামদিনের সে মকবরা আছে গুলমার্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে কিছু হিন্দু সেখানে আশ্রয় নেয়। ঐ পাহাড়ে অবস্থিত হানাদাররা সে খবর পেয়ে মকবরায় যায় তাদের মারবার জন্যে। আশ্রিত হিন্দুদের আর্তনাদে আকৃষ্ট হ'য়ে অল্প দূরে ফকিরদের যে আড্ডা আছে সেখান থেকে ফকিররা ছুটে আসে এবং গুলির সামনে বুক পেতে দেয়। আমাদের আর্মড পুলিশ যখন সেখানে পৌঁছোল তখন দেখা গেল তিরিশজন ফকিরের মধ্যে সতেরোজন মারা গেছেন, দশজন আহত এবং বাকি নিরুদ্দেশ। হিন্দু একজনেরও কিছু হয়নি।

খবর পাওয়া গেল যে, পট্টানের ধারে যে ব্রীজ আছে তার ওপর হানাদারদের আক্রমণ চলেছে সারাদিন কিন্তু দুপক্ষের বহু লোক মরলেও ব্রীজটাকে ওরা কিছু করতে পারেনি। বারামুলার সঙ্গে শ্রীনগরের যোগাযোগ এই ব্রীজের ওপর দিয়েই। ওদিকে চেনারি ব্রীজের ওপরও আক্রমণ থেকে থেকেই হয়েছে কখন দিনে, কখন রাতের গভীর অন্ধকারে কিন্তু সেখানে আমাদের ষোলজন পাহারাদার সাধারণ পয়েন্ট থ্রি ও থ্রি রাইফেল দিয়েই তাদের প্রায় ষাটজনকে আটকে রেখেছে। আমাদের পক্ষে লোক মারা গেছে পাঁচ জন।

আমাদের কনভয় আক্রান্ত হয়েছে অনন্তনাগের কাছে—তার মানে ওরা জম্মু কাশ্মীর যোগাযোগটাও কেটে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। ওটা যদি ওরা কোন ভাবে করতে পারে তাহ'লে ভারতের সঙ্গে যোগযোগের একমাত্র পথ থাকে আকাশ দিয়ে। পথ আটকানো তবু শক্ত কিন্তু বানিহাল টানেল যদি আটকায় তাহ'লেই অবস্থা কাহিল।

সে পথ আটকাবারও চেষ্টার কথা জানা গেল পরদিন ছ' তারিখ

সকালে [অবশ্য ফেরার পথে এলাহাবাদের আমর্ড পুলিশের হাবিলদার রামলোচন সিংয়ের কাছে আরও অনেক খবর পাওয়া গেল যা বেতারে জানান হয়নি। ওঁর সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল পুষ্কর পাহাড়ের আক্রমণের সময়—কিন্তু সে গল্প পরে।] সব চেয়ে বড় খবরের ইশারা পাওয়া গেল ছ' তারিখ সকালের খবরের শেষ অংশে। শ্রীনগরবাসীদের সাবধান ক'রে দেওয়া হল, অতিরিক্ত প্রয়োজন ছাড়া তাঁরা যেন কোন ক্রমেই বাড়ির বাইরে না যান। কারণ স্বরূপ বলা হল যে, হানাদাররা সাধারণ পোষাকে আছে। তাই জনসাধারণের সঙ্গে তারা সহজেই মিশে যেতে পারে। অতএব জনসাধারণ যেন খুব সাবধান হন এবং অচেনা মানুষকে বাড়িতে স্থান না দেন। কানে এলো ছোট্ট কথা :

'আমি স্থান চাইনা, শুধু দেখা করতে এসেছি।' ঘুরে দেখি রুকায়া আহমেদ। পরণে শালোয়ার কামিজ, মুখে মৃদু হাসি আর সারা দেহে যৌবনের উচ্ছল জোয়ার।

'তুমি?' অবাক হ'য়ে বলি, 'তোমার তো সাহস কম নয়।'

বলরাজ উঠে দাঁড়ালো, বললে, 'এমন সাহসের উপমা আছে কৃষ্ণ-লীলায়। রাধা নাকি অভিসারে যেতেন বড় বড় কাঁটা পায়ে পায়ে দলন ক'রে।'

লজ্জার বেশ কিছু লালিমা দেখা দিল রুকায়ার গালে। যে সময়টুকু ও নিল নিজেকে সামলাতে তারই মধ্যে চোখের একটা মৃদু ইশারা ক'রে বলরাজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রুকায়া বলল :

'যাবেন না, কথা আছে!'

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। অনেক।' তারপর ঢোক গিলে বললে, 'কাজের!'

বলরাজ ব'সে পড়ল। বললে :

'সুন্দরি মেয়েদের সঙ্গে আমার যত কাজের কথা তা হয় পর্দার আড়ালে নয়, ওপরে। ওটা আমার ভাগ্যের লিখন। বলুন।'

'ভেতরকার যা খবর' রুকায়া বললে, 'তাতে ভয়ের যথেষ্ঠ কারণ আছে।'

'কি রকম?'

'সরকারি মহলের একটা সন্দেহ শ্রীনগরেও কিছু গণ্ডগোল হওয়ার ইঙ্গিত আছে। আজ নয় কাল হবেই। মার্শাল ল সেইজন্যেই।'

বলরাজ বললে, 'সেটা আমাদেরও আন্দাজ।'

'তাহ'লে?'

'উপায় কি? হয় যদি হবে?'

'আপনারা আমার সঙ্গে...'

বলরাজ কথা শেষ করতে দিল না, বললে, 'তা কি ক'রে হয়?'

'কেন হয়না?'

হঠাৎ দেখি বলরাজ একেবারে অন্য মানুষ, ও বললে:

'কি ক'রে হয়? গ্রামে গ্রামে নিরীহ, নিরস্ত্র নির্বল লোক মরছে পিঁপড়ের মতন প্রতিদিন প্রতি মিনিটে—দেশের জন্যে দশের জন্যে —কৈ তারা তো পালাচ্ছে না? তারা বুক পেতে দাঁড়াচ্ছে। ভাবুন তো একবার? পাথর নিয়ে তারা যাচ্ছে আধুনিকতম মার্কিনী মারণাস্ত্রের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে! সারা পৃথিবীতে এর তুলনা আছে ব'লে আমার জানা নেই—এটা সম্ভব একমাত্র এইখানের মাটিতে। এই কাশ্মীরে। আজ যদি আমি পালাই কাল আমি ঐ দীন দরিদ্র অভুক্ত মানুষগুলোর সামনে দাঁড়াব কোন মুখ নিয়ে?'

রুকায়া মাথা নিচু করল।

বলরাজ বলে চলে, 'আজ এই যে ওরা শূন্য হাতে আর পূর্ণ প্রাণে বুক পেতে দাঁড়াচ্ছে আর হাসতে হাসতে মরছে, কাদের

জন্যে? এটা কার খামখেয়ালের খেলা? ভেবেছে কেউ কখন? আপনার আমার মতন হীন স্বার্থপর মানুষদের পাপের বোঝা ওরা বইছে! আমরা এই দেশটা নিয়ে জুয়া খেলছি আজ আঠারো বছর। যখন পেলাম তখন মাটির ছেলে ঐ মকবুল শেরওয়ানিদের জন্যে পেলাম আর তারপর কি করলাম? পঞ্চশীলের নিশান উড়িয়ে চলে গেলাম শান্তি আর মৈত্রীর বাণী শোনাতে সারা পৃথিবীকে আর এই সব দুর্ভাগাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে গেলাম একদল হীন, নীচ, পাষণ্ড মানুষের হাতে—যারা দিল্লীতে দরবার ক'রে লাখপতি হল আর কাশ্মীরিদের জন্যে পাঠানো চালের টাকায় কোটিপতি হল।....যারা বাসের পারমিটে মেয়ে মানুষ নিয়ে মাতলামো করল আর মাড়োয়ারিদের মাথায় তুললো। দোষ শেখ আবদুল্লাহর নয়, বক্সি গুলাম মহম্মদেরও নয়, দোষ ঐ দিল্লীর বাদশাহদের যারা সাদা টুপি মাথায় দিয়ে সাধু সাজে আর কালো বাজারে ক্ষমতার নেশা করে। যারা দেশের দীন দরিদ্রদের লাথি মারে আর সাদা চামড়ার পা চাটে।....দোষ আপনার, আমার, যারা ওদের সহ্য করি ঐ সব চামারদের!' গভীর উত্তেজনার অতর্কিত অবসাদে ও চুপ ক'রে যায় এক পলক। তারপর ঘুরে বলে:

'মাঝে মাঝে আমার কি ইচ্ছে করে জানেন? একবার শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে ঐ সবকটা পাষণ্ডকে চুলের মুঠি ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দি একসঙ্গে একটা হানাদারের সামনে—তবে যদি বোঝে যে ওদের আসল মূল্য কি! এই আঠারো বছর ধরে আমরা যতখানি সৎ বলে নিজেদের প্রচার করেছি ততখানি সাহস নিয়ে যদি এ দেশটাকে সামলাতাম তাহ'লে ঐ গ্রামের লোকগুলো আজ অমনি ক'রে পিঁপড়ের মতন মরত না। শুধু পাকিস্তান কেন, সারা পৃথিবী এক সঙ্গে আক্রমণ করেও আমাদের কিছু করতে পারত না!'

তারপর মিনতির সুরে ওর হাত দুটো ধরে বলল:

'দোহাই আপনার, আজ আর আমায় পালাতে বলবেন না।

তার চেয়ে আসুন আমরা সবাই গিয়ে দাঁড়াই ঐ সব সত্যিকার মানুষগুলোর পাশে যারা দুশ্চরিত্র দেশ-নেতাদের পাপের বোঝা মাথায় ক'রে মৃত্যু বরণ করছে....যাদের আমরা বলি অশিক্ষিত গ্রামের চাষা ··ওদের রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্ত মিশিয়ে, চলুন আমরা ধন্য হই।'

ও আর দাঁড়ায় না; রাগে অপমানে দুঃখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রুকায়ার চোখেও দেখি তখন জলের যেন বন্যা নেমেছে। কোন কথা না ব'লে রুকায়া সামনের সোফায় ব'সে পড়ল আর হাতলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভেবেই পেলাম না আমার চোখে জল এলোনা কেন? আমার মনটা কি মরে গেছে, না এই নোংরা সভ্যতায় থেকে থেকে আমিও নিঃশেষে হারিয়ে গেছি? হয়ত বা এতো দেখেছি আর এতো শুনেছি ঐ সব বড় বড় মাথাওয়ালাদের কুকীর্তি যে ওদের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিষপান ক'রে নীলকণ্ঠই হ'য়ে গেছি। মনে পড়ে গেল লাট মন্ত্রণা সভার নামকরা সভ্য সুলতান আহ্‌মেদের সোনাগাছিতে রাত্রিবাসের কথা, দেশবরেণ্য রাম মনোহর লোহিয়ার ট্রেন জার্নির কথা, বাংলা দেশের দেশবরেণ্য নেতা আর মন্ত্রীমহলের অন্য সদস্যের শুক্তুনি খাওয়ার কথা, স্কুলে টিফিন সরবরাহের কন্ট্রাক্ট দেওয়ার গল্প। মনে পড়ে গেল বলরাজের কাছ থেকে শোনা ওর ওয়ার্দ্ধা আশ্রমের জঘন্য অভিজ্ঞতার কথা, বিলেতে থাকা কালীন কৃষ্ণমেননের কথা, উড়িষ্যায় মনোরমা কালচারাল অফিসারের চাকরি পাওয়ার কাহিনী। আর মনে পড়ল এই বাংলা দেশেরই এক মহিলা মন্ত্রীর···যাকগে সে সব কথা, ভাবতেও ঘেন্নায় আমার মতন নিতান্ত একটা রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষেরও গা ঘিন ঘিন ক'রে ওঠে। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি সাধুপুরুষ এমন ধৃষ্টতা আমার নেই কিন্তু ওদের কুকীর্তির তুলনায় আমি মহাপুরুষ একথা জোর গলায় বলতেও আমার বাধা নেই। ওরা দেশের দায় আর

দায়িত্ব মাথায় নিয়ে গোটা দেশটাকে পথে বসিয়েছে। আমি দেশের কথা একবার একটুখানি ভেবেছিলাম ব'লে চাকরি ছেড়ে পথে নেমেছি। আমি যদি সাধারণ মানুষ হই ওরা অসাধারণ অমানুষ।

রুকায়া উঠে দাঁড়াল; চোখ দুটো ওর লাল টক্‌টকে। কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কাছে থেমে গেল; ঘুরে বললে:

'কাল তুমি আমার মুখ চেয়ে কথা দিয়েছিলে বাইরে যাবে না। তোমার সে প্রতিজ্ঞা থেকে আমি তোমায় মুক্তি দিলাম।'

'কেন?'

বলরাজের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে রুকায়া বললে:

'ঐ মানুষটাকে কখন একলা ছেড়ো না।'

রুকায়া চ'লে গেল আর কিছু বললো না। রেডিওতে তখন মেহজুরের লেখা একটা গান গাইছে কেউ একজন। দুটো লাইন কানে এলো:

"রাউন ছু লাবুন য়াম বুজুম রাম সরতুম দিল
অদ নার গুনওনম্ খোফছে লঙ্কাই ওয়ানেই ক্যা।"

[যখন আমি জানতে পারলাম যে রাবণকে আমায় জয় করতে হবে তখন মনটা আমার রামের মতন শক্ত হ'য়ে গেল, আর জীবনের যত ভয় ভ্রান্তি সব লঙ্কার মতন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।]

॥ পনেরো ॥

সাত সারাদিন

বৃটিশ-ভারতের অক্ষয় কীর্তি, সাম্প্রদায়িক ভাঙন নীতির দৌলতে কারফ্যুর অভিজ্ঞতা আমার অনেক, কিন্তু 'মার্শাল ল'র দৌরাত্ম জীবনে এই প্রথম। প্রথম দিন থেকেই ওটা প্রকাণ্ড একটা প্রশ্নচিহ্নের মতন মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। কাল থেকে একটা বিশ্রী রকম অধৈর্য্য উৎকণ্ঠা এসে যোগ দিয়েছে, বিশেষ করে রেডিওতে অকারণ বাইরে না যাওয়ার সতর্কবাণী শোনার পর থেকে। সেটা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল, অজানা মানুষকে বাড়িতে স্থান না দেওয়ার জরুরী ঘোষণার পর। এতদিন সকলেরই মুখে সারাদিন ছিল গুজবের ঝড় আর বিপদের আলোচনা। হঠাৎ সেটা থেমে গিয়ে নেমে এলো বিভৎস একটা মৃত্যুর আতঙ্ক।

বিপদ যত বড়ই হক না কেন সামনা-সামনি তার চেহারা তবু এক রকম। প্রাণ বাঁচানোর প্রকৃতি মানুষের এমনই প্রবল যে, হয় সে পালিয়ে বাঁচে আর না হয় সে মরে বাঁচে। বিপদের আশঙ্কাটা অন্য রকম। ভয় থাকে ভাবনা থাকে কিন্তু মনটাকে তৈরি ক'রে নেওয়ার একটা চেষ্টাও থাকে। কিন্তু সেই আশঙ্কা সম্বন্ধে ঘন ঘন সতর্কবাণী দিয়ে মনটাকে যখন সচেতন ক'রে দেওয়া হয় তখনই হয় আসল ক্ষতি। ওটা আর আশঙ্কা থাকে না, হ'য়ে ওঠে একটা বিভৎস আতঙ্ক। তখন অতীতের যত ভুল ভ্রান্তি, বর্তমানের যত মৃত্যুভয় আর ভবিষ্যতের একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা সব এক সঙ্গে জঞ্জালের মতন জড়িয়ে মানুষকে করে জড় পদার্থ আর মনটাকে শুকনো চামড়ার মতন দুমড়ে কুঁচকে করে

একাকার। যুদ্ধটা তখন আর দু'দলের সংঘর্ষ থাকে না, হ'য়ে ওঠে অবধারিত মৃত্যুর একটা অতল গহ্বর, জীবনের শেষ, আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি। ভাবনা যখন কল্পনার জালে জড়িয়ে বাঁচবার এতটুকু পথও পায়না তখন হঠাৎ এক সময় মনটা মৃত্যুর মধ্যে একটা সার্থকতা খুঁজতে আরম্ভ করে। তখন মনে হয় ওটা আমার দেশভক্তির শোভাযাত্রা, আদর্শের একটা পূর্তি, জীবনের একটা সুন্দর এবং পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি। ব্যক্তিগতভাবে সব দুঃখ বেদনা থেকে পরিত্রাণ।

এইসব নানান ভাবনার মাঝে মাঝে, উৎকণ্ঠা আর অধৈর্য্য আতঙ্কে ছোট ছোট কথায় রাগ হয়, ছোটখাটো ব্যাপারে বিরক্তি আসে, আবার তারই মধ্যে কিছু একটার সূত্র ধ'রে সারা জীবনের ব্যাপ্তিতে শেষ মুহূর্তটা ভাবতে বসি, কিম্বা ঐ বিভৎস পরিসমাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অতীতটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে চেষ্টা করি, আমার থাকায় অথবা না থাকায় কার কতখানি লাভ, কতটুকু ক্ষতি। সোফায় বসি, বারান্দায় যাই, জানলায় দাঁড়াই, বোধহয় দেখবার চেষ্টা যে বিপদটা আর কতদূর, কিন্তু কোথাও মনের স্থিরতা পাই না, ভাবনার অবসাদ আসে, আরামটা যেন হারাম হ'য়ে ওঠে। ছোট্ট শব্দ, এতটুকু কারো উঁচু গলায় কথা, কিম্বা হয়ত, অনেক দূরে কোন কুকুরের চিৎকারে মনটা হঠাৎ চমকে ওঠে, আর কল্পনাটা ভীতির কালো ঘোড়া হ'য়ে বেসামাল ছুটতে ছুটতে যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সেটা আবার সেই, অনেক আগেই বহুবার ভাবা, মৃত্যুর গহ্বর।

রান্নাঘরে অকারণ জল খেতে গিয়ে দেখি, ডালের হাঁড়ি টগবগিয়ে ফুটছে আর বুড়ো চাকরটা গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। সামনের বারান্দা পেরিয়েই ভাইয়াজীর ঘর। ভাবলাম, দূর ছাই, ভেবে আর কি হবে, তার চেয়ে ওঁর ঘরে রেডিও শোনা যাক। ভাইয়াজী দেখি সারা গালে সাবান লাগিয়ে ক্ষুর

হাতে জানলায় দাঁড়িয়ে। ঘুরে বললেন, 'মানে, দেখছিলাম'। আবার ফিরে আসি বাইরের ঘরে। বলরাজ বসে আছে সোফায় আর বহুদিনের পুরোনো, বহুবার পড়া কাগজখানা নতুন ক'রে উল্টে যাচ্ছে। আমি আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়াই ভয়ে দিশাহারা, ভাবনায় অস্থির। বলরাজ বললে, ইচ্ছে করছে এক ছুটে গিয়ে দেখে আসি বিপদ কোথায়, কতখানি, কখন। ও কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করতে থাকে আর আমি হঠাৎ এক সময় বিছানায় শুয়ে পড়ি, একটুখানি আরামের জন্যে, একটুখানি নিশ্চিন্তে ভাববার জন্যে।

কি হবে? পারব না ঐ সহজ গ্রামবাসীদের মতন সামনে ছুটে যেতে? ওদের মতন উত্তাল আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়তে? মৃত্যু? সে তো আছেই একদিন, না হয় আজই হল। মনে পড়ল, বহুকাল আগে দিল্লীতে গুলি ক'রে কুকুর মারা হত। কুকুর? কি যেন মেয়েটার নাম? ঐ যে ষ্টারের নাটকে কুকুর কোলে নিয়ে ন্যাকান্যাকা কথা বলে···জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না বিশ্বাস। চমৎকার লেগেছিল ওর অভিনয়। ছবিতে করে না? ও হ্যাঁ, তৃষ্ণা···ভালো হয়নি ছবিটা। কার যেন ছবি?···অসিত সেন। চলাচল··· সিগারেট ধরাই, জমিয়ে ভাবতে হবে। জীবনের ওটা একটা জঘন্য পরিচ্ছেদ। পোড়া কাঠিটা কোথায় পড়ল, কে জানে। কাঠের বাড়ি, বলরাজ খুব রাগ করে। হ্যাঁ, অসিত। আঙুল ধ'রে গুণতে থাকি। বসন্ত, অসিত,···সত্যি মানুষ রাতারাতি কত বদলে যায়। কিসের মোহ? যারা দু মুঠো অন্নের জন্য দেহের বেসাতি করে প্রকাশ্যভাবে, তাদের আমরা বলি বেশ্যা। যারা কালোবাজারি টাকা ভল্টে রেখে আর বড় হোটেলের দরজায় ডু নট ডিসটার্ব—এর নোটিশ ঝোলায় কিম্বা স্বামীর বিছানায় স্বামীর বন্ধুকে শুইয়ে বলে, ভালোবাসি—তাদের কি বলে?···দেবী···আচ্ছা, মদ খেয়ে যারা বৌকে মারধোর করে, তাদের আমরা বলি অসভ্য। ইতর। যারা কারণ থাকলেও করে না?···তারা কি কাপুরুষ?

আমি কাপুরুষ নই। দর্শনের দোহাই দিয়ে আর আদর্শের অঙ্ক কষে নিজেকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমি ভীতু নই, ভয় পাবো না। হানাদাররা যদি হামলা করেই তো ঝাঁপিয়ে পড়ব। বলরাজ ঠিক কথাই বলেছে। ওরাই সত্যিকার মানুষ, ঐ গ্রামের চাষীরা। কিন্তু পাড়ার আর সবাই যদি ভয়ে পালাতে আরম্ভ করে? তারা তো বলরাজের কথা শোনেনি? নানান রকম যুক্তি দিয়ে মনটাকে বোঝাতে চেষ্টা করি কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। ভাবনার বোঝা কিছুতেই আর কমে না। কমেই না। হাতে সিগারেটটা জ্বলছে। তারই আগুনের ওপর চোখ রেখে চুপ ক'রে আবার প্রথম থেকে ভাবতে আরম্ভ করি।...

তখনই প্রথম গুলির আওয়াজ শুনলাম।

ভোর তখন সাড়ে চারটা।

একটা গুলির আওয়াজে এতখানি কলরব আরম্ভ হবে ভাবিনি। সমস্ত পাড়াটা যেন একসঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার ক'রে উঠল। প্রত্যেক বাড়ির প্রতিটি মানুষ যেন আমারই মতন অধৈর্য্য আশঙ্কায় ঐ গুলির আওয়াজেরই অপেক্ষায় ছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে জানলায় গিয়ে দেখি সব বাড়ির দরজা জানলা ঝপ ঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিপদটাকে ওরা বুঝি ঐ ভাবেই জীবনের বাইরে রাখবে। বুড়ো চাকর, ভাইয়াজী, বলরাজ সব এসে দাঁড়ালো।

গোলা-গুলির শব্দ তখন আকাশ ভ'রে ফেলেছে।

নিচে থেকে ভাড়াটে ভদ্রলোক লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে ছুটে এলেন পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে, 'কি হবে? এবার কি হবে? কি ক'রে পালাবো? কোথায় পালাবো? কিছু একটা করা যায় না?'

চারিদিক থেকে ঐ একই চিৎকার। বলরাজ চুপ ক'রে রইল।

ভদ্রলোক দিশাহারা হ'য়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। ভাইয়াজী আর থাকতে না পেরে সজোরে তাঁর গালে চড় বসিয়ে দিলেন। উনি বিছানায় ব'সে পড়ে বললেন, 'মেরে ফেল, তোমরা আমায় মেরে ফেল, শুধু দয়া ক'রে ওদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও! আমার যা টাকা আছে সব নিয়ে আমায় বাঁচাও।'

বাইরে তখন চিৎকার উঠেছে গোলা-গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে :

'আল্লাহ হো আকবর!'

পাল্টা জবাব আসছে আরও জোরে, সদীপ্ত হুঙ্কার :

'কাশের জিন্দাবাদ'

'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ্!'

ঘুরে দেখলাম বলরাজ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ভাইয়াজী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। নিচের ভদ্রলোক ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদছেন নিঃশব্দে। চিৎকার করার সাহসটাও যেন আর নেই। উনি নিঃশব্দেই নিচে নেমে গেলেন। অস্পষ্ট স্বরে বলরাজ বলল :

'আরম্ভ হল তাহ'লে।'

'হ্যাঁ।'

ঘুরে দাঁড়ালাম জানলার দিকে পেছন ক'রে। আর আতঙ্ক নেই ভাবনার বোঝা নেই। বলরাজ বললে :

'চল চা খাওয়া যাক।'

আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ সামনের বাড়িটাই দেখছিলাম, অন্য দিকে লক্ষ্য ছিল না। এইবার দৃষ্টি গেল। মাঠের ওপারে পপলার আর চিনার গাছগুলোর ওপর দিয়ে ধোঁওয়া দেখা গেল। বলরাজ এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

'বোধ হয় রামবাগ ব্রীজের ধারেই।'

'তবে কি ওরা বড়গাম থেকে এলো?'

হিসেব করে দেখলাম মনে মনে :

'তা যদি হয় তাহ'লে এয়ারপোর্টটা বোধ হয় গেছে।'

'নাও হ'তে পারে' বলরাজ সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'গুলমার্গ থেকে পাহাড় বেয়ে এদিকেও নামা যায়। তাছাড়া, এয়ারপোর্ট পেরিয়ে যদি ওরা আসত তাহ'লে রাত্রে গুলির আওয়াজ নিশ্চয় পেতাম।'

যুক্তিটা মনে লাগল। সারা রাত্রির অখণ্ড নীরবতার পর যখন এই আক্রমণ তখন নিশ্চয় তাইই হবে।

'তা না হ'লে' বলরাজ বলল, 'ওরা হয়ত আগেই সহরে ঢুকেছিল, যার জন্যে ঐ মার্শাল ল' আর ঐ সব জরুরী ঘোষণা।'

ভাইয়াজী ইতিমধ্যেই ডবল ডেকার কাঁচের গেলাসে রীতিমত ফুটন্ত চা নিয়ে হাজির। হেসে বললেন:

'আমি তৈরি!'

'তাই দেখছি!'

'বুঝলেন না!' ভাইয়াজী বেশ জুৎ ক'রে বললেন, 'যদি পাড়াটা অ্যাটাক্ হয় তাহ'লে লড়তে লড়তে চায়ের জন্যে মন কেমন করলে তো চলবে না।' থেমে দু চুমুক খেয়ে বললেন, 'সকালে চা না খেলে আমার কেমন যেন জুৎ হয় না—তা ও লড়াইই হক আর লোটা হাতে ছোটাই হক!'

পাড়াময় যে আতঙ্কের আর্তনাদ উঠেছিল, সেটা থেমেছে। বিপদটা আর এখন বিভীষিকা নয়, ওটা এখন সামনে; চোখে দেখা না হ'লেও মনে একটা আন্দাজ যেন সকলেরই হ'য়ে গেছে। এখন আপন আপন চিন্তাধারার বহরে ওটাকে সামলানোর জল্পনা কল্পনা।

গুলির আওয়াজ বরাবর চলছিল। ষ্টেন ব্রেন আর অটোমেটিক রাইফেল। মাঝে মাঝে চিৎকার আসছিল, হুঙ্কারে তার জবাবও আসছিল। হঠাৎ তারই এক ফাঁকে শোনা গেল লরীর শব্দ। ভাইয়াজী জানলায় ছুটে গেলেন। সামনের মাঠ-পারের রাস্তা

দিয়ে কম ক'রে খান কুড়িক লরী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর মাঠের এ পারের কাঁচা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে গেল অনেক সেপাই, বন্দুক সামনে ধরে। আমাদের বাড়ির পেছনে তিন সার বাড়ি, তারপরই কলেজ। তারই ধারে বন্যার জল বওয়া খাল। লোকগুলো সেই দিকেই গেল।

বুড়ো চাকর ঘরে ঢুকল বড় ধরণের একটা মই নিয়ে। তিন-তলার ওপর কাঠের ছাদ আর তারও ওপরে ঢালু টিন। ঐ কাঠ আর টিনের ছাদের মাঝখানের যে জায়গাটা, সেটায় সাধারণতঃ ঘর গরমের জন্যে জ্বালানি কাঠ রাখা হয়। ধারে একটা জানালাও আছে। মই বেয়ে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকে গেল। এখন দেখি ওর আর সাহসের অন্ত নেই অথচ গুজব শুনে এসে ওই সকলের আগে কেঁদে বলেছিল, এখন কি হবে! ওপর থেকেই ও চিৎকার ক'রে ডাক দিল :

'শিগগীর দেখে যান!'

যে বিপদের চেহারা দেখবার জন্যে সারারাত বিছানায় শুয়ে বসে ছটফট করেছি, এখন সেটা কাছে এবং জানা বলে আর দেখার উৎসাহ আমার তো নেইই, বলরাজেরও নেই। ভাইয়াজীতো চা খেয়ে তৈরি হচ্ছেন, হয় লড়াই আর না হয় লোটা। বলরাজ বললে :

'কি?'

'লড়াই। রামবাগ ব্রীজে।'

ভাইয়াজী বড় ধরণের চুমুকের পর চাখনা দিয়ে বললেন :

'সেইজন্যেই এতো জোর আওয়াজ!' উনি উঠে চ'লে গেলেন।

ব্রীজের ওধারে হানাদার আর এধারে আমাদের আর্মড পুলিশ আর সাহায্য করছে পাড়ার লোক। আমাদের বাড়ির পেছনে বন্যাখালের ওধারে জনা তিরিশ হানাদার আর এধারে গরীব কুলি মজুর। জানা গেল, সারারাত ধরে ওরা এসেছে ধান ক্ষেতের মধ্যে

দিয়ে একজন একজন ক'রে আর ভোর রাত্রে চেষ্টা করেছিল খাল পেরিয়ে আসবার। কলেজের চাপরাশি গিয়েছিল প্রাতঃকৃত্য সারতে, সেই প্রথম দেখে এবং তারই চিৎকারে ছুটে যায় এন. সি. সির ছেলেরা হাতের কাছে যে যা পায় তাই নিয়ে। কিছু রাইফেলও তার মধ্যে ছিল। আমাদের সামরিক বিভাগ ভাবতে পারেননি যে ওয়াজিরবাগের খাল পেরিয়ে আক্রমণ করতে পারে তাই পাহারার কোন ব্যবস্থা ওখানে ছিল না।

ছিল শুধু ব্রীজের এধারে। তার অবশ্য অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ওটা হল একটা ব্রীজ, ভাঙলে অনেক অসুবিধা; দ্বিতীয়তঃ ওটা হল শ্রীনগরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের একমাত্র যোগাযোগ, রাস্তাটা পরিষ্কার রাখতে হলে ওটায় পাহারা রাখা বিশেষ দরকার। সব চেয়ে বড় কারণ হল ব্রীজ পেরিয়ে মাইল দেড়েক গেলেই আমাদের নিউ সেক্রেটারিয়েট। ওটাকে বাঁচাবার জন্যে এটা হল, যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে, ফার্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স। এই দু'মাইল এলাকা ধরে ওদের এক সঙ্গে আক্রমণের সময় ছিল চারটে। আরম্ভটা ঠিক একই সময় হয়েছিল। কিন্তু এন. সি. সির ছেলেদের পাল্টা আক্রমণে ওরা আর খাল পেরিয়ে আসার সাহস পায়নি। ছেলেদের আরও সুবিধে হ'য়ে গেল এপারে, খালের কিনারায় পাথরের ঢিপি থাকার জন্যে। রাস্তাটা কাঁচা, ওটাকে বাঁধাবার জন্যে ঐ পাথর ফেলা হয়েছিল সপ্তাহ খানেক আগে। রাস্তাটা তৈরি হ'য়ে যাওয়ার কথা ছিল বছরখানেক আগে। কন্‌ট্রাক্টরের গাফিলতি আমাদের বাঁচিয়ে দিল। এখানে ছেলেরা ওদের আটকে রাখে ঘণ্টাখনেক, তারপর সংবাদ পেয়ে আর্মড পুলিশ আসে শ খানেক। গুলি চলেছিল সারাদিন।

ওদিকে, ব্রীজের পাহারা পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে কোন আক্রমণ হতে পারে, কারণ আগের দিনের খবর ছিল যে হানাদারদের হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বড়গামের শেষ সীমায়।

ওরা যে গুলমার্গ থেকে নেমে বন্যাখাল ধরে সোজা চ'লে আসতে পারে এই সহজ সামান্য কথাটা বলরাজের মতন অ্যাক্টরের মনে হলেও যুদ্ধ যাদের অন্ন সংস্থান তাদের কেন মনে হয়নি তা বোঝা দুষ্কর। বন্যাখালের ওপার এপার দু'পার দিয়েই হানাদাররা এসে দুদিকের পাহারা ঘাঁটির ওপর গুলি চালায়। আমাদের দুজন লোক মারা যাওয়ার পর প্রায় দুশ' গ্রামবাসী ছুটে বেরিয়ে আসে আর আরম্ভ হয় দেশের নামে আল্লাহর বিরোধীতা। সেই ডাকই আমরা শুনেছিলাম।

ওপর থেকে বুড়ো চাকর চিৎকার ক'রে বলল:

'মেশিনগান্, ওরা মেশিনগান্, চালাচ্ছে।'

'কোথায়?'

পেছনে তাকিয়ে দেখি লোটা নয়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ভাইয়াজী। পরনে ওঁর হাফপ্যান্ট, গায়ে ইয়া মোটা একটা শোয়েটার, মাথায় বাঁদুরে টুপি আর পায়ে চটি। ওঁর ঠিক পেছনে নিচের ভাড়াটে। তাঁরও পরনে হাফপ্যান্ট আর হাতে রাইফেল। এইমাত্র যে মানুষটা হাত-পা ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতন কাঁদছিল তার এই প্রস্তুতির বহর দেখে বোঝা গেল মানুষ আমরা এখনও মরিনি, দেশের মাটির মায়া আমরা এখনও ভুলিনি। আমাদের শাসনতন্ত্রের নৈতিক অবনতি আমাদের জাত মেরেছে কিন্তু মনুষ্যত্ব ভোলাতে পারেনি। প্রথম কান্নায় স্বাধীন ভারতের যত ক্লেদ সব মুছে দিয়ে সনাতন ভারতের স্বাধীন মানুষ আপন সত্তায় জেগে উঠেছে। হানাদারদের পেছনে বৃটেন আছে, আমেরিকা আছে। আমাদের পেছনে আছে সোজা মেরুদণ্ড। তাই কাশ্মীর আজও আমাদের। ওঁকে দেখে আমারও মনে হল আমি কাপুরুষ নই, আমি পুরুষ। মহাপুরুষ। ইচ্ছে হল, ওঁর বন্দুকটা নিয়ে ওঁকে বসিয়ে রেখে আমিও বেরিয়ে যাই খালের ধারে কি ব্রীজের ওপর।

দু'দলে যুদ্ধ চলল সারাদিন খালটাকে মাঝখানে রেখে। মাঝে একবার হানাদারের একটা দল ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল খাল পার হ'য়ে এখানে আর যুদ্ধ হ'য়েছিল রবীন্দ্রভবনের ওপাশে ষ্ট্যাডিয়ামের মধ্যে। সেটা আমার ঘরের জানলা দিয়ে গলা বাড়ালেই দেখা যায়। ঘণ্টা দুয়েক এ বাড়ি ও বাড়ির লোক এসে দেখে গেল। আর যখন পারা গেল না ঐ ভীড় সামলাতে তখন ভাইয়াজীই বুদ্ধি দিলেন। বললেন, ভায়া, কথায় হবেনা, তুমি কাৎ হ'য়ে সামলাও অর্থাৎ শুয়ে পড়! অসুস্থ হওয়ার ভান কর, আর প্রয়োজন মাফিক কাতরাতে আরম্ভ কর। শেষ পর্যন্ত তাইই করতে হল। তাতেও যখন লোক ঠেকানো যায়না তখন মশারিটা ফেলে দিলাম।

কাশ্মীরের মতন জায়গায় দিন দুপুরে মশারি ফেলে সুস্থ মানুষ শুয়ে আছি এর চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার কি হতে পারে তারই একটা হিসেব করছি মনে মনে। বন্ধ জানলার সার্সি ভেঙে ঝন ঝন ক'রে প'ড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মশারিটা যেন কে সজোরে দুলিয়ে দিল। উঠে দেখি দুটো বুলেট! বলরাজ এসে খাটটা সরিয়ে দিল দুই জানলার মাঝখানে, বললে, কাব্য কলকাতায় ফিরে কোরো, আর ভাইয়াজী বুলেট তুলে ব্যালে নাচ আরম্ভ করলেন। বুড়ো চাকরটা সেই যে ওপরে গিয়ে বসেছে তাকে আর নামানোই গেল না। আরও বুলেট আসার ভয় দেখিয়েও না।

সে শুধু বললে, 'রান্না তো চিরকালই করেছি, যুদ্ধটা দেখবোনা?'

সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে হানাদাররা হটে গেল; গুলিও কিছু কমে এলো। কিন্তু কতক্ষণই বা? সারাদিন পর বুড়ো চাকরটা সবে নেমেছে, আকাশ ফাটা চিৎকার এলো কিছুদূর থেকে। হঠাৎ, আচমকা। এটা মাঠের ধারে নয়, অন্য কোথাও, কিন্তু কোনখানে? জানলা দিয়ে দেখা যায়না, বাইরে যাওয়ার উপায়

নেই অথচ মনটা আনচান করছে। জানতে চাই কাদের আর্তনাদ। ভাইয়াজী রাস্তা টপকে চলে গেলেন বলরাজের শ্বশুর বাড়ি আর খবর আনলেন, এবারকার চিৎকারটা সেক্রেট্যারিয়েটের ওখান থেকে আসছে। আর, ওটা দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে।

পরে জানা গেল ওটা ছিল বাটমালুতে। সেক্রেট্যারিয়েটের পেছনে। বাটমালু মানে হল—ভাত দেওয়ার মালিক—যাকে বলে অন্নদাতা। ওখানে বহুকাল আগে এক ফকীর এসে বাস ক'রেছিলেন। সবাই তাকে বলত বাবা দাউদ। তিনি ছিলেন স্ুফি আর গুরু মানতেন নন্দ ঋষি আর লালদেদকে। নন্দ ঋষি হ'লেন শেখ্ নূরুদ্দিন আর লালদেদ ছিলেন লালেশ্বরী—আর এক মস্ত দেবী—যেমন কবীর। বাবা দাউদ ছিলেন হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়। কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই আজও তাঁকে মনে প্রাণে পূজো করে। ওঁর মারা যাওয়ার প্রায় দুশোবছর পর মহারাজার এক সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন শের আলি, তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় সব উজাড় করে দিয়ে ওখানে মসজিদ বানালেন বাবা দাউদের নাম করে। তখনই জায়গাটার নাম হল বাটমালু। আগে ছিল গাওবুক। বাবা দাউদের ঐ পাড়ায় যারা থাকে—কি হিন্দু কি মুসলমান, বছরের পনোরো দিন তারা মাছ মাংস ডিম কিছু খায় না। বাবা দাউদ নাকি বলতেন, প্রাণী হত্যা কোর না। ওটা মহাপাপ। তিনি নিজে ছিলেন শাকাহারি। সেই জন্যে বাবা দাউদের দেহাবসানের দিন ওখানে যে মেলা হয় তার এক মাস এদিক ওদিক মাছ মাংস ডিম বিক্রি হয় না আর আগে পরে পনেরো দিন সবাই নিরামিশ খায়। এই বাটমালুর নাম সারা কাশ্মীরে সকলের মুখে মুখে। ওদের কথায় বলে, নেই ভাত তো বাটমালু যা। এমনই জাগ্রত নাকি বাবা দাউদের মকবরা যে হিন্দুই হ'ক আর মুসলমান, শিখই হ'ক আর বৌদ্ধ, দেশের দিক দিক থেকে আসে সবাই বাবা দাউদের দুয়া চাইতে।

সবাই নাকি পায়ও। এখানে যে শ'চারেক বাড়ি আছে তা ছোট বড় মিলিয়ে আর সাম্প্রদায়িক বাদ বিচারও নেই। সব জাতই আছে।

ভোরবেলা যখনই ওরা শুনল, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা "আল্লাহ হো আকবর" আর "কাশের জিন্দাবাদ" অমনি ওরা এক জোট হ'য়ে মসজিদে বসল সতর্ক পাহারায়। পথে থাকবে না, কারণ সাদিকসাহেবের হুকুমে মার্শাল ল, আর সাদিকসাহেবকে ভালোবাসে বাবা দাউদের পরই। মসজিদটা ওদের পাড়ার মাঝ বরাবর। তাছাড়া ওখান থেকে সেক্রেট্যারিয়েট যাওয়ার পথের ওপর নজর চলে। সারাদিন ওরা পালা ক'রে পাহারা দিয়েছে, কিচ্ছু হয়নি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন গুলিগোলার শব্দ ক'মে এলো তখন বোধহয় সতর্কতা একটু শিথিল করেছিল। তার অল্প পরেই যখন অন্ধকারটা একটু ঘন হ'য়ে নামছে তখন ওরা লক্ষ্য করল হানাদারদের—পেছনের ক্ষেত পেরিয়ে সব দল ক'রে যাচ্ছে সেক্রেট্যারিয়েটের দিকে। প্রথমে ওরা কিছু বলেনি, কারণ সামনা সামনি যুদ্ধ করলে মশামাছির মতন ওরা মরত। হানাদাররা যখন এগিয়ে গেল তখন ওদের ব্যবস্থা মত ছাদ থেকে আরম্ভ হল গাদা বন্দুকের গুলি, ইঁট পাটকেল, যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমণ। হানাদাররা একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল বাড়ি, ছাদ, মসজিদ লক্ষ্য করে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে লড়াই চলার মধ্যে সংবাদ পেয়ে এসে পড়ল আর্মড পুলিশ। তখন আরম্ভ হল আর এক নতুন পর্যায়। হানাদাররা বাধ্য হ'য়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ লড়ল পুলিশের সঙ্গে আর অন্যভাগ বাটমালুর লোকদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত যুঝতে না পেরে ওরা লাগিয়ে দিল আগুন।

চারশো বাড়ি, কাছাকাছি, পাশাপাশি, আর সবই প্রায় কাঠের। যে দল লড়ছিল পুলিশের সঙ্গে তারা লড়তে লড়তে ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক আর যারা লড়ছিল লোকদের সঙ্গে

তারা তাক ক'রে রইল বাড়িগুলোর ওপর। লোকেরা যে আগুন নেবাবে তার পথ নেই। বাড়ির বাইরে এলেই গুলি খেয়ে মরতে হয়—আর বাড়ির মধ্যে থাকলে আগুনে পুড়ে মরতে হয়। এখন আর শুধু পাড়ার লোকদের নিজেদের বাঁচার সমস্যা নয়, সংসার বাঁচানোর সমস্যা—ছেলে মেয়ে স্ত্রী, বুড়ো মা বাপকে বাঁচানোর সমস্যা। পাকিস্তানি হানাদার কাশ্মীর নিতে এসে নিতে আরম্ভ করল কাশ্মীরবাসীর জীবন।

দেখতে দেখতে আগুনের লেলিহান শিখা উঠল আকাশ ছেয়ে, মনে হল হয়ত বা আকাশ ছাড়িয়েই যাবে। বাবা দাউদের মকবরা, শের আলির তৈরী মসজিদ আর কাশ্মীরিদের বাড়ি, সব একসঙ্গে জ্বলতে আরম্ভ করল। চারিদিকে ভীত আতঙ্কিত অসহায় শিশু আর নারীর আর্তনাদ, বাটমালু পুরুষদের জীবন সংগ্রাম, আর হানাদারদের অনবরত গুলি আর সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহ হো আকবর' চিৎকার—সব মিলিয়ে যেন শয়তানদের সরাবখানায় সতীত্বের বলি। ওদের গুলিতে মানুষ মরল, আগুনে পুড়ে মানুষ মরল, আর মরল, দেশভক্তির অপরাধে। দেশের মাটি তাদের প্রাণ ব'লে।

রাত দুটোর সময় জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সারা আকাশটা লালে লাল হ'য়ে গেছে আর সহস্র মানুষের আকুল আর্তনাদে সারা পৃথিবীটাই বোধ হয় কাঁপছে। আগুনটা যখন আর সহজে থামবার নয় তখন হানদাররা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গিয়ে মিশে গেল জনতার মধ্যে। তারা জানতো এবার আরো সৈন্য আসবে, ফায়ার ব্রিগেড আসবে আর সবাই মিলে আগুন নেভাবার কাজে মন দেবে। তখনই হবে শ্রীনগর ঢোকার সুবর্ণ সুযোগ। হলও তাই, কিন্তু সুবিধে কিছুই হল না। ওরা নিরীহ মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারল। ওরা জনতার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে পুলিশের

ওপর গুলি চালালো আর ফায়ার ব্রিগেডের ওপর ফেলল হাতবোমা।

এই একটি রাত্রে মারা গিয়েছিল প্রায় সাড়ে তিনশো লোক। তার মধ্যে হানাদার ছিল প্রায় একশো কুড়ি।

রাত ছটোয় আর একদল শ্রীনগর ঢুকবার চেষ্টা করল, পূর্বদিকে পামপোরের কাছ দিয়ে। ওখান দিয়ে আসার সোজা পথ হল সৈন্য ঘাঁটির সামনে দিয়ে। ওরা তাই ও পথটা এড়িয়ে আসবার চেষ্টা করল, খানিকটা এসে শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কারণ তলাতেই সাদিক সাহেবের বাড়ি। সেটাও ওদের পক্ষে মস্ত বড় আকর্ষণ। সেখানকার ব্রীজে যে পাহারা ছিল তা সামান্যই, কারণ ওদিক দিয়ে আসাটা অসাধ্য সাধন। তবু যখন ওরা এলো তখন ঐ পাহারা পুলিশই ওদের সামলে নিল।

আর শেষ রাত্রে আক্রমণ হল বলরাজদের বাগানের পাশ দিয়ে। ওখান দিয়ে সোজা মাইল খানেক এলেই বেতার কেন্দ্র। তার ওপর ওদের যত রাগ তত বিদ্বেষ। শেখ সাহেবের আমলে ওটা ছিল তাঁর হাতের পুতুল—যেমন নাচাতেন তেমনি নাচতো। নন্দলাল চাওলা পরিচালক হওয়ার পর থেকে সে নিজেই হাল ধরেছে মুঠো শক্ত করে। শালাবাবুকে একদিন ও নাকি ঘাড় ধরে বারই ক'রে দিয়েছিল ষ্টেশন থেকে। রাগটা তাই তাঁরও কম নয়।

বাগানের পাশ দিয়ে বন্যাখাল পেরিয়ে আর ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ওরা এসে পড়েছিল নতুন পুলের কাছ বরাবর। ওটা যে বেশ শক্ত ঘাঁটি তা হানাদাররা ভাবতে পারেনি। ওখানে যুদ্ধ হয়েছিল ঘণ্টা খানেক। এখানেও বেশ মজার খেলা খেলেছিল বারো জন পাহারা পুলিশের মধ্যে ছ'জন। যে ছ'জন পাহারায় ছিল তারা কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাবার পরই পেছিয়ে যাওয়ার ভান করে। বাকি ছ'জন ইতিমধ্যেই নদী পার হ'য়ে গিয়ে পড়েছিল হানাদারদের পেছনে। ওরা যখন বিজয়-উল্লাসে এগিয়ে

আসে তখন পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ ক'রে এদের পনেরো জনকে ঘায়েল করে আমাদের পুলিশ।

পরদিন সকাল বেলায় যখন জানলায় দাঁড়ালাম তখন নতুন সূর্য্য উঠছে। সারাদিন আর সারারাত ধ'রে চারদিক থেকে যে আক্রমণ হ'য়েছিল শ্রীনগরের ওপর, আমাদের আর্মড পুলিশ, গ্রামের লোক, এন. সি. সির ছাত্র আর বোধহয় বাবা দাউদের তুয়া তা আটকে দিয়েছে পুরোপুরি। বাটমালু অবশ্য তখনও দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে। আট তারিখ সারাদিন ধরেই পুড়েছিল —অর্থাৎ তু'দিন তু'রাত।

আট তারিখের সকালে আর তারপর সারাদিন খাল পারের ধানক্ষেত খুঁজে পাওয়া গেল বহু মুণ্ডহীন দেহ। যুদ্ধে যে সব হানাদার আহত হ'য়েছিল, পাছে তারা ধরা পড়ে আর সব ফাঁস ক'রে দেয় তাই তাদের মাথা কেটে আর হাতের উল্‌কি শুদ্ধ চামড়া কেটে নিয়ে হানাদাররা গা ঢাকা দিয়েছে। পরে জানা গেল, এইটাই ছিল তাদের বাঁধা ব্যবস্থা। হয় তারা হিন্দুস্থানী সেপাইর হাতে মরবে আর না হয় মরবে নিজেদের লোকদের হাতে। হয় মারতে হবে আর না হয় মরতে হবে। আহত হওয়া চলবে না কিছুতেই।

সাত তারিখে সারাদিন আর সারারাত যেন ছিল মৃত্যুর সঙ্গে শ্রীনগরের সপ্তপদী গমন। আমরা স্তম্ভিত আবেগে জানলায় দাঁড়িয়ে ওদের মরণের সঙ্গে লড়াই দেখেছি আর আকাশ জুড়ে দেখেছি মৃত্যুর লেলিহান শিখা। বহু দূর থেকে ভেসে আসা অসহায় জনতার আকুল আর্তনাদ আমাদের কানে এসেছে আর নিজেদের দৈন্যের অসীম বেদনা প্রাণে লেগেছে। আমরা ভারত ভাগ ক'রেছি, আমরা কাশ্মীর নিয়ে জুয়া খেলেছি। একটা লোকের একটা তুর্বলতার জন্যে এতোগুলো লোক একসঙ্গে মরল। সেই আঠারো বছর আগে ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে

সর্দার প্যাটেলের যে ঝগড়া হ'য়েছিল তার পর যদি পণ্ডিতজী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেও লাহোর যেতে না দিতেন তাহ'লে আজ এই কাণ্ড কিছুতেই হত না। সর্দারজীর কথামত পণ্ডিতজী সহজেই ওঁকে আটকাতে পারতেন। কিন্তু আটকাননি। তখনই উনি জিন্নাকে কথা দিয়ে এলেন প্লেবিসাইট হবে এবং কাশ্মীর কেসটা ইউ. এন. ওতে যাবে। ব্যস্ তারই ফলে আজ আমাদের হাজার হাজার নিরীহ নরনারী মরছে। আরও মরবে। আজ পণ্ডিতজী নেই, আছে শুধু ওঁর ভুল। আর আমরা দিচ্ছি সে ভুলের মাশুল।

আজাদ কাশ্মীর রেডিও তখন বলছে :

> 'শ্রীনগর আজ জেহাদ সৈন্যের হাতে। হিন্দুস্থানী ফৌজ তাদের ভয়ে শ্রীনগরে আসেনি। এসেছিল আর্মড পুলিশ। তাদের সবকটাকে কোতল ক'রে আজাদ ফৌজ আমাদের পতাকা উড়িয়েছে রেডিও ষ্টেশনে, নিউ সেক্রেট্যারিয়েটে আর সাদেক কুত্তার বাড়িতে। স্বাধীন শ্রীনগর আজ আনন্দে নাচছে। আল্লাহ হো আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, ভাইয়াজী রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিলেন। অবাক কাণ্ড! কি হল ভাইয়াজীর ?

'কিচ্ছু না' উনি বললেন, 'কাল সারাদিন লাঠি হাতে কেটেছে শালাদের জন্যে, লোটার কথা মনেই ছিল না। সেরে আসি।'

৯ তারিখ সকাল

আট তারিখে সকাল থেকে আর কোন সাড়া শব্দ নেই, কেবল জানলায় দাঁড়ালে রোদ ভরা আকাশেও বাটমালু আগুনের হল্‌কা দেখা যায়। আজ নিয়ে দু'রাত আর দু দিন। কাল রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝেই অন্তর মথিত আর্তনাদ দেড় মাইল দূরেও শোনা গেছে। আজ আর কোন আওয়াজ নেই, বোধ হয় সরকার ব্যবস্থা ক'রে তাদের সরিয়ে নিয়ে গেছে। মার্শাল ল' পুরোপুরি চালু অতএব লোক ঘরে বন্ধ। গুজব তো নেইই, সংবাদও স্তিমিত। যা কিছু টুকরো টাকরা আসছে, সবই রেডিও মারফৎ। শ্রীনগরের মধ্যে বা পাশে কোন হাঙ্গামা নেই, যা কিছু সব দূরে দূরে—এদিকে বড়গাম ওদিকে বারামূলা—তাও ছোটখাটো আক্রমণ, বড় এমন কিছু নয়। কোথাও ব্রীজ, কোথাও কনভয়। রেডিওতে একটা খবর পাওয়া গেল কিছু বন্দীর। তাদের জেরা ক'রে অনেক কিছু তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেল যে, গত তিনমাস ওদের স্কার্দু অঞ্চলে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যাধ্যক্ষদের অধীনে। ওদের মধ্যে আদ্দেকের বেশী হল পাকিস্তান সৈন্যের স্থায়ী জোয়ান—কেউ তিন বছর, কেউ ছ' বছর, কেউ কেউ বারো বছরও আছে। বাকি লোকদের ভর্তি করা হয়েছে ছ'মাস থেকে তিন মাস আগে—আর ওদের এমন ভাবে দল ভাগ করা হয়েছে যাতে বেশীর ভাগই জানাশোনা অথবা আত্মীয়স্বজন আছে এমন এলাকায় ঢোকে। ওদের ব্যবস্থা ছিল ২৭ জুলাই থেকে ঢুকবার আর পাঁচ তারিখের মধ্যে যে যার ঘাঁটিতে ব'সে যাবে। শ্রীনগর আক্রমণের তারিখ ছিল নয়।

বারো বছর আগে এই ন' তারিখে শেখ আবছুল্লাহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বলে তাঁর সমব্যথীরা এবং সমর্থনকারীরা ঐ দিনটা হরতালের ব্যবস্থা করেন। সারাদিন সারা সহরের দোকান পাট বন্ধ থাকে আর ছুপুর থেকে শ্রীনগরের শেষ প্রান্তে দস্তগীর সাহেবের মাঠে উরস্-এর মেলা বসে ছ' থেকে আড়াই লাখ লোকের। এই দস্তগীর সাহেবের মাঠ হল থানা ইয়ারিতে। ওদের পরিকল্পনা ছিল যে এই হরতালের সময় ওরা শ্রীনগরে ঢুকবে এবং সারা সহর যখন থাকবে মেলা নিয়ে তখন ওরা শ্রীনগরের তিনটে ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে সহরটা দখলে নেবে। ওদের বলা হ'য়েছিল এবং বোঝানো হয়েছিল যে সারা কাশ্মীর ওদের অভ্যর্থনার জন্য মালা হাতে ব'সে আছে—গলাটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে, গুলির আর দরকারই হবে না। এসে যা দেখেছে তা একেবারে বিপরীত ব্যাপার। সহযোগিতা তো পায়ই নি ওরা উলটে পেয়েছে লড়াই। খাবার ওদের সঙ্গে দেওয়া হয়নি, ওদের খাওয়ার জোগাড় করতে হয়েছে আর বেশীর ভাগ সময় না খেয়ে ওদের সামনে এগোতে হয়েছে। ওদের সঙ্গে না ছিল কোন ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা আর না ছিল কোন সাপ্লাইর ব্যবস্থা। অল্প জখমে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের ক'রে নিতে হবে আর খুব বেশী জখম হ'লে মাথাটি কেটে ধড়টি ফেলে চ'লে যাওয়া হবে। আরও ঠিক ছিল শ্রীনগর দখল করার পর সিকুযুরিটি ফোর্স আসবে উড়ো জাহাজে। তার জন্যে লোক এবং সরকারি লৌকিকতার ব্যবস্থা নাকি সব তিন তারিখ থেকেই তৈরি ছিল। ওদের দিনপঞ্জী ঠিক করাই ছিল আর আজাদ কাশ্মীর রেডিও-র কাছে তার অনুলিপি ছিল। ওয়ারলেসে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল তাই অগ্রগতিটা ঠিকই থাকবে অথবা আছে এই সংবাদটাই ওরা পেয়েছিল এবং মনের আনন্দে ঘোষণাও ক'রেছিল।

ওদের সব আন্দাজই ঠিক ছিল কেবল একটা জিনিষ ওরা ভাবতেই পারেনি—কাশ্মীরি মুসলমানদের ধর্মজ্ঞান। ধর্মটাকে

ওরা আজও মনে প্রাণে মেনে চলে বলেই নিমকহারামি কাকে বলে ঠিক জানেনা। একবার যাদের ওরা বন্ধু বলে মেনে নেয় তার জন্যে জান কবুল। এইটাই কোরাণ-শরিফের আসল শিক্ষা আর নিরক্ষর হ'লেও ওটাই ওরা মনে প্রাণে জানে। সেইজন্যেই যখন শেখ আবদুল্লাহ কোরাণ শরিফ পাঠ করার পর গান্ধীজী আর পণ্ডিতজীকে প্রকারান্তরে গালাগাল দিতেন তখন সাধারণ কাশ্মীরি থুথু দিত। সেইজন্যেই খোলা ময়দানে তাঁর স্বাধীনতার মর্ম প্রচার বন্ধ ক'রে শেখ আবদুল্লাহকে মসজিদে আশ্রয় নিতে হ'য়েছিল। আবার এই একই কারণে চিরকালের হিন্দুস্থানবিরোধী মাসুদী আর মহীউদ্দিন কারা হজরতের চুল চুরি যাওয়ার সময় হিন্দুস্থানের সপক্ষে শোকযাত্রার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আর শালাবাবু যখন 'চুলটা আসল নয়' বলে আন্দোলন আরম্ভ ক'রেছিলেন তখন এরাই এসে শপথ ক'রে ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত ক'রেছিলেন। ধর্ম এঁদের কাছে জীবনের মূল্য আর সত্যের সাধনা, রাজনীতির ধাপ্পাবাজি নয়, পৈশাচিকতার হুঙ্কারও নয়। বরঞ্চ কাশ্মীরি হিন্দুদের সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক মানুষ ব'লে থাকে। একটা প্রবাদ আছে, সাতটা সাপ মরলে তবে একটা কাশ্মীরি হিন্দু হয় আর সাতটা কাশ্মীরি হিন্দু মরলে তবে একটা কাশ্মীরি পণ্ডিত হয়। এই কথার সূত্র ধ'রেই বলরাজ আরও একটু বিষদভাবে জানতে চাইল, পণ্ডিতজী আর সর্দার প্যাটেলের মনোমালিন্যের কথা।

ওটা আমাদের জাতীয় কলঙ্কের লম্বা ইতিহাস, ভাবতেই আমার খারাপ লাগে, তবু বলতে হয়।

মাউন্টব্যাটেনের সংবাদ বিভাগের কর্তা অ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসনের মতে—

(১) '৪৭এর 'জুনে কাশ্মীর যাওয়ার সময় থেকেই লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে বুঝিয়ে ছিলেন এবং নিজের সমস্ত আধিপত্যের জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, অ্যাকশেসনের আগে

মহারাজা যেন যে ক'রে হ'ক, রেফারেণ্ডাম, নির্বাচন অথবা প্লেবিসাইট ক'রে জেনে নেন তাঁর প্রজাদের ইচ্ছে।'

(১) 'যখন মহারাজার কাছ থেকে সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ এলো তখন মাউন্টব্যাটেন বললেন যে, সৈন্য পাঠানো বোকামোর চূড়ান্ত হবে। তবুও যখন ভারত সরকার জোর করলেন তখন উনি বললেন, যে অ্যাকশেসন্ আমরা স্বীকার ক'রে নেব কিন্তু সর্ত থাকবে যে পরে জনমত সরকারি ভাবে জানা হ'লে তবে অ্যাকশেসন পুরোপুরি কার্যকরী হবে।…এই নীতি পণ্ডিত নেহেরু সর্বতোভাবে স্বীকার ক'রে নেন এবং তিনি নিজেই এটা সরকারি ভাবে প্রস্তাব করেন।'

এরপর দিনপঞ্জীতে বোঝানো সুবিধা :

২৯-এ অক্টোবর ১৯৪৭

মাউন্টব্যাটন গেলেন সকাল বেলায় পণ্ডিতজীর বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে সর্দার প্যাটেল ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং খোলাখুলি ভাবে সব কথা আলাপালোচনা হল। প্যাটেলজী স্পষ্ট জানালেন যে, তাঁর এবং মন্ত্রীমণ্ডলির অন্যান্য সভ্যদের মতে ৩১-এ অক্টোবর লাহোরে যে যৌথ ডিফেন্স কমিটির মিটিং আছে তাতে পণ্ডিতজী কিম্বা মাউন্টব্যাটেন কারওরই যাওয়া উচিৎ নয়। মাউন্টব্যাটেন বললেন, যাওয়া অবশ্যই উচিত, না গেলে সৌজন্যহানি হবে। সর্দারজী আবার জোর দিয়ে বললেন যে কাশ্মীরে যতদিন যুদ্ধাবস্থা থাকবে ততদিন সৌজন্য অসৌজন্যের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ হানাদার নামে মাত্র পার্বত্যজাতি, আসলে পাকিস্তানেরই সৈন্য। পণ্ডিতজী সর্দারজীর বিরোধিতা ক'রে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে লাহোর যাওয়াই ঠিক করলেন।

মিটিং থেকে ফিরেই মাউন্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গে ট্রাঙ্ককলে কথা বলেন। কি কথা হয় তার সরকারি কোন কাগজ নেই তবে

আন্দাজ করা যায় যে, পাছে সর্দারজীর সঙ্গে আবার আলোচনার ফলে পণ্ডিতজী মত বদলে ফেলেন সেই ভয়ে তার আগেই যাওয়াটা পাকা ক'রে ফেলারই এটা প্রচেষ্টা।

মাউন্টব্যাটেন জানতেন যে পণ্ডিতজী আর সর্দারজীর মধ্যে কোন মতান্তর হ'লে গান্ধীজীকেই ওঁরা মধ্যস্থ মানবেন। অতএব জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পরই উনি যান গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধীজীকে উনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, মিটিংয়ে ওঁদের যাওয়া উচিত কারণ বন্ধুভাবে যুদ্ধ মেটানোই যুক্তি-সঙ্গত। গান্ধীজী স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তাঁর মতামত—ফলাফল ভগবানের হাতে। ভারতীয় সৈন্য যদি সব শেষ হ'য়ে যায় আর শেখ আবদুল্লাহ যদি তাঁর হিন্দু মুসলমান শিখ সঙ্গিদের নিয়ে মারাও যান যুদ্ধে তো তিনি অন্ততঃ এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবেন না। ভারতের পক্ষে সেটা হবে সাম্প্রদায়িক মিলন ও মৈত্রীর অনবদ্য উদাহরণ।

৩০-এ অক্টোবর

ভারতীয় ডিফেন্স কমিটির মিটিং হল এবং তাতে সর্দারজীর মতবাদ টিকলোনা। অনেক তর্কাতর্কির পর কমিটি পণ্ডিতজী এবং মাউন্টব্যাটেনের লাহোর যাওয়া সমর্থন করলেন।

সন্ধ্যায় পণ্ডিতজীর সঙ্গে সর্দারজীর গোপন আলোচনা হয়—কি কথা হয় তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি, তবে সর্দারজী নিশ্চয় এমন জোর দিয়ে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন যে মিটিংয়ের পরই পণ্ডিতজী মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখে মিটিংয়ে না যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। অজুহাত অবশ্য দেন অসুস্থতার। অসুস্থ উনি অবশ্যই ছিলেন না, থাকলে দুদিন অনবরত উনি সর্দারজীর সঙ্গে বিরোধিতা ক'রে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে একমত হ'তেন না, এবং লাহোর যাওয়া স্থির করতেন না। কেউ কেউ বলেন যে, সর্দারজী নাকি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পণ্ডিতজী যদি

যান তাহলে সর্দারজী মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবেন এবং কংগ্রেস থেকেও ইস্তফা দেবেন।

৩১-এ অক্টোবর

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার মিটিং হয় লাহোরে। সরকারি ভাবে যেটুকু জানা গেছে সেই মতে মাউন্টব্যাটেন নাকি জিন্নাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যের পরিস্থিতি এবং বুঝিয়েদেন যে ভাবে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠছে তাতে হানাদারদের পক্ষে শ্রীনগর ঢোকা অসম্ভব।

তখন জিন্না প্রস্তাব করেন যে, দু'দলই সৈন্য অপসারণ করুক ওখান থেকে। মাউন্টব্যাটেন যখন জানতে চাইলেন পার্বত্য হানাদারেরা স'রে আসবে কেন? তখন জিন্না বললেন, আপনারা যদি সৈন্য অপসারণ করেন তাহলে আমিও ওদের সরিয়ে আনব।

[এতোদিন পর্যন্ত কিন্তু সরকারি ইস্তাহারে এবং জিন্না জোর গলায় ব'লে এসেছেন যে, ওরা পার্বত্য হানাদার। ওদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের কোন যোগাযোগ নেই !!]

এই প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন যে 'ইউ. এন. ও'র মধ্যস্থতায় প্লেবিসাইট করা হক।

সর্দারজী যে ইউ. এন. ওতে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন তা সর্বজনবিদিত। উনি কোনদিনই চাননি যে আপোষে নিষ্পত্তি হক। উনি চেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানি হানাদার নাম নিয়ে যারা এসেছে তাদের মেরে তাড়ানো হক। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, উনি এবং রক্ষামন্ত্রী সর্দার বলদেও সিং কাশ্মীর থেকে ফিরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন ক'রে এবং ভারতীয় ডিফেন্স কমিটিকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান যেভাবে নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি করছে, যেভাবে তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাশ্মীরে নাগরিকদের ওপর বর্বরের মতন অত্যাচার করেছে আর যেভাবে

তারা কাশ্মীরি মেয়েদের জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে এখনও কেনাবেচা করছে তাতে প্লেবিসাইটের প্রশ্ন তো ওঠেই না, মিটমাট করার প্রচেষ্টারও কোন কারণ নেই এবং ইউ. এন. ওতে আবেদন করার তিনি সর্বতোভাবে বিরোধী।

সর্দারজী এবং রক্ষামন্ত্রী সর্দার বলদেও সিংয়ের স্পষ্ট প্রতিবাদ সত্ত্বেও 'মাউন্টব্যাটেনের মুখরক্ষার জন্য, ২২-এ ডিসেম্বর পণ্ডিতজী ইউ. এন. ওতে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারই বোঝা মাথায় নিয়ে আজও আমরা মরে আছি।

কথায় কথায় অনেক রাত হল, বোধহয় সাড়ে দশটা। আজও সারাদিন আমরা ঘরে বন্দী। শুতে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ঘরে এলেন ভাইয়াজী, অত্যন্ত এক শুভ সংবাদ নিয়ে। রেডিওতে জানানো হয়েছে যে, কাল থেকে মার্শাল ল' রদ করা হয়েছে তবে সাতটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত কারফ্যু জারি থাকবে। তাছাড়া উরস্-এর মেলা হবে এবং হরতাল হবে না। স্পষ্ট বোঝা গেল শ্রীনগরের ওপর হানাদারি ঝড় শেষ হ'য়েছে।...

জানলায় দাঁড়ালাম। বাটমালুর আগুন নিভেছে। আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ আর চারিদিকে অগুনতি তারা অস্পষ্ট নীল আকাশে ঝক ঝক করছে। সারা পাড়াটা নিঝুম, বাড়িগুলো পর্যন্ত যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তিন দিন বাড়ির বাইরে তো দূরের কথা সিঁড়ির মাথায় পর্যন্ত পা দিইনি অথচ ক্লান্তিতে সারা দেহ ভেঙে পড়ছে। দুটো দিন গেলো না, মৃত্যুর ছায়ায় ছায়ায় জীবনের একটা গ্রহণ কাটলো। ভালো ক'রে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি আর ভাবনার ভারে এ দুদিন কল্পনার যে জাল বিছিয়েছি, আজ সে কথা ভাবলেও হাসি পায়। জানলার গরাদে মাথা দিয়ে ভাবতে থাকি কি কি ভেবেছিলাম। ঐখানে ঐভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যে তন্দ্রা এসে

গেছে বুঝতে পারলাম যখন সামনের বাড়ির দোতলার জানলায় ভদ্রলোক পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালেন আর ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। দেখলাম, পেছনে খাটের ওপর উবু হ'য়ে ব'সে মহিলা বাচ্চাকে বোতল খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছিলেন। মহিলাটি বাচ্চার বুকের ওপর একটা বালিশে ঠেসান দিয়ে বোতলটা রেখে উঠে এসে দাঁড়ালেন স্বামীর পাশে, ওঁর কাঁধের ওপর হাত তুলে আর হাতের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে। ভদ্রলোক সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালেন। পর্দাটা পড়ে গেল, আলোটা নিভে গেল।

একগোছা চাঁদের আলো হ'য়ে রুকায়ার স্মৃতি আমার মুখের ঠিক নিচে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল। গত তিন দিন ওর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়েছে ঠিকই কিন্তু সহজ মনের সময় দিতে পারিনি। যখনই ওকে নিয়ে একটু নিশ্চিন্তে বসেছি তখনই যত রাজ্যের ভয় আর ভাবনা ভীড় ক'রে এসে মনটাকে ভারাক্রান্ত ক'রে গোলা-গুলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তখন আর মনের মধ্যে ওকে পাইনি, দেহের জন্যে হাহাকার করেছি। মৃত্যুর ভয় মাথায় ছিল ব'লে বার বারই মনে হ'য়েছে আর একবার যদি ওর সঙ্গে যাওয়া যেত সেই নৌকোয়, সেই বাগানে, তেমনি অশান্ত আগ্রহে। একবার নয়, বহুবার, সেদিন ওর বাড়িতে থেকে না যাওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

আজকের নিবিড় নিস্তব্ধতায় আবার আমার পুরোণো মনটাকে খুঁজে পেলাম। ওর অভাবটা আজ দেহের নয়, মনের। আমার চিন্তায় ওর চলা ফেরাটা শান্ত, স্নিগ্ধ, অসীম সৌন্দর্য্যের। আমার অবচেতন থেকে ও হঠাৎ সচেতন মনে এসে দাঁড়াল, অশান্ত আকাঙ্খার নিষ্ঠুর বেদনা নিয়ে নয় পরিনির্বানীয় আনন্দের অশেষ ঔদার্য্য নিয়ে। ওর এক একটা কথা অন্যটার সঙ্গে মিশে গেল মধুর আবেশে। ও আর আমার কৌতূহল নয়, কামনাও নয়। ওর

জন্যে আর আমি অশান্তও নই। মনের ঠিক মাঝখানটিতে ও এখন নিবিড়, নীরব, নিলীন।

সামনে দোতালার ঘরে আবার আলোটা জ্বলে উঠল। ছোট্ট সংসারের ছোট খাটো শব্দ প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্নের মতন আমার মনটাকে ঘিরে ধরল। এই কদিনে জীবনের একটা মস্ত অভিজ্ঞতা হল, বোধহয় একটা পর্বই পেরিয়ে এলাম। আমার দেশের মানুষদের নতুন ক'রে জানলাম, আমার দেশের বড় বড় মাথাগুলোকে নতুন ক'রে চিনলাম, মৃত্যুর আতঙ্ক যে কি আর কতখানি তাও কিছুটা বুঝলাম। কিন্তু জীবন আমার কতটা এগুলো? কতখানি বদলালো? অতীতের দুঃখ, বেদনা, ভুল ভ্রান্তি, অল্প পাওয়ার অনেকখানি আনন্দ সবই তো যেমন ছিল তেমনিই আছে। আজ এখানে আছি, কাল থাকব না। ঘুম থেকে উঠলেই আবার সেই ভাবনা, সেই চিন্তা, সেই আশা নিরাশার দ্বন্দ, সেই পাওয়া না পাওয়ার ঝড়। সেই গতানুগতিক জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহ। সবই তো যেমন ছিল, তেমনিই র'য়ে গেল। এসেছিলাম ছবি করার উৎসাহ নিয়ে। থাকলাম সাময়িক উত্তেজনার চাঞ্চল্য নিয়ে। কাল যাবো, কিন্তু কি নিয়ে? যা জানলাম, যা দেখলাম, যেটুকু বুঝলাম সবই তো বুদ্ধির, জ্ঞানের; মনের কি হল? এর চেয়ে যদি ঐ রকম ছোট্ট ঘরে ছোট্ট সাংসারিক শব্দের মধ্যে জড়িয়ে থাকতাম, অমনি ক'রে জানলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতাম—অমনি করেই সেটা হঠাৎ কিছু ভেবে নিয়ে ফেলে দিতাম, অলোটা নিভিয়ে দিতাম, তাহ'লে অনেক বেশী আমার মন ভরতো। মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে সামান্য একটা মাটির ঘরকে যদি বাঁচাতে পারতাম তাহ'লে এই অভিজ্ঞতাটা আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে যেতে, বাঁচার সার্থকতা পেতাম। আজকের এই অর্দ্ধ নিমিলিত জ্যোৎস্নার মায়া-মিছিল তখন দু হাতে লুটে নিতাম। আজকের এই নিবাত কাশ্মীর-রাত্রির

যে নির্খর্ব ভাষা তার সবটুকুই নিজের মধ্যে নিরূপম আনন্দে জেনে নিতাম।

কিন্তু ভেবে দেখলাম কিছুই আমার জানা হয়নি। সামান্য যেটুকু জেনেছি সেটা হল প্রতীক্ষা। অক্ষয়, অন্তহীন প্রতীক্ষা। কিসের তা জানিনা, কেন তাও ঠিক জানিনা। মন শুধু বলে কোন একদিন কোন একখানে তার শেষ হবে। এই সেদিন পাটনা ষ্টেশনে কুড়ি বছর প্রতীক্ষার পর মেয়েটি মারা গেল। তারও ছিল প্রতীক্ষা, সে প্রতীক্ষার পূর্ত্তি তারও হয়নি। তার সঙ্গে আমার প্রতীক্ষার অনেক প্রভেদ। সে জানত কেন তার প্রতীক্ষা, কিসের জন্যে প্রতীক্ষা। জীবনে সে একদিন কিছু পথ চ'লেছিল তার সব পাওয়াটাকে পাথেয় করে। তাই সে জীবনের কুড়ি বছর মূল্য ধ'রে দিল। আমি তো দু-কুড়িও পার হ'য়ে গেছি। অথচ কিসের জন্যে তাই ছাই ঠিক ক'রে জানিনা।

কিছু একটাতো বটেই, নইলে প্রতীক্ষা বলব কেন। কিন্তু কি? কোন একদিন ঘর বেঁধেছিলাম সাতপাক ঘুরে। জীবনের মূল্যবোধ স্থির হওয়ার আগেই সে পাক আমায় প্রতীক্ষার জালে জড়ালো। মন বললে, এ নয়, অন্য কিছু। হাত বাড়িয়ে যা পেলাম মনে হল বুঝি প্রতীক্ষার শেষ হল। একদিন দেখা গেল সেও মিথ্যা মোহের একটা জগদ্দল পাথর। সেই পাথরটাকে নিয়েই পুজোর খেলা খেলতে খেলতে প্রতিমা যখন গড়লাম তখন দেখা গেল, আসলটাই বাদ পড়ে গেছে। প্রতিমা গড়েছি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি। নিজের দিকে চোখ বন্ধ করে আমার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সবাই দেখি আমারই মতন পাথর পূজো করছে। সবাই বললো, এটাই নাকি সভ্য জগতের স্বীকৃত নিয়ম। হবে। হয়ত তাই। আমিই বোধহয় আদিম যুগের মন নিয়ে আধুনিক জীবনে এসে ভুল করেছি। ধরে নিলাম, যা করছি সেটা আমার প্রায়শ্চিত্ত। একদিন দেখলাম সে পাথরটাও

নেই। তাকিয়ে দেখলাম, সেটা, কে জানে কখন, গড়াতে গড়াতে নর্দমায় পড়ে গেছে।

আবার আমার প্রতীক্ষার পালা। কার? আর কেনই বা? শুনেছি, সব মানুষেরই একটা গেরুয়া পরা মন থাকে। আমার সেই গেরুয়া মন গ্রন্থি বেঁধেছে ধূসর ধুলোর সঙ্গে। মনে হচ্ছে হয়ত' সেই গ্রন্থি খোলারই প্রতীক্ষা। তাই কি? যদি জানতাম।

সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বলরাজ বললে:

'কি ব্যাপার? এতো চুপচাপ কেন? মুখের ওপর কি মার্শাল ল' বসালে না কি?'

'মুখের ওপর নয়' আমি বললাম, 'মনের ওপর!'

হাসতে হাসতে ও বললো:

'তাহ'লে স্থির মনে শুনে নাও। কাল রুকয়া এসেছিল।'

'কখন?'

'অনেক রাত্রে।'

'ডাকলে না কেন?'

'রুকায়া বারণ করল।'

আর কোন কথা না ব'লে ও কাঁটা ধরল ডিম খাবে ব'লে। আড়চোখে চেয়ে যখন দেখল আমি আরও কিছু শুনবার জন্যে ওর দিকে চেয়ে আছি, তখন মুচকি হেসে বলল:

'আমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল!'

ওকে হিংসে করার কোন কারণ নেই আর রুকায়াকে নিয়েও হিংসে করার কথা নয়, তবুও ওটা বোধহয় আমার অজান্তেই মাথা তুলে দাঁড়াল:

'অত রাত্রে? আমি তো ঘুমিয়েছি এগারোটার পর!'

'আজ্ঞে।' তারপর আবার ছেলেমানুষের মতন হেসে বলল, 'কথাই ছিল কাজ কিছু নয়! শুনবে?'

'আপত্তি নেই।'

ও আবার হাসল :

'রাগ কর'না। তোমায় দেখাবার মতন ওর চেহারা ছিলনা। মানে।' ও থেমে বললে, 'এটা ওর কথা, আমার নয়!'

'অর্থাৎ?'

'দুদিন দুরাত বাটমালুতে ও মেয়েদের দেখাশুনা করে ক্লান্ত ছিল। আমায় বলতে এসেছিল যে আমার কথা শুনেই ও কাজে নেমেছিল!'

কথাটা শুনতে আমার ভালো লাগল।

'তোমায় একটা কথা বলতে বলেছে।'

'কি?'

'আজ তোমায় নিয়ে ও মেলায় যাবে, তিনটের সময়। তৈরি থেকো।'

আমি ছোট্ট করে উত্তর দিলাম, 'আছি।'

ওও তেমনি ছোট্ট ক'রে হেসে বলল, 'জানি।'

সতেরো

ন তারিখ সারাদিন

শ্রীনগরের উত্তর কোণে যে পাহাড়টা তারই নাম হরি পর্বত। এখানে মুসলমানদের বড় মসজিদ আছে, হিন্দুদের বহু মন্দিরও আছে। আকবর বাদশাহ এখানে সহর বসাতে চেয়েছিলেন আর তার অনেক আগে হিন্দু রাজা প্রবরসেন এখানে 'প্রবরেশ' নামে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে যে দুর্গটার ভগ্নাবশেষ আছে তার সঠিক ইতিহাস কেউ জানে ব'লে মনে হয়না। মাটি খুঁড়ে যা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে ওটা খৃষ্ট জন্মাবার কম ক'রে দুশো বছর আগে তৈরি। আরও বেশী হবে তো কম নয়।

এই হরি পাহাড়ের পায়ের তলায় খানা ইয়ারি। এখানে সবচেয়ে পুরোনো আর তার চেয়ে প্রবল তর্কমূলক জিনিষ হল একটা কবর। এখানকার লোকেরা বলেন যে ওটা ওদের পয়গম্বর ঈশার কবর। ওঁদের যিনি ঈশা, পৃথিবীর তিনিই যীশু। ওঁরা জোর গলায় বলেন যে বিদেশীদের হাতে নির্য্যাতিত হ'য়ে পয়গম্বর ঈশা পালিয়ে এসে এইখানেই তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত ছিলেন। এ নিয়ে অবশ্য তর্কের শেষ নেই তবে ওদের দিকের কথা মন দিয়ে শোনাবার মতন। প্রমাণ যদি চাও, ওরা বলে, খোঁজ নাও একটাও কথা আমাদের মিথ্যে নয়। খোঁজ করার মতন কথাও বটে।

তুর্কীর সঙ্গে রাশিয়ার যে যুদ্ধ হয় ১৮৭৭ সালে তার ঠিক পরেই নিকোলাস নটোভিচ নামে এক রাশিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সারা এসিয়া ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লেন লাদাকে। ওখানকার একটা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ওঁর পা ভাঙে আর লাদাকিরা ওঁকে

নিয়ে যায় হেমিস গুম্ফের লামাদের কাছে। সেখানে থাকার সময় উনি শুনতে পান যে লামাদের এক অতি পুরোণো গ্রন্থে যীশুর ভারতবাসের পুরো ইতিহাস লেখা আছে। উনি তার অনুবাদ প্রকাশ করেন রাশিয়ান ভাষায় ১৮৮৭ সালে আর তারই অনুবাদ করেন মার্কিনী মহিলা অ্যালেকসিনা লোরেঞ্জার ১৮৯৪ সালে। সেটা শিকাগোতে ছাপা হয়। নিকোলাসের মতে এবং লামাদের বইতে যে ইতিহাস লেখা আছে সেই অনুযায়ী :

মিশরের রাজা ফেরাও যখন ইজরেল অধিকার ক'রে নিলেন তখন ইজরেলবাসীদের দুরবস্থার সীমা রইল না। রাজার অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে তারা রাজার বড় ছেলে মোসাকে বলল আমাদের বাঁচান। মোসা (মোজেস্) অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। মোসা তাঁর পিতা রাজা ফেরাওর কাছে গিয়ে অত্যাচার বন্ধ করার দয়া ভিক্ষা করলেন। রাজা তাতে অসন্তুষ্ট হ'য়ে অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দিলেন। ইজরাইলিদের দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে জগৎ পিতা জগদীশ্বর মনুষ্য শরীর নিয়ে অবতীর্ণ হ'লেন পৃথিবীতে এক অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে। এই শিশুরই নাম ঈশা।

এই শিশু ঈশার বয়স যখন হল তেরো তখন দেশবাসীরা বিয়ের জন্য তাঁকে উৎপীড়ন আরম্ভ করল। তিনি বিরক্ত হ'য়ে বাড়ি ছেড়ে, জেরুজালেম ছেড়ে চলে এলেন ভারতে এক ব্যবসাদার দলের সঙ্গে। উনি প্রথম থাকলেন সিন্ধে। সেখান থেকে গেলেন পঞ্চনদীর দেশ (পাঞ্জাব) পেরিয়ে রাজপুতানায় এবং জৈনধর্মে আকৃষ্ট হ'য়ে শিক্ষাব্রতী হলেন [বলাবাহুল্য, রাজস্থানে, মাউন্ট আবুতে ঈশাগুহ ব'লে একটা জায়গা আছে]। কিছুদিন থাকার পর, যখন মন ভরল না তখন উনি গেলেন জগন্নাথ ধামে উড়িষ্যায়। সেখানে উনি বেদ অভ্যাস করলেন, চিকিৎসা শাস্ত্র পড়লেন এবং মানুষের দেহ থেকে অসৎ আত্মার প্রভাব কি ক'রে খর্ব করতে হয় তাও শিখলেন। এর পর ছ'বছর তিনি ঘুরে বেড়ালেন—

গেলেন রাজগীর, গেলেন বারাণসী এবং আবার ফিরে গেলেন পুরী। এখানে তিনি অস্পৃশ্যদের ওপর ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার দেখে দুঃখিত হ'লেন এবং শূদ্রদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেলেন। তাই দেখে উঁচু জাতের মানুষ ওঁর দিকে নিচু চোখে তাকালো। প্রাণ সংশয় দেখে উনি পুরী ছেড়ে চ'লে গেলেন।

গিয়ে পৌঁছলেন বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু। জেনে নিলেন বৌদ্ধধর্ম আর শিখে নিলেন পালি ভাষা। গেলেন নেপাল, ঘুরলেন হিমালয় আর ১৯ বছর পরে ফিরে গেলেন স্বদেশে।

হিমিশ গুমফে যে পুঁথি আছে সেটা তিব্বতী ভাষায়। আরো একটা আছে নাকি লাসায় সেটাও তিব্বতি ভাষায়। পুঁথি যে সত্যিই ঐ হিমিশ গুম্‌ফে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রখ্যাত সাধু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজে দেখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন।

ভারতবর্ষে যীশু যে এসেছিলেন, এ কথা আরও দু'এক জায়গা থেকে জানা যায়। পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে রাজনিতিক নেতা বিপিনবিহারী পাল নাকি শুনেছিলেন যে প্রভু বিজয়কৃষ্ণ যখন একদল যোগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পাহাড়ে যান তখন ওখানকার 'নাথ' সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থে নাকি ঈশাই নাথের কথা শোনেন। ঐ ধর্মগ্রন্থে ওঁকে নাথ সম্প্রদায়ের একজন প্রবর্তক ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে আর ওঁর জীবনের যে ইতিবৃত্ত আছে সেটা নাকি বাইবেলের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

সাধক স্বামী রামতীর্থও নাকি এই ধরণের কথাই বলেছেন। উনি বলেন যে স্বদেশে ফিরে যখন যীশু শান্তির বাণী প্রচার করেন এবং ওঁকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয় তখন উনি সমাধিস্থ হ'য়ে নিজের প্রাণ বাঁচান এবং শেষ বারের মতন দেখা দিয়ে (রেশারেকসন্‌-এর পর) ভারতে ফিরে আসেন। আসবার সময় উনি কাবুলের মধ্যে দিয়ে আসেন। আসবার পথে যে পুকুরের ধারে ব'সে উনি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেছিলেন, তাকে আজও লোকে

ঈশাতলাও বলে। আরবী ভাষায় লেখা 'তারিখ-ঈ-আজম্‌' বইতে এর পূর্ণ বিবরণী আছে।

এসব নিয়ে তর্কের শেষ নেই, মিমাংসার কোন সম্ভাবনাও নেই। যে যেখানে যা দেখেছেন বা শুনেছেন তাই বলেছেন। সত্য মিথ্যা অতীতের গর্ভে, জানার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কৌতূহল কিন্তু অন্য। কোরাণে যীশুর যে উল্লেখ আছে তাতে বলা হয় ঈশা-মসী। মসী কথাটা 'মেসিয়া'র অপভ্রংশ। এতে ভুল-চুক হওয়ার কোনই কারণ নেই; মহম্মদ যীশুর পরের লোক। আমার প্রশ্ন হল ভবিষ্য পুরাণে যীশুর এই ঈশা-মসী নামটা এলো কি ক'রে? শ্লোকটা হল:

ঈশমূর্তিহৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্‌॥

ভবানীপুরে লক্ষ্মীবাবুর সোনা চাঁদির অসলি দোকানের মতন খানা ইয়ারিতেও অসলি ঈশা মলমের অনেক দোকান আছে। ঈশা নাকি ঐ মলম গায়ে মেখে শরীর সারিয়েছিলেন ক্রুশ থেকে নেমে। এ পাড়ার সব মুসলমানই ঈশা পয়গম্বরের ভক্ত আর এই ঈশাই যে আসল যীশু সেটা প্রমাণ করার কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয় না। ওরাই বলল এটা নাকি প্রায় দু'হাজার বছরের পুরোণো—খোদার কসম্‌। দেখলে মনে হয় ওটা ভুল, তবে অনেক পুরোনো আর অনেকবার যে সারান হ'য়েছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়না। জুতো খুলে আর হাতে মুখে জল দিয়ে রুকায়ার পেছন পেছন ভেতরে গেলাম। বোধহয় যীশু নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব'লেই ভেতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন চোখের পলকে সাত সাগর তেরো নদী পার হ'য়ে চ'লে গেল, এক অদ্ভুত জগতে। দু'একবার মনে হল, হয়ত? হয়ত না। হক আর নাই হক ক্ষতি কি? আর এ নিয়ে তর্কই বা কিসের? এক টুকরো জমি আর অন্ধ বিশ্বাস এই নিয়েই তো

যত ঝঞ্ঝাট। মন যদি মানল তো ভালো। না যদি মানল' তো তাও ভালো। আসল জিনিষ যেটা—ঐ মানুষটার বলার কথা--সেইটাই মানিনা—আর সেইটাই দুঃখ।

একধারে দেওয়ালের মাঝামাঝি একটা গহ্বর আছে। ওদের এটাও একটা মস্ত বিশ্বাস যে ঈশা মসী আবার আসবেন—আর ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে আসবেন। রুকায়া আমার হাতটা ধ'রে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বললে :

'এদিকে এসো, এখানে দাঁড়াও।'

আমি দাঁড়ালাম। ও কৌতূহলে টানা বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে তাকালো। একটু হেসে বললাম :

'কেন দাঁড় করালে জানিনা তবে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে আর সঙ্গে সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ।'

'সেই জন্যেই।'

ও আমার পাশে, গা ঘেঁসে দাঁড়াল। হাতে হাতখানা ছুঁয়ে—সেই কৈশোরের ভয় ভয়, অথচ ভালো লাগার আনন্দ নিয়ে। সুড়ঙ্গটা একবার দেখে নিয়ে বললে :

'সত্যিই আসবে না কি ঈশা-মসী ?'

'আসেনই যদি ?'

'ভালো হয়।'

'ধর এলেন। কি বলবে ?'

'বলব ধর্মের কথা গিয়ে বল ধ্বংসকারিদের দেশে, আর খৃষ্ট মন্ত্রীদের আমায় তুমি শিখিয়ে দাও তোমার প্রাণ বাঁচানো মলমের কথা। আমি ঐ বাটমালুর নিরীহ মানুষগুলোকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে চাই।' বলতে বলতে ওর বড় বড় চোখ দুটো জলে ভ'রে এলো। আমি ওর হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলাম, যদি কোন রকমে ওর অসীম বেদনার ভাগ নেওয়া যায়। বোধহয় বাড়িয়েই দিলাম। ও কবরের ওপর মাথা দিয়ে কাঁদল,—একদম ছেলেমানুষের

মতন। তিন দিন তিন রাতের পুঞ্জীভূত বেদনার প্লাবন বইল। আমি ওর হাতটা ধ'রে বললাম :

'চল। দস্তগীর সাহেবেব মাঠে যাই। মানুষের মধ্যে মনটা ছড়িয়ে দিলে, হারাণোর দুঃখ কমবে।

* * * *

আন্দাজে বোঝবার উপায় নেই, বলা আরও মুস্কিল, তবে মনে হল উরস্-এর মেলায় কম ক'রে লাখ খানেক লোক তো হবেই হবে। কিছু কম কিছু বেশী। ওদের আকীর্ণ আনন্দের কলোচ্ছ্বাসে ধরণী মুখর। আকাশ যেন আরও ওপরে উঠেছে, হরি পর্বতও কিছু পেছিয়েছে। কোথায় গেল কালকের বিভীষিকা? মনে হল মার্শাল ল'টা বোধহয় ছিল না। ওটা আমার মনের ভুল। এদের এই আত্মহারা পরমোৎসব দেখে কে বলবে, যে এই দুদিন আগে এই এরাই আতঙ্কে আর্তনাদ ক'রেছিল মৃত্যুর পরোয়ানা পেয়ে। শরতের আকাশে যে মেঘের খেলা তাও বোধহয় এর তুলনায় মন্থর।

রুকায়া বললে, এদের মধ্যে হানাদারও অনেক আছে এটা সরকারের কড়া সন্দেহ। তাই দেখলাম পাহারার ব্যবস্থাও কিছু কম নয়। থাক আর নাই থাক হানাদার, কিন্তু তাদের ভয়? সেটা গেল কোথায়? রুকায়া হেসে বললে, কাশ্মীরের লোক যাদু জানে, মন্ত্রবলে উবে গেছে। আমারও তাই মনে হল। কলকাতা, দিল্লীর কথা জানি। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা মিটবার বহু পরেও বে-পাড়ায় গেলেই গা-টা যেন ছম্ ছম্ করত। এরা সত্যিই ওদের ঐ আকাশেরই মতন নির্মল। এই ঘনঘটা, জমাট মেঘে সব অন্ধকার আর এই ঝকঝকে সূর্য বুকে নিয়ে স্তব্ধ আবেশে ধ্যান মগ্ন। বজ্রের কষাঘাত থামতে না থামতেই বিস্তীর্ণ নীল আকাশ আলোর বিভূতি ছড়ায়। কালকের বেদনা উত্তীর্ণ হ'য়ে ওরা অবতীর্ণ হয়েছে আজকের আনন্দে। অতীতের বোঝা এতটুকু নেই, ভবিষ্যতের

ভাবনাও নেই। আল্লাহর নামে ওরা অন্ধ নয় বলেই তাঁরই আলোয় চোখ রেখে, জীবনকে ওরা জয় করেছে।

'তার কারণ কি জানো?' রুকায়া ভীড় ঠেলে যেতে যেতে বললে, 'তার কারণ আমাদের নৈসর্গিক নিবিড়তা। এখানে প্রকৃতির এমন প্রাণস্পন্দন যে আমাদের থামবার উপায় নেই, আমরা কেবলই এগিয়ে চলি—সঞ্চয়ের পথে নয়, দুহাতে নিজেদের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে। সভ্য জগতে তোমরা মিথ্যায় কলঙ্কিত। এই বিস্তীর্ণ পরিবেশে আমরা সত্যের মধ্যে সমাহিত।'

'বোধ হয় তাই।'

'আরও একটা কারণ আছে,' রুকায়া বললে, 'আমাদের চারিধারে এতো পাহাড় যে নিজেদের বড় বলার না আছে আমাদের সাহস, না আছে ধৃষ্টতা। প্রয়োজন হ'লে যেমন আমরা ওদের মতন নীরব হ'তে পারি, আবার ওদের মতন বিরাটভাবে অটলও হ'তে পারি। আঠারো বছরে দু' দুবার সে প্রমাণ আমরা দিলাম। তাই না?'

ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ' বলে ভীড়ের মধ্যে আমরা হারিয়ে গেলাম।

ধুলাধূসারিত মুখখানা ঝর্ণার জলে ধুয়ে দেখি রুকায়া একটা গাছের তলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে। আমরা দস্তগীর সাহেবের মাঠ পেরিয়ে এসে ব'সেছি সফেদা সারির তলা দিয়ে ব'য়ে যাওয়া ঝর্ণার ধারে। ভীড় অনেকক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। অনেকখানি কষ্টে। ধুলো ঝাড়াও হ'য়ে গেছে কিন্তু কলরবের স্পন্দন এখনও কানে আছে। তিনদিন ওকে নিয়ে অনেক কল্পনার জাল বুনেছি ব'লে আজ যেন আর কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে মন চাইছে না। ওর পাশে বসতে বসতে বললাম:

'কি হল?'

'জল দেখে মনটা জ্বলে উঠল।'

'হঠাৎ ?'

'বাটমালুর কথা ভেবে।'

'সত্যিই তো,' ওর হাতখানা ধ'রে খেলা করতে করতে বললাম, 'সে গল্প তোমার শোনা হয়নি। আরও মনে পড়ল। সে দিন তুমি এসেছিলে ডাকোনি কেন ?'

'গিয়েছিলাম তোমায় নিয়ে গিয়ে কিছু দেখাবো বলে।'

'ডাকলে না কেন ?'

'মায়া হল। যা অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে।'

'দেখেছিলে বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

ও আমার হাতের ওপর গালটি রেখে বলল :

'লোভ হল।' থেমে বললে চোখে চোখ রেখে, 'খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু !'

'বোধহয় তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছিলাম ব'লে।'

'সত্যি ?'

'হুম।'

'কি ভাবলে ?'

'কত কথা। তুমি কোথায়। কি করছ। কেমন আছো।'

আমার হাতের ওপর ও ঠোঁট বোলাতে বোলাতে বলল :

'ছিলাম বাটমালুতে। করছিলাম সেবা। ছিলাম আমি তোমাকেও ভুলে।'

ওর মুখখানা তুলে ধরলাম, ভালো ক'রে দেখব ব'লে। বললাম :

'এতো কি কাজ তুমি করলে ?'

'দেখবে ?...চল।'

যেতে একটু দেরিই হল।

বাটমালুর ধারে ছোট্ট একটা টিপি আছে। তারই ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম হানাদারদের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা। আমাদের পায়ের তলায় বাটমালু পড়েছিল ঠিক যেন আধ-পোড়া মৃতদেহ। তার চেয়ে বিভৎস। তিন শো বাড়ি, দেড়শ' লোক। শিশু আর মেয়েই বেশী। দু'চারটে কুকুর ঘুরছে, কিছু শকুন উড়ছে আর দু'চারটে লোক কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কখন তোলে, কখন দেখে আর কখন ফেলে। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায়। বোধহয় আল্লাহ হো আকবর কথাটার মানে জানতে চায়।

আমরা নিচের দিকে তাকালাম। চুপ ক'রে রইলাম। পেটের মধ্যে কেমন যেন পাক দিতে আরম্ভ করল। কথা বলার কারণ ছিল না। প্রয়োজনও না। শুধু বাটমালু নয় শ্রীনগর নয়, হিন্দুস্থান পাকিস্তানও নয়, পুরো পৃথিবীটাই যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে; মানুষ এমন জঘন্য হ'তে পারে, নৃশংস হ'তে পারে এটা যেন ধারণাই করতে পারছে না। ক্ষমতা, আধিপত্য, শক্তি, স্বার্থ এইসব কুৎসিত জিনিসগুলো সমস্ত জগতটাকে এমন একটা কদর্য জালে জড়িয়েছে যে মানুষের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধ'রেছে; তার আত্মা পর্যন্ত প'চে খসে পড়ছে। এই কুষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে এমন আশা যদি কিছু থাকে, তো সে অল্প। নিজেকে মানুষ ব'লে ভাবতে লজ্জা লাগছিল। আমরা আর মানুষ নই, বিকৃত বিকলাঙ্গ পচে খসে যাওয়া মৃতদেহ।

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় মনে হল রুকায়া আমার পাশে নেই। তাকিয়ে দেখি ও পাশ ফিরে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি:

'কি দেখছ?'

ও হেসে বলল, 'ধান। ক্ষেতের ওপর কে যেন সোনার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।'

'ধান।' থেমে বলি 'কাটবে কে?'

ও বললে, 'কেন ? যাদের ক্ষেত।'

তারাতো শেষ হয়ে গেছে।'

'না।' ও বললে, 'সবার শেষ আছে কাশ্মীরের শেষ নেই। দেখনা, গাছ কাটলে ঠিক তারই পাশে আবার নতুন চারা গজিয়ে ওঠে ? গাছের শুকনো পাতা দিয়েই তো নতুন গাছের সার হয়। আমরাও তাই। নিত্যপ্রলয় আছে বলেই তো নবীনের জন্ম।'

অবাক হ'য়ে তাকাই, বলি, 'ভাবতে পারছ কি ক'রে ?'

'এইটাই যে প্রকৃতির শিক্ষা। কালকের ঝরা পাতা, আজকের শুকনো ডাল কোথায় যায় কেই বা জানে। প্রকৃতি তাই বলতে থাকে সামনে তাকাও। সবুজের মায়ায় মন ভরে নাও। বুঝেছ ?'

'না।'

ও হাতটায় হেঁচকা টান দিয়ে বললে :

'তুমি যে পরদেশী। নাও চল। আজ তোমায় ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

যেতে যেতে বললাম :

'কে জানে, হয়ত তোমরাই ঠিক। মন না চাইলেও মানতে হবে—সব কিছু ওদের পাশবিকতা, তোমাদের পরিপূর্ণতা। মাঝখানের ব্যবধানটাও।'

বাটমালু ছাড়িয়ে বাইরের দিকে এলেই কাঠের পুল পড়ে। তারই পাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। সেইটাই ছিল ক্যাপ্টেন শের আলির বাড়ি। উনি মারা গেছেন কিন্তু ওঁর ছেলে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে থেকে যায়। সেটা সহজ কথা, কিন্তু শক্ত হ'য়ে ওঠে যখন জানা যায় যে, শের আলির ছেলে মেজর সামশের আলি পাকিস্তানের সৈন্যাধ্যক্ষ। কাশ্মীর নিয়ে যখন এতো কড়াকড়ি তখন ওঁর আসার ওপর আর কিছু না হক অন্তত: কড়া নজর রাখা নিশ্চয় উচিত ছিল। সরকারি মহলের কথা হল যে, নজর রাখা হত

ঠিকই কিন্তু ধর্মের নামে ওঁর আসাটা যে শুধুই ধাপ্পা এটা বোঝা যায়নি। নজর যেটা ছিল সেটা হয় কড়া ছিল না আর না হয় নজরানাটা বেশী ছিল—কারণ এই বাড়িতেই পাওয়া গেছে প্রায় পঁচাত্তর টন গোলাবারুদ।

সহজেই প্রশ্ন ওঠে, সহরের সীমানার মধ্যে এতো মাল আসে কি ক'রে? আনলোই বা কে আর রাখলোই বা কখন? এ প্রশ্ন বহুবার বহুভাবে আমি বহুলোককে করেছি কিন্তু প্রকারান্তরে প্রায় সকলেই উত্তরটা এড়িয়ে গেছে। রুকায়া গাড়িতে যেতে যেতে যা জানে সেইটুকুই বলল। ওরই কাছে শুনলাম:

বর্তমান হানাদার আক্রমণের ব্যাপারে দোষটার অনেকখানি পড়েছে বক্‌সির ওপর এবং ভারতের পক্ষে যেটা ক্ষমাহীন কলঙ্ক—বর্ডার পাহারায় নিযুক্ত তিনজন সামরিক বড় অফিসারের ওপর। শোনা যায় যে ব্রিগেডিয়ার অনন্ত সিং—যিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন তিনিই নাকি ছিলেন সে দলের নেতা। আরও যে দুজনের নাম উল্লিখিত হয় তাঁদের মধ্যে একজন হিন্দু এবং অন্যজন খৃষ্টান। বলা বাহুল্য, এ আলোচনা কাশ্মীরিদের মধ্যেও যেমন শুনেছি সামরিক বিভাগের কর্মচারিদের মধ্যেও তেমনি শুনেছি। বিশ্বাস করতে অবশ্যই মন চায়না কিন্তু না ক'রেই বা উপায় কি? জঙ্গলের ঠিকেদার যতই ষড়যন্ত্র করুক আর যতই লরী চালাক, সৈন্যবাহিনীর সতর্কতায় শৈথিল্য না থাকলে হাজার দশেক লোক আর সাড়ে সাতশো লরী অস্ত্রশস্ত্র সরাসরি শ্রীনগর চ'লে আসা সম্ভব ছিল না। শ্রীনগরের মধ্যেই পাওয়া গেছে পঁচাত্তর লরী—আরও কম ক'রে পঞ্চাশ লরী ওরা ব্যবহার করেছে আর কিছু না কিছু ক'রে কুড়ি লরী এখনও লুকোনো আছে। অস্ত্র আবার চাল নয়, চিনিও নয় যে চুপি চুপি আনা যায়। এসেছে ষ্টেনগান্ ব্রেণগান্ লাইট মেশিনগান্। গুলি হাত বোমা তো আছেই। কম ক'রে সাত আট জায়গা দিয়ে এতো জিনিষ

যখন এসেছে আর সারা কাশ্মীরে যখন ছড়িয়েছে তখন একদিনে হয়নি এবং একজনের জন্যে হয়নি।

পাহারায় যারা থাকে তারা চোখ বোঁজে সাধারণতঃ দু কারণে। হয় ঘুমের জন্যে আর না হয় ঘুঁষের জন্য। সামরিক বিভাগ দোষ দেন কাশ্মীরি মিলিশিয়ার ওপর। মিলিশিয়া বলে, ভেলারে ভেলা বর্ডার তো পাহারা দাও তোমরা—আমাদের দোষ কোনখানে? কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আগে চোর বাড়িতে ঢুকবে তবে সে বাক্স ভাঙবে।

তর্কের খাতিরে, ও বললে, না হয় স্বীকারই করা গেল যে ন' শো মাইল সীমান্ত রেখার সব জায়গায় গার্ড দেওয়া সম্ভব নয়—যদিও, ওরা যে সব জায়গা দিয়ে ঢুকেছে তা আমরা জানি এবং ঠিক সেই জায়গা দিয়েই যে গতবারেও ওরা এসেছিল তাও সবাই জানে। আর এটাও না হয় মেনে নেওয়া গেল, যে কাশ্মীরি মিলিশিয়া সতর্ক ছিল না—তাহ'লেও রইল আমাদের ভারতীয় সামরিক ইন্টেলিজেন্স; তারা কি করছিল? বর্ডার গার্ড শুধু সৈন্যরাই দেয় না, ওরাও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ওরা রাখেনি কেন? আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বিলেতি সি. আই. ডির। তারা গ্রামের পচা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা রিভলবারের সন্ধান পেতো; দিদিমার বালিশের মধ্যে সেলাই ক'রে রাখা বোমা বের করত, আর তার চেয়ে বড় কথা—যারা এই সব কাজ করত, তারা সাহেব নয়। এদেশেরই লোক। তখন যদি অতো শক্ত কাজ সম্ভব হত, আজ এতো সহজ কাজটা শক্ত হ'য়ে উঠল কি ক'রে? আমরাই সেদিন যেটা পেরেছি—আজ পারি না কেন? দোষটা ঠিক কার?

হেসে বললাম: 'আবার সেই গোড়ার প্রশ্ন!'

'সত্যি!' ও হেসেই বললে, 'ওর আর শেষ নেই!' তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

আমি তখন বললাম:

'বৃহত্তর জগত থেকে ব্যক্তিগত জীবনে নেমে বল, কামাল কোথায়? কোন খবর জানো?'

'না।'

'খবর দেয়নি কিছু?'

'কখন তো দেয় না।'

জবাবটা ছোট্ট কিন্তু সুরটা সকরুণ। ওর কোলের ওপর হাতখানা রাখা ছিল। তাতেও যেন গভীর হতাশা। আঙ্গুলগুলো শিল্পীর স্বপ্ন, এতো সুন্দর। ওর বিয়ের আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলাম:

'আরো একটা আরো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?'

'প্রশ্ন না করেই অনেক কিছু জেনেছো—যা আমি নিজেও জানতাম না কোনদিন। আজ হঠাৎ দ্বিধা কেন? বল।'

'কামালকে কতদিন তুমি কাছে পাওনি?'

দ্বিধাহীন জবাব দিল:

'ধর দশ বছর। বারোও হ'তে পারে।'

'কেন?'

ডান হাত দিয়ে ও নিজের কপালটা কুঁচকে ধরল। কিছু ভাবল।

আমিই তখন বললাম:

'ইচ্ছে না হ'লে জবাব দিও না।'

'ভাবছি। ভাষা পাচ্ছি না।'

'ভাসা ভাসাই বল না হয়।'

'কামাল আমার স্বামী কিন্তু সংস্কার আমি মানিনা। বিয়ের পরেই কাছে চাওয়ার মূলে ছিল আমার ভীরু নিবেদন। তারই ভিত্তিতে যখন ভালবাসাটা গ'ড়ে উঠল, তখন ও ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছে। কাছে আসত কিন্তু ভালোবাসার মোহে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। সেটা আমার সইল না। তবু আপত্তি

করিনি। আশা ছিল, হয়ত কোন একদিন স'য়ে যাবে। যেতও, যদি ও বুঝত, কিন্তু ও ওর স্বভাবটাই জানতো, আমার অভাব কোনদিনও বোঝেনি। একদিন, বোধহয় মদের নেশা ছিল বলেই ও মনের কথাটা মুখে আনল, বললে, তুমি একটা কাঠের পুতুল।' থেমে গেল, রুকায়া, কিছু আবার ভাবলে তারপর বললো :

'একবার মনে হল, হ'য়ত সেই জন্মেই ও ঘর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছে। আসলে, দোষটা আমারই। আমি অস্বাভাবিক। কঠিন। তুমি যা ব'লেছিলে—হিম। তাই নিজেকে পরখ ক'রে দেখবার জন্মে একদিন আমি নিজেই চ'লে গেলাম ওর কাছে ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওর স্পর্শটুকুও সহ্য হল না। ওর উত্তেজনার তীব্রতা দেখে একটাই উপমা মনে পড়ল। সেই সাতচল্লিশের রাত্রে বারামূলার বাজারে একটা কালো কুকুরকে দেখেছিলাম মরা শিশুর মাংস খাচ্ছে। বাড়ি ফিরে বমি করলাম। সেদিনই সব শেষ হয়ে গেল।'

বাড়িতে এসে শোনা গেল কামাল এসেছিল, একটা ছোট্ট চিঠি লিখে চলে গেছে। আর ছেলে গেছে ঠাকুমার কাছে তু'দিন থেকে আসবে বলে। কামালই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে, পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে। চিঠি নয় কয়েকটা কালির আঁচড়। নামটা রুকায়ারই কিন্তু ডাকটা আমাকে। ও আছে শান্তিপুরের কাছাকাছি নওগাম এলাকার এক পাহাড়ে। আমায় সেখানে যেতে বলেছে, যত শিগ্গীর সম্ভব, কারণ এখন ওখানে থাকলেও, কবে আবার সরতে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল যে, ওখানকার এক পাহাড়ে হানাদাররা আস্তানা গেড়েছে। আজ চারদিন ও তাদেরই আগলে আছে। রুকায়া আন্দাজে বললে জায়গাটা আন্দাজ চল্লিশ মাইল, পাহাড়ী এলাকা ব'লে যেতে লাগবে তিনঘণ্টা।

'যাবে কাল?'

'আমি ?…কোন দুঃখে ? কথা ওর তোমার সঙ্গে।'

হেসে বললাম, 'কিন্তু বিষয়টা তুমি।'

'কি ক'রে জানলে ?'

এবার বেশ জোরেই হাসলাম বললাম :

'স্বামী যখন স্ত্রীর বন্ধুকে আড়ালে ডাকে তখন উদ্দেশ্য ঐ একটাই। আমার জীবনে ও বহুবার ঘটে গেছে।'

'তাহ'লে তো আমার যাওয়া আরও অনুচিত।'

'কেন ?'

'ও কি বলবে জানি না। তুমি কি বলবে তাও জানিনা।'

'আমি জানি।'

'কি বলবে ?'

'যা ও জানতে চাইবে। যতটুকু বা যতখানি। যাবে ?'

ও আবার সেই একই উত্তর দিল, 'না।' তারপর বললে, 'আর তুমিই বা যাবে কেমন ক'রে। ওখানে তো জীপ ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।'

'যদি পাঠায় ?'

'তাহ'লে যেও। বস, ভীড়ের ময়লা গায়ে লেগে আছে। কাপড়টা বদলে আসি।'

রুকায়া ঘরে গেল, আমি বারান্দা ছেড়ে বাগানে নামলাম।

কাশ্মীরের এই বড় দায়, ঘরে কিছুতেই থাকা যায় না। না শীত, না গ্রীষ্ম। প্রত্যেক মরশুমের একটা মন ভোলানো ডাক আছে। বসন্তের তো কথাই নেই। ফুলগুলোয় রামধনু-রঙের বাহার, সৌরভের স্নিগ্ধ আবেশ, প্রজাপতির শাশ্বত আকর্ষণ। এখানে ছিল ও ছাড়াও, ঝর্ণার একটানা সুর, আনত সন্ধ্যায় ঝিল্লির আনন্দ গান আর পপলারের পাতায় পাতায় অল্প বাতাসের মৃদু শিহরণ। আরও ছিল নীল আকাশে একটা মাত্র তারা, কিছু দূরে দুটো নাম-না-জানা পাখী, আরও দূরে প্রকাণ্ড পাহাড় আর তার কোলে

এক রাশ তুলোর মতন ধবধবে মেঘ। আমি গিয়ে বসলাম বাগানের এক কোণে, বড় পাথরটায় হেলান দিয়ে। নিচে ছোট বড় বাড়ি, বাকিটা ধানক্ষেত, সত্যিই কে যেন সোনার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। লোকে বলে সুইজারল্যাণ্ড, আমি বলি শ্রীনগর। পাথরটার ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে রুকায়া বললে :

'আসব ?' হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'আড়ালে কেন ? এসো।' ও সামনে এসে দাঁড়ালো। দমটা আমার বন্ধ হ'য়ে গেল। প'রে এসেছে ওর সেই লাল ঝোব্বা। মাথায় বেঁধেছে রুমাল, কানে ওদের ঝোলানো ঝুমকো আর বেণী বাঁধা চুলের ওপর রূপোর ঝাঁপা।

'চুপ ক'রে থেকো না, লজ্জা করছে। কিছু বল।'

কথা আমার জোগালো না, তাই বললাম :

'পুরাণো কথা, নতুন করে, পুরোপুরি কাশ্মীরি।'

'উহু' আমার পাশে বসতে বসতে বললে : 'হেনা রাতের কাশ্মীরি মেয়ে।'

'সেটা আবার কি ?'

'হেনা রাত হল সব হারাণোর রাত। ওটা আমাদের বিয়ের একটা পর্ব—যেমন তোমাদের ফুলশয্যা।'

আমি দুষ্টুমি ক'রে বললাম :

'কি হয় ?'

যৌবনের জোয়ার আসে আর জীবনের শুরু হয়।'

'তার আগে কি খায় ?'

ও ছেলেমানুষের মতন হাসল, বললে :

'সাহেব হলে কফি আর কাশ্মীরি হ'লে কাবা, চা যদি চাও পাবে না কারণ চাকর নেই, ছেলের সঙ্গে গেছে।'

'চাই না কিচ্ছু।' ওর হাতখানা ধ'রে বলি, 'শুধু চুপ ক'রে

বোস। এই অপূর্ব সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার অনৈক্য সৌন্দর্য মিলিয়ে প্রকৃতিকে আমার প্রণামটা জানিয়ে দি।'

তক্ষুনি ও দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, 'এখানে বসে প্রকৃতির যা দেখা যায় তার ওপর কৃত্রিমতার ছায়া আছে। এমন জায়গা আছে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে ভগবানের রাজ দরবারও দেখা যায়।'

'সত্যি? কোথায়?'

'কাছেই। এসো দেখাচ্ছি।'

বাগান পেরিয়ে, ওদের বাড়ির পেছনে ছোট্ট পাহাড়টার ওপরে উঠলাম। ওপাশে নামলাম কয়েক পা। উইলো গাছের সারি দেওয়া ছোট্ট মাঠ। তারই কিনারায় ও আমায় নিয়ে গেল। বললে:

'দেখ। এই আমার সব পেয়েছির দেশ।'

এতটুকু পথ পেরিয়ে এতখানি অন্য জগতে যে আসা যায় তা যেন ভাবাই যায়না। খানিকটা পাহাড় গড়িয়ে নেমে যাওয়ার পর ছোট বড় কয়েকটা ক্ষেত, আপন খেয়ালে এলোমেলো ছড়ানো। তার প্রান্তে মেঠো পথ, পপলারের সারি, ছোট ছোট লাল ছাদ দেওয়া দু একটা ঘর। তারও ওদিকে পিচ ঢালা কালো রাস্তাটা চলে গেছে এঁকে বেঁকে যখন যেদিকে ইচ্ছে ঘুরে। তার পাশে প্রকাণ্ড ডল লেকের এধারটা। পদ্মের বন। তারই মাঝে মাঝে ঘন সবুজ জলে ভাসা বাগান আর ছোট্ট দেশলাইর বাক্সের মতন দেখা যায় জলের মাঝখানে মহারাণীর শিব মন্দির। কোন একদিন মহারাণী ঐ মন্দিরে প্রতিদিন এক হাজার আটটা পদ্ম দিয়ে প্রণামী দিতেন শিবকে। তার সবটাই যেতো এইখান থেকে। একদম শেষ প্রান্তে, বাঁদিকে হরি পর্বত আর ডান দিকে শঙ্করাচার্য্য। মন্দিরের মাথার ওপর আলোটা মনে হচ্ছে আরও একটা তারা। সব জিনিষটা আমার চোখের তলায় ছড়ানো আছে পটে আঁকা ছবির মতন। ছবি তবু একবার আঁকা হ'লে

শেষ হয়ে যায়। এ ছবি আকাশের খেয়াল খুসির মতন রং বদলায়। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্নও নয়, এ যেন শিল্পীর কল্পনা।

দেখতে দেখতে চোখে জল এলো। অনেকখানি দুঃখে বোবা কান্নার মতন। এ সৌন্দর্য্য দু' চোখে ধরে না, বুকে গিয়ে বেঁধে। মনে পড়ল, আরো একটা আমি আছি, এ জগত থেকে অনেক দূরে, ট্রাম আর বাস আর লোক আর কালো বাজার আর কক্‌টেল আর মিটিং আর আমিত্বের অন্ধকার জীবনে, সভ্যতার বেশ্যাবৃত্তির ঠিক মাঝখানে। সে আমি, সর্বহারা, নিঃস্ব, নিঃশেষিত, এ জগতের সঙ্গে তার এতটুকু যোগ নেই। আরো একটা আমি আছি, ভবিষ্যতের গর্ভে। সে কাল থাকবে নতুন ক'রে হারিয়ে যাওয়ার অসীম বেদনায়। এটা তার হবে, হয়ত সামান্য সঞ্চয় না হয় স্মৃতির সৌধ আর না হয় বহুদিন আগে দেখা আর অনেকখানি ভুলে যাওয়া স্বপ্নের সন্দেহ। রুকায়া সরে গিয়ে বসল লম্বা পপলার গাছটার তলায় মাটির ঢিপির ওপর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। বলল :

'ওদিককার পৃথিবীতে যখন দমবন্ধ হ'য়ে আসে, তখন এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এখানে সময়ের শেষ, স্বর্গের শুরু। এখানে অনন্তের অসীমতাকে দু'চোখ ভ'রে দেখা যায়, মনটাকে মৌন করতে পারলে হয়ত ভগবানকেও ছোঁয়া যায়।'

কথার মাঝখানে আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম পপলার গাছে ঠেসান দিয়ে। ও আমার পায়ের ওপর মাথা হেলিয়ে বলল :

'এই রমিত নিস্তব্ধতা আমার রাজত্ব। এই অসীম শূন্যতা আমার অঙ্গের ভূষণ। এই মাটির মায়া আমার সিংহাসন। এখানে যখন আমি আসি, সবার আগে সময় থমকে দাঁড়িয়ে আমায় প্রণাম করে।'

এতক্ষণ ওর মাথার ওপর আমার হাতে ছিল শুধু স্পর্শের আনন্দ। ও আমার হাতটা চেপে ধরল। তখনই পেলাম

আন্তরিকতার অনুভূতি। ও টান দিয়ে আমাকে ওর পাশে বসার জায়গা ক'রে দিল, বললে:

'দূরত্ব আর আমার সইছে না।'

ওর কাঁধের ওপর মুখটা রেখে বললাম, 'আমার মন কি চাইছে বলব?'

'বলো।'

'তোমার এই জগতকে আমাদের যৌথ প্রণাম জানাতে।'

'জগৎ নয়' ও বললে, 'দেশ। আমার সব পেয়েছির দেশ।'

'আজ শুধু তোমার নয়। আমারও।'

তারপর ও হয়ত অস্পষ্ট বলেছিল, হয়ত শুধু চেষ্টাই করেছিল বলতে:

'আমাদের।'—মনে পড়ছে। বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলবার অবসরই পায়নি।

* * * *

আগে আসার আভাষ দিয়ে চাঁদ উঠল। নিছনি নিরঞ্জনায় আমাদের সব পেয়েছির দেশ সিতি সৌন্দর্য্যে সিক্ত-বসনা সুন্দরীর মতন থমকে দাঁড়ালো। হয়ত তাই দেখে তপস্বী তারাগুলোও অধৈর্য্য আনন্দে ছটফট করল। আমি চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে থাকি বাস্তবের শেষ কোথায় আর কোথায়ই বা স্বপ্নের আরম্ভ?

স্বপ্নই যদি হয় তাতেই বা ক্ষতি কি? একটি সন্ধ্যার বিপল স্বপ্ন বহু রজনীর বিফল ক্রন্দন থেকে মুক্তি। এতে প্রতীক্ষার শেষ না থাক সীমানা তো জানা হল। তাইই বা কম কি? ভেবে দেখলে এ আমার অনেকখানি পাওয়া। এতদিন ছিল শেষের প্রতীক্ষা। এবার আরম্ভ হল প্রতীক্ষার শেষ।

॥ আঠারো ॥

পনেরোই

পাঁচ ছ দিন রুকায়ার সাড়াশব্দই বলতে গেলে পাওয়া গেল না। দশ তারিখ থেকে ও নতুন ক'রে দেশ সেবার কাজে লেগেছে, কাশ্মীরের মহিলা জগতে। ওপর থেকে ডাক এসেছে, একেবারে নিচের থেকে কাজ শুরু কর। ও উঠে পড়ে লেগে গেছে। প্রথমেই ঘর সামলাবার জন্যে মহিলাদের আত্মরক্ষা সমিতি গড়তে হবে অতএব ডাকো মহিলাদের, কর পাড়ায় পাড়ায় মিটিং। গতবার বোর্খা ছাড়া মহিলা ছিল কমই, এখন বোর্খা ঢাকা মহিলা আরও কম, অতএব কাজের কোন অসুবিধা নেই। সারা সকাল যায় আত্মরক্ষা সংস্থা গড়ার কাজে। মহিলা সিটিজেন্স কাউন্সিলের সব ভার ওরই হাতে। দুদিনের মধ্যে সারা কাশ্মীরকে কুড়ি ভাগে ভাগ ক'রে ও ভাগ ভাগ সব চালু ক'রে দিল। গত হামলায় সে সব মহিলা রাইফেল চালাতে শিখেছিলেন তাঁরা লেগে গেলেন স্কুলে স্কুলে গিয়ে মেয়েদের কুচকাওয়াজ শেখাতে। একদিন সকালে ওকে ঠাট্টা ক'রে বললাম, বিশ্বাসই হচ্ছেনা—ঐ ভারি বন্দুক নরম কাঁধে থাকবে কেন? ও আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে গেল ছোট্ট এক কিণ্ডারগার্ডেন স্কুলে। সেখানে ছ সাত বছরের মেয়েরাও দেখি মহানন্দে সমান ওজনের কাঠের বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলেজেতো রীতিমত বুলেট চলছে, তাক্‌মারিতে।

দুপুরটা দোকান সামলানোর কাজ অর্থাৎ কোথাও যাতে কেউ কালো বাজারি না আরম্ভ করে তার ব্যবস্থা। গতবারের অভিজ্ঞতা যে কম নয় তাতো আমার নিজেরই দেখা। চাল উঠে ছিল আঠারো টাকা সের, চিনি বহুদিন কেউ চোখেই দেখেনি। নুন

পাওয়া যেত অনেক খোসামোদ করলে, তাও আঠারো টাকা সের। কেরোসিন ছিল বারো টাকা বোতল, সিগারেট আমি নিজে কিনেছি তিন টাকায় দশটা—ব্র্যাণ্ড, যা আছে তাই, বাছাবাছি চলবেই না। ভালো জুতো ছিলই না, চামড়া হ'লেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। দড়ির যে জুতো দু আনায় পাওয়া যেত তার দাম ছিল দু টাকা। রুকায়া একদিন হেসেই বাঁচেনা। প্রথমেতো কিছুতেই বলবে না, অনেক সাধ্য সাধনার পর সোফায় মুখ লুকিয়ে বললে, সব জায়গায় কেবল দাম বাড়ানোর চেষ্টা, একটা পাড়ায় শুধু দাম কমানোর কম্পিটেশন্ কারফ্যুর জন্যে!

ওদিকে আছে মেয়েদের মধ্যে এ. আর. পির প্রচার, আর আছে অসুস্থদের জন্যে কাপড় জামা জুতো চাদর যা পাওয়া যায় সব, যতখানি সম্ভব এবং যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। মাগামে পাঠাতে হবে প্রায় শ পাঁচেক লোকের জন্যে আর বাটমালুতে বত্রিশ শো। তার চেয়ে শক্ত কাজ হল পোড়া ঘর সারানো আর নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা। আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে কাজে লাগলে তবে গিয়ে অক্টোবরের মধ্যে শেষ হ'বে। তারপর শীতের প্রকোপ, বর্ষার প্রাবল্য আর বরফের প্রসর। সরকার টাকা দিয়েছে সবাইকে কিন্তু কাজ করারও তো লোক চাই। এক সঙ্গে তিনশো বাড়ি—লোক কম, দাম বাড়বেই। সেটা বন্ধ করা, লোক জোগাড় করা আর তাদের সামলানোর ব্যবস্থা করা।

আরও কাজ হল আহতদের ব্যবস্থা করা, প্রসূতিদের দেখাশুনা করা। ওখানে মাত্র তিনটে হাসপাতাল অথচ আহতদের সংখ্যা তিনশোর বেশী। এমনিতেই হাসপাতালে জায়গার অভাব, তার-ওপর আরও তিন শো মানে, এক কথায় যাকে বলে অসম্ভব। সেটা সম্ভব করতে হবে। ওদের ওপর দায়িত্ব শিশুদের আর প্রসূতিদের। যাদের বাড়ি আছে কি থাকবার জায়গা আছে তাদের জন্যে না হয় ডাক্তার আর ওষুধের ব্যবস্থা করলেই হবে।

কিন্তু যাদের ঘর বাড়ি পুড়েছে বাটমালুতে তাদের জন্যে চাই গেরস্ত ঘরের আতিথ্য। পাওয়া শক্ত নয় কিন্তু ব্যবস্থাতো করতে হবে। মেয়ে ডাক্তার এমনিতেই কম তার ওপর একসঙ্গে যদি এতো হয় তখনই হয় বিপদ। অতএব হেলথ্ হোম আর ফার্ষ্ট এডের আড্ডা খুলতে হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় আয় ঠিক করতে হচ্ছে তার ঘর, তার ওষুধ, তার কম্পাউণ্ডার, তার ডাক্তার।

স্কুল খুলেছে অতএব চাই বই। সরকার মাইনে নেয়না, লেখা-পড়া সব অবৈতনিক, প্রাইমারি স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজ পর্যন্ত, বিএ, এমএ, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সব কিন্তু বইটা নিজেদেরই ব্যবস্থা ক'রে নিতে হয়। বছরে একবার না হয় সবাই পারে কিন্তু সাধারণ মানুষদের ক্ষমতা কি যে দুবার কিনবে? তারও ব্যবস্থা হচ্ছে কমিটি ক'রে, ভলেন্টিয়ার খুঁজে, চাঁদা তুলে আর ভিক্ষে ক'রে।

বহু মহিলা ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসেছে স্বামী হারিয়ে। কারো ভাই, কারো গেছে বাবা। আপাততঃ সরকার তাদের দেখছেন ঠিকই কিন্তু সারা জীবন তো আর ও ভাবে চলবে না। অতএব তাদের জন্যে চাই থাকার ব্যবস্থা আর কাজের সুযোগ। যে বাড়ির ছেলে মরেছে হানাদারদের হাতে তাদের সব ভার মহিলা রক্ষা সমিতির হাতে—থাকার ব্যবস্থা, কাজের সুযোগ সব। যারা কিছু কাজ জানে তারা বড় সমস্যা নয় কিন্তু বিপদ হল যারা কিছুই কাজ জানেনা—অথবা গতর খাটিয়ে খাওয়ার শক্তি নেই। তাদের জন্যে খুলতে হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা আশ্রম, মাল্‌টি-পারপাস্ সেণ্টার। তার জন্যে টাকা দিচ্ছে সরকার আর চাঁদা দিচ্ছে বড়লোক, কিন্তু শেখাবার লোক চাই বিনা বেতনে। স্কুলে স্কুলে ঘুরে তার জোগাড়। শ্রীনগরের মহিলা আশ্রম খোলা হল দুদিনের মধ্যে আর ব্যবস্থা হল প্রায় ষাটজনের। আরও একটা চাই দিন দশেকের মধ্যে। ইতিমধ্যে একদিন গিয়ে ও অনন্তনাগের কেন্দ্রটা আর পাট্টনের আশ্রমটাও খুলে এলো।

আর চাই শীতের জন্মে গরম কাপড়, লেপ, কম্বল। খাটের ওপর ছেলেরা পাবে, খোলোর নিচে সবাই পাবে আর পাবে মেয়েরা। পাড়ায় পাড়ায় ক্লোদিং কমিটিও খোলা হয়েছে সারা শ্রীনগর। মাগামে ও আর নিজে গেলনা লোক পাঠিয়েই কাজ সারলো। আরও বহু জায়গা আছে যেমন গুরেজ, বারামূলা, বড়গাম, গুলমর্গ, পাট্টন। প্রত্যেক জায়গার জন্য আলাদা আলাদা সংগ্রাম কেন্দ্র আর প্রত্যেক সংগ্রাম কেন্দ্রের ওপর সতর্ক দৃষ্টি ওর নিজের।

এরই মধ্যে হিসেব হারালে চলবে না, রুকায়া বললে, আরও আছে। এ সব তো গেল দৈহিক প্রয়োজনের তালিকা। এবার ধর মানসিক প্রস্তুতির কাজ। পাড়ায় পাড়ায় মিটিং ডেকে ক্ষতির পরিমাণ বলা, ওদের পাশবিকতার ইতিহাস শোনানো, আমাদের আত্মত্যাগের আদর্শকে তুলে ধরা। শুধু কথায় বললে হবেনা, গান গেয়ে শোনাতে হবে, নাটক ক'রে দেখাতে হবে, ছড়া কেটে ছড়াতে হবে। তার জন্মে চাই লেখক, চাই গায়ক, চাই অভিনেতা আর কবি। এদের নিয়েই যত জ্বালা, এমন গেঁতো যে গুঁতিয়েও কাজ হয় না। এক জায়গায় সব জড় করার জন্মে কালচারল ফ্রণ্ট খুলেছি। সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই চলেনা, সকাতর অনুরোধেও কাজ হয়না, ওদের করতে হয় রীতিমত খোসামোদ। তারও কি বিপদ কম? নাদিম সাহেবকে বললাম, আহা কি লেখেন! আর ব্যাস্, উনি নাটক ছেড়ে আরম্ভ করলেন গীতাঞ্জলির কাব্যানুবাদ। প্রাণ কলকে বললাম, কবিতা কিছু লিখে দাও, তো ও লিখে বসল অপেরা। তার জন্মে চাই মেয়ে—দিলাম। তার জন্মে চাই গায়ক দিলাম। তার জন্মে চাই টাকা—তাও হল। তারপরই দেখা গেল, পাড়ায় না ক'রে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনে। যাদের জন্মে করা তারাই রইল বাইরে আর দেখল পার্ক করা বড় বড় গাড়ি!

এমনি ওর কাজের ব্যবস্থা, দেখলে অবাক মানি। ও অবশ্য বললে, আমি একলা নই, সারা শ্রীনগর আছে আমার সঙ্গে, নইলে

সম্ভব কি এতো বড় দায় ঘাড়ে নেওয়া। আপত্তি ক'রে বলি কাজের কথা বলছি না, বলছি তোমাদের সততার কথা। ও বেশ একটু অবাক হল, দুস্থের সেবা করব সেখানে সততার অভাব হবে, এ আবার কেমন ধারা কথা? সেবা সেবাই সেখানে, স্বার্থ কি? আর কেনই বা? বলতে বাধ্য হলাম ওকে চীন আক্রমণের সময় আমাদের রাজধানীর কিছু কলঙ্ক কাহিনী।

যে কোন কারণেই হক শীতের পুরোপুরি ব্যবস্থা না ক'রেই আমাদের সৈন্যদের পাঠানো হ'য়েছিল হিমালয়ের পাহাড়ে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। দিল্লীর ডিফেন্স কমিটি সারা সহরকে অনুরোধ করল সোয়েটার বুনতে সৈন্যদের জন্যে। ভারতীয় মেয়েদের মন, কাদামাটির চেয়ে নরম। আমাদের ছেলেরা আমাদেরই জন্যে প্রাণ দিচ্ছে আর আমরা এইটুকু পারব না? লেগে গেল সব যে যার সাধ্যমত উল কিনে, আর হাজার হাজার সোয়েটার জমা হল কমিটির সংগ্রহ কেন্দ্রে। পরে জানা গেল যে তার আদ্দেকও বোধহয় যায়নি যাদের জন্যে করা তাদের হাতে। কিছু নাকি চুরি গেল, কিছু নাকি "হারিয়েছে বোধহয়" আর কিছু নাকি পোকাতে কেটেছে। আরও পরে জানা গেল সেগুলো সব কালো বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সোনা সংগ্রহের যে হিড়িক লেগেছিল সেই সময় সে সম্পর্কেও এই ধরণের অনেক কথাই শোনা যায় তবে সত্য-মিথ্যা তার ভগবানই জানেন। সোয়েটারের গল্প শুনেছি সারা সহরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে।

রুকায়া চুপ ক'রে শুনল অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে বলল:

'অভাব আর ঐশ্বর্য্য দুটোই বোধহয় ভগবানের অভিশাপ।'

*　　　　*　　　　*

এমনি ক'রে ও কাজ করে সারাদিন, উদয় থেকে অস্ত আর আমি আমার তথ্য সংগ্রহ ক'রে বেড়াই যখন যেখানে কিছু সন্ধান

পাই। কখন গিয়ে বসি বড় অফিসারের কার্পেট পাতা ঘরে, কখন বুড়ো গ্রামবাসীর ছেঁড়া মাদুরে। একদিন চ'লে গেলাম জয়না-কদলে, যেটাকে বলে ফোরথ্ ব্রীজ। খবর পেয়েছিলাম ওখানে এক বৃদ্ধা আছেন যিনি মেহজুরের স্মৃতির পূজায় আজও হারিয়ে আছেন। ফোর্থ ব্রীজটা গরীব পাড়া, বদনাম কিছু আছে। সকলেই প্রায় বারণ করলেন ওখানে যেতে। হানাদার যা কিছু আছে শ্রীনগরে, আন্দাজ করা যায় যে তারা ঐ পাড়াতেই আছে।

কাজের নেশায় যে মানুষ থাকে কথায় আটকানো তাকে শিবের অসাধ্য। হাজির হলাম সেখানে একদিন সকালে। ভয় কিছু ছিল কিন্তু তাই বলে ভাবনা ছিলনা একরত্তি! অতোবড় ঝড় যখন পেরিয়ে এসেছি তখন সামান্য ঝাপটাতে আর ভাবানা কি?

অনেক গলি ঘোরার পর যখন রাবেয়া খাতুনের সন্ধান পাওয়া গেল একটা নোংরা পচা আধ হাত গলির মধ্যে ছোট্ট একটা সরাইখানার বাসন রাখার ঘরে, তখন পেছনে আমাদের গলি ভর্ত্তি লোক আর তাই দেখে বাজারটাও ভেঙে পড়েছে। ঐ এঁদো গলির মধ্যে আমরা যেন নেংটি ইঁদুরের মতন আটকে পড়েছি। চোখ বুঁজে নিজের রক্তাক্ত মৃতদেহটা ভালো ক'রে দেখে নিলাম। হায় আল্লাহ, কোথাকার ছেলে, কাদের হাতে মরলাম—আর একেবারে পচা গলির মধ্যে? নর্দ্দামাটা দেখে গা বমি দিল। গুলি তো ভাগ্যে কিছুতেই জুটবে না, কিল চড়েই মরতে হবে—আর পড়ি যদি ঐ নর্দমায় তো বমি করেই প্রাণ যাবে। বন্ধু প্রাণ হঠাৎ বললো,

'হাসছেন যে? কি হল?'

'মরতাম যদি গুলি খেয়ে তো শহিদ হয়ে যেতাম। এখানে যদি পড়ি ঐ নর্দমায় তাহ'লে বমি ক'রেই মরব। লোকে বলবে কি?'

'ভীতু!'

'ভয় পেয়েই মরে গেল!'

তখনই দেখা গেল লাল টুপি। পুলিশ এসেই হাতকড়া এগিয়ে বলল,

'দেখি হাত।'

প্রাণ রসিক মানুষ, বললে, 'পুলিশ আবার গণৎকার হল কবে থেকে?'

কাশ্মীরিরা কথায় কম যায় না, হাতকড়াটা বাগিয়ে ধ'রে বললে:

'যেদিন থেকে আপনারা হানাদার হ'য়েছেন:'

তখন ধড়ে প্রাণ এলো। হাতখানা এগিয়ে বললাম,

'স্বচ্ছন্দে! নালিতে মুখ থুবড়ে পড়ার চাইতে, পুলিশের গুতো খাওয়া অনেক ভালো!' তারপর যখন আরো কথায় আমাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তখন লোকগুলো আর হেসেই বাঁচে না। একজন বুড়ো রসিক খালি কপাল চাপড়ালো। কি ব্যাপার? সে বললে:

'ভেবেছিলাম তবু যাহক পাড়ার কিছু নাম হবে—দুটো হানাদার একসঙ্গে ধরেছি! এখন দেখছি বদনাম তো হবেই, আমাদের নিয়ে হাসাহাসিও হবে!' থেমে, মাথা চুলকে বললে:

'তা হবেই যখন হোক—চলুন, হয়রানিটা মাপ করে চা খেয়ে যান।'

সেটা আর হোল না। রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে কথা ছিল। ওঁর বয়স এখন আটাত্তর, বাতে পঙ্গু। সারা সপ্তাহে একটা দিন চার মাইল হাঁটেন প্রতি শুক্রবার। প্রদীপ জ্বালাতে যান মেহজুরের কবরে। বাকি সপ্তাহ গলির মোড়ে ব'সে ভিক্ষে করেন—বেশী নয় তিন ঘণ্টা। যা দুচার পয়সা পান তাই দিয়ে ওঁর জীবন চলে। সরাইখানার বুড়ো মালিক ওঁর কথা সব জানে ব'লে বাসন রাখার ঘরে একটা কোণে থাকতে দেয়।

চেহারাটা আজ ওঁর কঙ্কালসার কিন্তু কোন একদিন ওঁর রূপের জৌলুষে রাজা মহারাজার চোখ ঝলসাতো। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে উনি ছিলেন সারা কাশ্মীরের সেরা সুন্দরী আর কাশ্মীরি শাস্ত্র সঙ্গীত সুফিয়ানা কালামের প্রসিদ্ধ গায়িকা। মেহজুর সাহেব যখন সুফিয়ানা-কালাম লিখতে আরম্ভ করেন কাশ্মীরি ভাষায় তখন আত্মগোপন ক'রে যান এক বন্ধুর সঙ্গে ওঁর ঘরে গান শুনতে। সেই যে রাবেয়া ওঁকে ভালোবাসলো, আজও তা অমলিন আছে।

মেহজুর সাহেব প্রায়ই আসতেন ওঁর গান শুনতে। উনি আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যেতেন। একদিন মেহজুর সাহেবকে রাবেয়া বলল নিজের দেহ বেসাতির কথা। কবি বললেন, ছেড়ে দাও ঐ ঘৃণ্য কাজ। উনি বললেন, ছাড়তে পারি যদি তুমি তার দাম দাও। কবি বললেন, যা চাই। ও চাইল, দিনান্তে একবার দর্শন, একটা গান শোনাবার সময়। তাও, কবিকে যেতে আসতে হবে না, ও গিয়ে শুনিয়ে আসবে। কবি রাজি হলেন। উনি আল্লাহর নামে শপথ করলেন জীবনে কবি আর আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে গান শোনাবেন না।

কিন্তু সমাজ মানবে কেন? গ্রামের মধ্যে বেশ্যা আসবে গান শোনাতে? কখখনো না। কবির স্ত্রী মহতাব বিবি বিদ্রোহ করলেন। কবি তাঁর হাত দুটো ধ'রে বললেন:

'পুরুষের কাছ থেকে সারাজীবন ও শুধু পেয়েছে কলুষ দৃষ্টি আর ঘৃণ্য কলঙ্ক। তুমি দাও ওকে ওর নারীত্বের সম্মান।' মহতাব বললেন, হবে না। শুধু তাই নয়, আর যদি কখন কবি ওর মুখও দেখেন তাহ'লে উনি আত্মহত্যা করবেন।

রাবেয়া খাতুন চ'লে গেল, যাবার আগে ব'লে গেল মহতাবকে —জীবনে সে কোনদিনও আর কবির সঙ্গে দেখা করবে না। আর ব'লে গেল মেহজুরকে, জীবনে কোনদিনও সে নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলবে না। দেখাও হয়নি, ভোলেও নি।

তারপর একদিন কবি মারা গেলেন। তাঁকে কবর দেওয়া হল তাঁর গ্রামে, শ্রীনগর থেকে তেইশ মাইল দূরে। রাবেয়া অভিমানের মুষ্টি তুলে আল্লাহকে অভিশাপ দিল, বললে, 'আল্লাহ! তোর সম্মান আমি জনম ভোর করেছি, সেদিনের পর থেকে তোকে ছাড়া কখন কাউকে গান শোনাইনি! আর সেই তুই আমার সম্মান রাখলি না? কবরে গিয়ে একটা প্রদীপ জ্বালবো তারও পথ রাখলি না? এতদূর যাবো কি ক'রে?' চোখ মুছে আর এক গাল হেসে রাবেয়া খাতুন বললে, 'তখন আল্লাহতালার জ্ঞান হল। তিনদিন পর, কবির মৃতদেহ খুঁড়ে আবার বের করা হল কবর থেকে আর নতুন করে কবর দেওয়া হল, এখান থেকে চার মাইল দূরে, ঝিলামের ধারে।' আজও রাবেয়া সেখানে যায়, প্রতি শুক্রবার একটা প্রদীপ জ্বেলে ওঁর লেখা একটা গান শুনিয়ে আসতে:

তমন্না চ্যানে দিদারুক মাহ ছুপ
ইয়স বরজলে বমরু···
'আবরণের আড়ালে তুমি আছো
তবু আমি তোমায় জেনেছি, তোমায় চিনেছি
সারাজীবন তোমায় আমি খুঁজেছি···
যেদিন আমি নার্গিস হ'য়ে ফুটেছি সেদিন থেকে···
আজও পাওয়া হল না তোমায়···'

কথা শেষ হল কিন্তু স্বপ্নের মায়া হ'য়ে রাবেয়ার সার্থক ভালোবাসা আমার মনে বাসা বেঁধে রইল।

সরাইখানার মালিক বললেন, খুদাতালা জানেন এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি! কবির মৃত্যু সংবাদ শুনে যখন সারা কাশ্মীর ডুকরে কেঁদে উঠল রাবেয়া তখন প্রজাপতির মতন চঞ্চল হ'য়ে উঠল, বললে খুদাতালা আমার দুঃখ আর সইতে পারেন নি তাই মৃত্যুর মাধুরীতে মিলনের প্রহর আনলেন! আর সমাজের সাধ্য

নেই আমাদের মিলনে বাধা দেয়! আবার যখন শোনা গেল ওঁকে গোর দেওয়া হয়েছে মিত্রিগ্রামে—এখান থেকে তেইশ মাইল দূরে, সেদিন খুদাতালাকে পর্যন্ত ও অভিশাপ দিতে কসুর করেনি! 'বলুন মহরা···ওর ভালোবাসার জোর না থাকলে মুসলমানের দুবার কবর হয় কখন?—তাও আবার পীরসাহেবের! ভাবাই যায় না!'

অবাক লাগে—অথচ ব্যাপারটা সত্যি। ও অভিশাপ দিয়েছিল আল্লাহকে এটাও যেমন সত্যি, কবিকে দুবার গোর দেওয়া হয়েছে সেটাও তেমনিই সত্যি। আধুনিক ভালোবাসার স্বরূপ জানি বলেই ওঁর সার্থক ভালোবাসকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে করল। উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'ছিঃ বেটা মাথা ঝোঁকাবি না, ভগবানের কাছেও না, তাহ'লে হেরে যাবি!' আর আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুই সব পাবি! পীরসাহেবের ওপর খোদাতালার অনেক মেহেরবাণী। তাঁর সেবায় এসেছিস্—তুই সব পাবি—সব!'

* * * *

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে একলা ব'সে রেডিও শুনছিলাম। কানটা রেডিওতে ছিল, মনটা রুকায়ার সন্ধানে। দুদিন ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি। খুব ইচ্ছে করছিল আজ ওর সঙ্গে দেখা হক, এখনই, এই শান্ত সমাহিত সন্ধ্যায় আর অনেকখানি সময় হাতে নিয়ে আমরা ঝিলামের বুকে ঘুরে আসি সাহানায় ক'রে। আরও ইচ্ছে করছিল, শীকারায় ও আধ-শোওয়া বসুক হেলান দিয়ে আর আমি ওর সামনে ব'সে ওকে রাবেয়া খাতুনের গল্প বলি—ঐশ্বরীক প্রেমের অবিশ্বাস্য কাহিনী। বুড়ো চাকরটা চা এনে আমায় চমকে দিল। রেডিওতে তখন বলছে গ্রামবাসীদের বীরত্ব কাহিনী।

তখনই জানা গেল দীন মহম্মদের কথা—যে ওদের আসার সংবাদ দিয়েছিল টানমার্গ থানায়। দৈনিক দেড় টাকার দিন মজুর ঐ দীন মহম্মদ চার শো টাকা পেয়েছিল গাইড সংগ্রহ করার জন্যে দারাকাসি গ্রামে। দারাকাসি হল উরি পুঞ্চ-এর মাঝখানে পাকিস্তানি কাশ্মীরের প্রায় লাগোয়া এক ছোট্ট গ্রাম। সেখানে ওরা জড় হয় মাঝরাত্রে আর দীন মহম্মদকে ডেকে বের করে ওর ঘর থেকে। ও টাকা নেয় লোক আনবে ব'লে আর টানমার্গে এসে পাঠিয়ে দেয় ভারতীয় সৈনিক।

ওয়াজির মহম্মদও অমনি ধারা আরও একজন লোক মেন্ধার অঞ্চলে গুলহাটি গ্রামের। ও-টাকা নিয়েছিল প্রাণের ভয়ে আর ওদের আসার সংবাদ দিয়েছিল দেশের টানে। এমনি ধারা নানান খবরে রেডিও উপ্‌ছে পড়ছে। সবই আমার দেশের জয়, আমার গ্রামীন ভাইদের বিজয়। ওরা আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব কিন্তু তবুও মনটাকে ওদের মধ্যে ছড়িয়ে রাখতে পারছি না। প্রবল বাধা হ'য়ে রুকায়া বার বারই সেটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কি হ'ল ওর? কি হ'তে পারে?

ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকল রুকায়া। চুল উস্‌কো খুস্‌কো, একেবারে অন্য চেহারা। মনে হল ওর গাম্ভীর্য্য ছাপিয়ে উঠেছে নিবিড় কিছু ব্যথা, নিষ্ঠুর অনেকখানি বিরক্তিতে। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলাম ঃ

'হঠাৎ? এমন গম্ভীর কেন?'

'বলতে এলাম, কাল আমরা নওগাম যাবো।'

আরও খানিকটা অবাক হ'য়ে গেলাম ;

'কামালের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

'এই সেদিন এতো ক'রে বললাম আ—'

আমায় থামিয়ে দিয়ে ও বললে 'জানি।' থেমে আবার বললে ঃ

'ও ডেকেছে, আমারও দরকার আছে।'

'কি হল ?'

রুকায়া একটু বিরক্ত হ'য়েই বললে, 'যাবে কি না তাই বল ?'

ওর কথা বলার ভঙ্গিমায় আরও অনেকখানি অবাক হলাম। এভাবে আর এ ভাষায় ও কখন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। কিছুটা তাই আহতই হলাম ঃ

'যাবো। ও কি জীপ পাঠাচ্ছে ?

'না।'

'তাহ'লে ?'

'আমিই ব্যবস্থা ক'রেছি।'

এবার আমার অবাক হওয়ার শক্তি হারালো। বললাম ঃ

'বস। কি হ'য়েছে বল তো।'

রুকায়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ব'লে গেল ঃ

'কিচ্ছু না। আটটায় তৈরি থেকো…'

ও চ'লে যাওয়ার পর মনে হল ও এসেছিল আর তখনই আবার ভাবতে আরম্ভ করলাম কেন এসেছিল। কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সবটাই মনে হল যেন অন্তহীন হেঁয়ালি। ওর আসা, ওর কথা, ওরা যাওয়া, কোনটার সঙ্গেই কোন যোগ নেই।…

ভাবনার রেশ টুকরো টুকরো হয়ে গেল পুলিশ গাড়ির সাইরেন শুনে। মার্শাল ল' বহু কালই উঠে গেছে এখন খালি আটটা থেকে কারফ্যু। এর মধ্যে পুলিশ গাড়ি কেন ? আবার কি তবে বিপদ এল একদম অতর্কিতে ? কোথায় ? ক'জন ? ছুটে গেলাম আমার ঘরের জানলায়। মাঠের পাশ দিয়ে একটা ষ্টেশন ওয়াগন গেল আর চার লরী সেপাই। বোঝা গেল বিপদ ঠিকই। কান পেতে রইলাম গুলির আওয়াজের জন্যে। আধঘণ্টা কোন সাড়া শব্দ

নেই। নিঝুম রাত, অসীম নীরবতা। শব্দে আন্দাজ করা গেল যে, গাড়িগুলো কাছেই কোথাও থেমেছে। বেরিয়ে গিয়ে দেখব, এমন উপায় নেই। প্রয়োজন হ'লে নেমে পড়া এক কথা কিন্তু অনেকখানি কৌতূহলের জন্যে এতটুকু রিস্ক নেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মিনিটের পর মিনিট গেল অধৈর্য্য প্রতীক্ষায়। দমটা বোধহয় বন্ধই হ'য়ে আসছে। গুলি যখন চলছে না তখন ওদেরও বোধহয় আমারই মতন অধৈর্য্য প্রতীক্ষা। ওরা তবু ভালো, শত্রুর মুখোমুখি না হ'লেও সামনে। আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। আমরা অজানা আতঙ্কের আড়ালে। এক সময় মনে হল এর চেয়ে গোলাগুলি চলা অনেক ভালো, তাতে তবু কিছু একটা ঘটনার জন্যে মনটাকে তৈরি করা যায়। এ যেন মিনিটে মিনিটে বার বার মরা।

প্রথম গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল রাত এগারোটায়, প্রায় চার ঘণ্টা ঐ ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকার পর; ঠিক কানের কাছে। তারপর পর পর বহু ফায়ার হল, লাইট মেশিন গানের। তারও পর এলো সজোর ঘোষণা লাউড স্পিকারে:

'যারা ভেতরে আছেন নেমে আসুন। আমরা গুলি ছোড়া বন্ধ করেছি দশ গুনবো বলে। দশ গোনার মধ্যে যদি না আসেন আমরা মেশিন গান দিয়ে বাড়িটাই উড়িয়ে দেব। নেমে অসুন। বন্দুক ফেলে অসুন। হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আসুন।

'এক...'

কথাগুলো দুবার বলা হল, একবার ইংরেজিতে একবার উর্দ্দুতে তারপর আরম্ভ হল পলক গোনা।

'দুই...'

কাছেই। আন্দাজে মনে হল আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনে যে বাড়ির লাইন, ঠিক তার পরেই নইলে কথাগুলো অত জোর আর অত স্পষ্ট কিছুতেই শোনা যেতো না।

'তিন…'

এক একটা পলক নয়, যেন এক এক যুগ। সামনের সব বাড়ির আলো নেবানোই ছিল, কোণের বাড়ির এ পাশের ঘরে আলো জ্বলল, বোধহয় একটা বাচ্চাও কেঁদে উঠল আতঙ্কে।

'চার ‥'

শুনছে না, গর্জন করছে? প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে, নীরবতার পাঁচিলে লেগে না দূর আকাশের ধাক্কা খেয়ে কে জানে। কেউ একটা দেশাই জ্বালল কোথাও, কেউ একজন কাশল অনেক কাছে। সত্যিই হয় নাকি ক্যানসার খুব সিগারেট খেলে? বিমলদা কেমন আছেন কে জানে?…

'পাঁচ….'

রুকায়ার আজ হল কি? ও এমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে এলোই বা কেন এই অসময়ে আর যাবেই বা কেন কামালের কাছে ঐ অতদূর? যে মানুষটা স্বামী হওয়া সত্বেও, দৈহিক ভাবে ওর জীবনে শেষ হ'য়ে গেছে দশ বছর, যার স্পর্শ পেলে ওর মনে পড়ে যায় বারামূলার সেই বিভৎস রাত্রে কুকুরের মৃত শিশুর শবদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া—তার কাছে যাওয়ার কি এমন তাগাদা? আমিই কি তার কারণ? বললে না কেন তাহ'লে যদি…

'ছয়…'

কোথায় আমার নিখিলেশ? কত বড় হল? ছ বছরে কত বড় হয়? পাঁচ বছর হল ওকে দেখিনি। পাঁচ নয়, তিন। মাঝে মাঝেই চ'লে যেতাম পার্কের ধারে আর ওকে খুঁজে বার করার খেলা খেলতাম ঐ বয়সেরই নানান শিশুর মধ্যে থেকে। লবসন রাম্পা শুনেছি কোন এক আমেরিকান লেখকেরই ছদ্মনাম। হু'ক, কিন্তু ব্যক্তিগত হার্দিক আদান প্রদানের ব্যাপারে তিব্বতী লামাদের মনোবিদ্যার আলোক দৃষ্টির ওঁর যে অবেক্ষণ আর ঐ ব্যাপারে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তা লিখে রাখার মতন। কাউকে কাছে

পাওয়ার সঙ্কল্পকে যদি অভিভাব করা যায় তাহ'লে অচেনা মানুষও সেই অভিভাবের গ্রাহী হ'য়ে ওঠে। প্রথম যেদিন ওকে চিনে নেওয়ার এই প্রযত্ন করেছিলাম তখন হঠাৎ এক সময় রেলিংয়ের ধারে এসে আমার দিকে অপলক তাকিয়েছিল, হেসেছিল। শিশু নয়, দেবস্বপ্ন, পথ ভুলে এসে পড়েছে এ যুগের পঙ্কিল জীবনে। প্রকাণ্ড বড় টানাটানা চোখে যেন খোঁজার শেষ নেই। কাকে খোঁজে? ও কি বোঝে ও কাকে হারিয়েছে? আর সে ক্ষতির পরিমাণ কতখানি?

অভিভাবের এই খেলার আনন্দে ওখানে যাওয়াটা যেন আমায় নেশার মতনই পেয়ে ব'সেছিল বেশ কিছুদিন। আমার যাওয়া আর ওর এসে দাঁড়ানো দুটোই যেন একাত্মবোধের আর সহজ-প্রবৃত্তির সহজাত খেলা। সেই জন্যেই বাধ্য হ'য়ে ও খেলা আমায় বন্ধ করতে হল। ভুল করলাম কি ওকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে? কিন্তু বাদ তো নয়, চোখ বন্ধ ক'রে মনের জগতে ওকে মেলে ধ'রেছি। আমার দৈনন্দিন জীবনে ও একাত্মবোধে মিশে আছে। আসলে, ব্যবহারিক জীবনের আদান-প্রদান থেকে বাদ দিয়ে ওকে আন্তর্জাত পিতৃস্নেহের অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করলেও তার সংকল্প থেকে ওকে মুক্তি দিয়েছি। যদি আমাদের অব্যক্ত আন্তরিকতার আবেশ সঞ্চার হ'য়ে উঠত, তাহ'লে যে পরিমাণ স্নেহ ভালোবাসা আমি ওকে দিতাম তা আর কেউ কখনই পারতো না। কেউই নয়। আমার সংবেশনী স্নেহ ভালোবাসার স্রোতে আমি ওকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম ওর আজকের বিকল্প বেষ্টনী থেকে অনেক দূরে, অ-নে-ক দূরে, আর ও পড়ে যেত, দোটানার সংপ্লবে। ও ঠিকই ভাবতো এতোখানি ভালোবাসা যে মানুষটা দেয় সে শুধুই অধ্যাস কেন? কেন তাকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না? সেটা হত ওর সুবেদী আত্মার অবদমন। অতটুকু মনে এতো বড় রহস্যের বোঝা কিছুতেই সইতো না। ওর মনটা যেত মরে আর জীবনটা হ'য়ে উঠত হীনতাভাবে অবনত।

তাই আমি নিজেকে সরিয়ে এনেছি অনেক দূরে, ওর নাগালের বাইরে, একদম অজানার অন্ধকারে, যাতে কোনদিনও আমায় জানতে না পারে, চিনতে না পারে, বুঝতেও না পারে। সবাই ওকে বলবে, ওকে বোঝাবে, আমি ক্রুর, আমি কঠিন, আমি কাপুরুষ, নইলে ওর জীবন থেকে আমি ধূমকেতুর মতন মিলিয়ে যাবো কেন? ও তখন আমায় ঘৃণা করবে। তাইই তো আমি চাই। আমি চাই ও আমায় ঘৃণা করুক, অবজ্ঞা করুক ও আমায় অপদার্থ জেনে ওর মন থেকে আমায় নিঃশেষে মুছে ফেলুক—তবেই যদি ও পারে আমার এই অসীম অথচ অব্যক্ত সংবেশনী ভালোবাসা উপেক্ষা ক'রে আর ওর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে আমার দুরাসদ দুঃখ উত্তীর্ণ হ'য়ে ওর অভিশপ্ত জীবনকে জয় করতে। বোঝবার যখন ওর বয়স হবে আর অতীতকে জানবার আগ্রহ তখন যদি ওর থাকে, তাহ'লে আপনিই একদিন আমায় জেনে নেবে। জীবনের শাশ্বত সত্যকে উপেক্ষা ক'রে যাবে এমন শক্তিমান তো ভগবানও নয়। প্রশ্ন শুধু সময়ের।

প্রতীক্ষার আরও একটা সীমা আমার জানা হল। তাই আজ আমি বাঁচতে চাই। নিজের জন্যে নয়, রুকায়ার জন্যে নয়, ওরই জন্যে। আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই আমায় না জেনে ও কতখানি ঘৃণা করেছে। আরও জানতে চাই, কোন একদিন, আমায় জানবার পর, আমার কতটুকু ও ক্ষমা করতে পেরেছে। ওকে জানাবারও কিছু আমার আছে। বেশী নয়, সামান্য। ও আমার কাছে নেই বলে ভগবানও আমার অন্তরে আজ অসম্পূর্ণ; ওর দুর্লভ সাধনায় আনি ঘনায়মান ফাঁসির আগে ঘাতকের মতন একা।

মেশিনগান্ গর্জন ক'রে উঠল—একটা ভলি। কিছু গোঙানির আওয়াজ, কিছু সামরিক আদেশ, তারপরই গর্জন :

'হাত তুলে এসো!'

চমকে উঠলাম। কখনই বা গোণা শেষ হল, কখনই বা মেশিনগান্ চলল আর কখনই বা লোক বেরিয়ে এলো? কে ওরা? কোথায় ছিল। আর কজনই বা?

জানা গেল অল্প পরেই। হাফ-প্যাণ্ট পরা আমাদের ভাইয়াজী, লাঠি হাতে গিয়ে সব জেনে এসেছেন। ওরা একচল্লিশজন হানাদার, সঙ্গে ওদের পাকিস্তানি আর্মির ক্যাপ্টেন অসগর আলি। শ্রীনগর আক্রমণের হেড কোয়ার্টার ছিল ওদের ওয়াজিরবাগে। বাড়িটা রাজার আমলের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারির, তিনতলা, তুমহল। বাইরে ঘরে গৃহকর্তার ছবি ছিল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, জহরলালের সঙ্গে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে, শেখ আবতুল্লাহ, বকসি গুলাম মহম্মদ, আদলাই ষ্টিভেনশনের সঙ্গে। ওদের ওপর ভার ছিল রেডিও কাশ্মীর ধ্বংস, সাদিক সাহেবকে হত্যা আর সেক্রেট্যারিয়েট্ দখল। ওদের কার্য্যকলাপের কোড ছিল ‘মেহজুর’। আরও পরে জানা গেল এয়ারপোর্ট দখলের হানাদারি দপ্তর ছিল বড়গামে আর তাদের কর্তা ছিল ‘বাটারফ্লাই’। এরা সবাই ছিল বারো এ. কে ডিভিশনের লোক। কলকাতা শহরের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি, তাহ’লে বলতে হয় রাইটার্স বিলডিং দখল করার জন্যে লোক বসেছে যত্নবাবুর বাজারে কম ক’রে তিরিশ লরী গোলাবারুদ নিয়ে!

বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স? কোথায় ছিল আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স? কে বন্ধ ক’রেছিল তাদের চোখ মুখ কান?

॥ উনিশ ॥

কামাল সাহেব

শ্রীনগর থেকে নওগাম প্রায় বাহান্ন মাইল পথ। পাকা রাস্তা আছে হাণ্ডওয়ারা পর্যন্ত, তারপরই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা, পাক্কা পাঁচ মাইল। মনের জোর থাকলে তবেই জীপ যায়। এই ভাবে কোন রকমে যদি সান্‌জিপুর পৌছোনো যায় তাহ'লে সেখান থেকে হাঁটা পথে তু'মাইল গেলে তবে নওগাম। পাকা রাস্তাটা জীপের পক্ষে যত ভালো, জীবনের পক্ষে ততই বিপদজনক। শ্রীনগর থেকে পাট্টন পর্যন্ত ভয় নেই, রাস্তার তু'ধারে খালি ক্ষেত। পাট্টন পেরুলেই পাহাড় আরম্ভ হল তু'ধারে। বাঁদিকে ওখান থেকে টানমার্গ পর্যন্ত এখনও হানাদারে ভরা। চিরুনি দিয়ে চুল পরিষ্কার করার মতন পাহাড় পরিষ্কার হচ্ছে। পথে যেতে যেতে গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া যায় আর কোন হানাদার যদি ছিটকে পথের ধারে এসে পড়ে তাহলে স্নাইপিংও হয়।

পাট্টন থেকে মাইল দশেক যদি মৃত্যু এড়িয়ে আসা যায় তাহ'লে বাঁদিকের রাস্তাটা বারামূলায় যায়। চারিদিকে বড় বড় পাহাড়। নাংগা পর্বত, হরমুখ আর কোলাহাই। কোলাহাই পাহাড়টাই দেখবার মতন, ঠিক যেন এক বিশালাকার সিংহী মুখের সামনে একটা ছোট্ট ভেড়া নিয়ে বসে ভাবছে খাবে কি খাবে না। এসব অঞ্চলেও হানাদারদের ছড়াছড়ি। শ্রীনগর থেকে ওদের তাড়িয়ে আনা হ'য়েছে। ওরাই এদিকে এসেছে কারণ বেরিয়ে যেতে হলে এদিক দিয়েই সুবিধে। আমাদের আর্মড পুলিশ এদিক থেকে তাড়া দিয়েছে একদল, আর বারামূলা থেকে এদিকে তাড়িয়ে আনছে আর একদল। এইখানেই ওদের ঘিরে

মারার বেশ বড় সড় ব্যবস্থা। এখানে সারাদিনরাতই প্রায় গোলাগুলি চলছে তবে পথের ধারে নয়, দূর দূর পাহাড়ে এই যা রক্ষা।

রুকায়ার আসার কথা ছিল আটটার মধ্যে। ও আমায় তুলতে এলো একটারও পর। গভীর চিন্তামগ্ন, অনেক প্রশ্ন করলে একটা উত্তর হয়ত পাওয়া যায়। জীবনটা আমার প্রতীক্ষা দিয়ে ঘেরা ব'লেই বোধহয় সময়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখি। সকাল আটটায় তৈরি হয়েছিলাম কৌতূহলের কিছু বোঝা আর কৌতুকাবহ মন নিয়ে। মেজাজটা খারাপ হল দশটা নাগাদ আর একটার সময় যখন ড্রাইভার এসে ডাক দিল তখন চাপা রাগের উত্তাপে অনুরাগের উচ্ছ্বাস পুড়ে বেশ কালো হ'য়ে গেছে। মহিলা গাড়ির পেছনে মাথা হেলিয়ে, ছেঁড়া জীপ-ছাদের বোধহয় ময়লা দেখছিলেন। দেরির জন্যে কোন দুঃখ নেই, কৈফিয়তও নেই। শুধু বললে :

'দেরি হ'য়ে গেল।'

সারা সকাল ঘড়ি দেখে দেখে ওটা ফেলে দেওয়ার মতনই প্রায় পুরোনো হয়ে গেছে। আরও একবার দেখে বললাম :

'হ্যাঁ পাঁচ ঘণ্টা।'

মহিলা শুধু বললেন, 'হুম্!'

এরপর আর কথা হয়নি কোন। দুই গাম্ভীর্য্যের এমন সংঘর্ষ আয়ুব লালবাহাদুরের মিটিংয়ে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

সোপুরটাকে সহর বলতেই হয় কারণ সিনেমা আছে অতএব আছে চায়ের দোকান। নন-কোঅপরেশানের নিদালি নিরবতার দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছিলাম আর আকাশ পাতাল ভাবছিলাম ব'লে সময়ের কোন আন্দাজ ছিল না। চা খাওয়ার জন্যে জীপ থামিয়ে দেখা গেল চারটে বাজে। ওখানে চা খেয়ে, হাণ্ডওয়ারাতে খোঁজ নিয়ে আর ছ মাইল পথ ছ্যাকড়া গাড়ির মতন

ছটকাতে ছটকাতে যখন সান্‌জিপুর পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ওখানে চারজন লোক ছিল আমাদের চৌকি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ও ব্যবস্থাটা শ্রীমতি আগেই ক'রে রেখেছিলেন। পাহাড় উঠতে উঠতে বললাম :

'আজ আর বোধহয় আমাদের ফেরা হবে না?'

অতোগুলো কথার ছোট্ট উত্তর এলো, 'না!'

আর কথা নয়; এখনও ভাবনার বোঝায় কথাগুলো ছোট, এরপর রাগের উত্তেজনায় ছোট কথা বলবে। তার চেয়ে আমাদের পাহারাদারদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম হানাদার সম্বন্ধে।

ওদের কাছ থেকেই জানা গেল যে ধাওয়া করতে করতে ওরা শ' দুয়েক হানাদারকে কোণ ঠাসা করেছে কাছেই একটা পাহাড়ে। গতকাল পর্যন্ত ওরা ছিল সানজিপুর জঙ্গলে, রাত্রে সরে গেছে। আজ সারাদিন খোঁজ করার পর জানা গেছে ওরা আড্ডা গেড়েছে সামনের পাহাড়ে, নাম পুষ্কর পাহাড়। ওটার ওপারেই পীরপঞ্জল। তার নিচেই পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের শুরু। কাজেই এখন উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে গেছে শুধু পুষ্কর পাহাড়ই নয় পীরপঞ্জলের মাথায় ওঠা। তাহ'লে এই এলাকাটা পুরোপুরি আমাদের হাতে আসে আর হানাদার আসার একটা বড় পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। আপাততঃ আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা পুষ্কর পাহাড় থেকে চার মাইল এধারে। আরও জানা গেল, আজ এবং কাল যে কোন একটি দিন বেশ জমাট যুদ্ধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। কেন? ও বললে, আমাদের আন্দাজ ওরা পাহাড়ের ওপর আছে শ দুয়েক লোক আর পাহাড়ের ওপারটা ওদের আওতায় অতএব আরো লোক আসায় বাধা নেই। আমাদের এখান থেকে সরাতে না পারলে ওদের হাজার বারো শো লোক বেরিয়ে যাওয়ার পথ পাবে না। চারিদিকেই এই ঘিরে রাখার খবর শুনে বোঝা গেল আমাদের প্ল্যান হল ওদের সমূলে ধ্বংস করা। লোকটা বললে,

হ্যাঁ। যারা এসেছে তারা যাবে না ; থাকবে মতলব ক'রে যখন এসেছে তখন থাকবেই, সেটা মাটির ওপরে না নিচে সে কথা আলাদা।

আকাশে আলোর আভা আছে আর পায়ের কাছে লাল কাগজ মোড়া টর্চ। এই সব অঞ্চলে একটা দেশলাইর আলোও নাকি মাইল খানেক দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। হানাদার নেই কিন্তু স্নাইপিং-এর কথা কে বলতে পারে? ও প্রায়ই মাঝে মাঝে হয়।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে পথ চ'লেছি। পথের ধারে ধারে কাঠের ছোটখাটো বাড়ি, কোথাও একটা, কোথাও কাছাকাছি দুটো। এখানে চাষ আবাদ হয় পাহাড়ের কোলে কোলে, তবে বেশীটাই কাঠের জঙ্গল। এই জঙ্গলের ঠিকাদারী শালাবাবুর বড় বন্ধু খালেদ সাহেবের। লোকটা বললে, সেই হল যত নষ্টের গোড়া। তারই জন্যে এখান দিয়ে লোক ঢুকেছে হাজারে হাজারে।

পুষ্কর পাহাড় পরিষ্কার করার বেস ক্যাম্পে পৌঁছোনো গেল জমাট বাঁধা সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে। পাহাড়ের গায়ে, গাছের তলায় আর মাটিতে গর্ত ক'রে তার মধ্যে আমাদের ছেলেরা মৃত্যুর মুখোমুখি ব'সে আছে উদার আনন্দে। কামাল সাহেব ছিলেন ছোট্ট ক্যাম্পে। ম্যাপ নিয়ে কি সব বোঝাচ্ছিলেন। আমাদের ঢুকতে দেখে ওঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর যেন ফুৎকারে কে নিবিয়ে দিল। ঘুরে দেখি রুকায়া এক দৃষ্টে ওঁর দিকে চেয়ে আছে।

ওঁর সহচর দুজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। হতবাক হ'য়ে দেখল, যাবে না থাকবে বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না। উনি এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন, অপলক নিস্পন্দ। জমে আসা ঠাণ্ডাতেও ওঁর সার্টের বোতাম গলার কাছে খোলা, আস্তিন গুটোনো, চুল উসকো খুসকো, গভীর চিন্তায় কপালের দাগগুলো যেন ছুরি দিয়ে কেটে বসানো। চোখ দুটো নিষ্পলক, যেন জ্বলছে। হাতের পেনসিলটা

মুহু ঘোরাচ্ছিলেন। কেন জানিনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল পোকা ধরার আগে টিকটিকিদের ল্যাজের ডগাটা কেন নড়ে?

রুকায়া বোধহয় একটু হাসল।

প্রকাণ্ড টানা নিঃশ্বাস ফেললেন কামাল সাহেব। বললেন, 'বসুন।'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন ব'সে পড়লাম। বসেই মনে হল, রুকায়ার হয়ত ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে, তাই বললাম:

'আমি একটু ঘুরে দেখে আসি আপনাদের জীবন প্রণালী।'

'বসুন। আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাবো।' ইঙ্গিতে রুকায়াকে দেখিয়ে বললেন, 'ওঁর সঙ্গে দুটো ঘরোয়া কথা সেরে...'

রুকায়া হেসেই বলল, 'আমারও কিছু কথা আছে...চল...'

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় দেখলাম ওঁর হাতটা রুকায়ার কোমরে। রুকায়া কি শিউরে উঠল? বোধহয়।

গত মহাযুদ্ধে ফ্রন্ট দেখেছি। এটা একেবারে আলাদা। এটা আমার যুদ্ধ। যারা এই পাহাড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে তারা যে কেউ হতে পারত—আমার ভাই, আমার ছেলে। আজ তারা আমি। ঘরে থাকা গেলো না। গাছের নিচে, পাহাড়ের গুহায়, মাটিতে গর্ত ক'রে ওরা ব'সে আছে। মৃত্যুকে মাথার কাছে নিয়ে। অবাক হ'তে হয় ওদের মনের শক্তি আর ধৈর্য্যের সীমা দেখে। যারা পাহারায় থাকে তারা হাজার মশার কামড়ে একবার হাতও তোলে না। যারা পাহারায় নেই তারা অ্যাকশনের অপেক্ষায় অস্থির। খাওয়ার সময় নেই, কাপড় ছাড়ার বালাই নেই, মাঝে মিশিলে, যদি সময় পায় তাহ'লে ছোট ছোট দলে গর্তের মধ্যে গিয়ে চোখ বোঁজে আর গর্তের ওপর মশারি ঢেকে দেওয়া হয়। চোখের দৃষ্টি সজগ, বন্দুক ওদের কাঁধে আর হাসি ওদের মুখে। খবর নিয়ে জানলাম, তিনদিন আগে সময় পেয়েছিল

দু'দণ্ড ব'সে খাবার। এখন যা হয় সব হাতে হাতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে। এরা একদল এসেছে আলিগড় থেকে ইউ পির আর্মড পুলিশ। মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসে এদিক ওদিক থেকে। তখন ঝিঁঝিঁর ডাক থামে, এদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয় আর পাহারার লোকগুলো পাথর হ'য়ে যায়। হাবিলদার বললে ঃ

সাব, আমাদের অনন্ত প্রতীক্ষা—হয় মরবার আর না হয় মারবার। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। এখানে আমাদের দুটো জিনিষই হয়—হয় গুলি খাও, নয় গুলি চালাও।

'বাড়ির কথা মনে হয় না?'

'হয় না? খুব হয়। আধ-মনা। কান্না নয়, শুধু হাসি, আনন্দ। ফেলে আসা দিন নয়, সামনের জীবন। আবার ফিরে যাওয়ার আকর্ষণ। তখনই হাতের নিশানা ঠিক হয়। এখানে, বাবু, সবচেয়ে সহজ মরা, সবচেয়ে শক্ত বাঁচা।'

মনে পড়ল আক্রামউল্লার কথা। ও এসেছিল ৩রা সকালে। একটা দিন পেয়েছিল অবসর। চার তারিখে ভারতীয় কনভয়ের ওপর গুলি চালায়। ও আহত হয়। ডান পায়ে ওর গুলি লাগে। আক্রাম জানতো ওর যখন পালাবার ক্ষমতা নেই তখন হানাদাররাই ওকে মারবে। তাই পায়ের জখম থেকে রক্ত নিয়ে ও বুকের কাপড়ে মাখিয়ে ফেলে। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ও চোখ বুঁজে পড়েছিল দমবন্ধ ক'রে আর মুখ গুঁজে। একজন পা দিয়ে ওকে উলটে বলল, 'বুকে গুলি, মরেছে।'

দলটা চ'লে গেল আর ও পড়ল ধরা। শ্রীনগর বন্দী ক্যাম্পে যখন ওকে বলা হল, ওর বাড়ির ঠিকানা দিলে আর যদি কিছু বলার থাকে বললে রেডিও মারফৎ ওর বাড়িতে সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, ও তখন ছেলেমানুষের মতন হাউ হাউ করে কেঁদে বললে, 'দোহাই সাহেব, ছেলেমেয়েদের কথা বোল না।

কত আশা ছিল মানুষ করব, ভালো করব আর কি হল ? সব নষ্ট হ'য়ে গেল ওদের মিথ্যে কথায়। ওরা বলেছিল, কিচ্ছু হবে না খালি এলেই হবে।

নিঃস্তব্ধ রাত্। সামনের পাহাড়টা বিরাট আকার দৈত্যের মতন ওৎপেতে ব'সে আছে। সামনেই আমাদের সজাগ প্রহরী, একটা গর্তে দাঁড়িয়ে আর সামনে একটা বড় পাথরের ওপর অটোমেটিক রাইফেলটি তৈরি হাতে, প্রস্তর মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। হাবিলদার বললে :

'ওর সামনে শত্রু আর পেছনে কি জানেন ?'

'কি ?'

'সারা ভারত ওর ছোট্ট সংসারের রূপ ধরে ছায়া মেলে আছে।' থেমে বললে, 'তাদের কথা ভেবেই মারবে, তাদের কথা ভেবেই মরবে।'

আমি সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম, ও আমার হাতটা চেপে বললে :

'সর্বনাশ ! ঐ একটী কাঠিতে সারা পাহাড়ে আগুন জ্বলতে পারে, এ পাহাড় ও পাহাড়।'

এখানে সিগারেট খাওয়া চলবে না, জোরে কথা বলা চলবে না, ব'সে খাওয়া চলবে না, পথ চেয়ে হাঁটা চলবে না, কাঁদাও চলবে না। এখানে চলবে খালি গুলি আর এগিয়ে চলবে মানুষ, যদি পারে। হাবিলদার বললে :

'রাত্তিরে তবু অনেক সুবিধে। একটু হাঁটা চলা যায়। সব সময় মনে হয়না যে কারো একটা বন্দুক আমার দিকে তাক করা আছে আর সে ভাবছে এইবার মারি। আর গন্ধটাও কম থাকে, মানে নোংরার। খাওয়া ছাড়া তো জল নেই। তাছাড়া একই কাপড়ে দিনের পর দিন যায়। ময়লা জমে, অনবরত ঘাম হয় আর পিঠেই শুকোয়। স্নানের তো বালাই নেই। নিজের দুর্গন্ধ

তবু সহ্য হয়, কিন্তু…' হেসে বলল, 'ঐ যে সামনের পুষ্কর পাহাড় ওখানে আমরা যাবো আজ নয় কাল নয় পরশু। ভয় করছে। মৃত্যুর নয়। দুর্গন্ধের। অন্যের ময়লা সহ্য হয়না।'

কোথায় যেন চাপা শীষ দিল কেউ। হাবিলদার কথা থামিয়ে কান খাড়া করল। এদিক থেকে কেউ দিল। ওদিক থেকে আবার এলো। ও তখন ঘুরে শীষ দিল, দিকে দিকে তার প্রতিরূপ শোনা গেল। আমি দমবন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'ভয় নেই কিছু,' ও বললে, 'স্কাউট ফিরেছে, সংবাদ আছে।'

'স্কাউট ?'

ও বললে, 'হ্যাঁ। যারা শত্রুর খোঁজ নিতে গিয়েছিল। এবার লোক যাবে রেকি করতে তারপর অ্যাটাক প্ল্যান হবে। চলুন।'

'কোথায় ?'

'সাহেবের ক্যাম্পে।'

ফিরে এসে দেখলাম রুকায়া কোণে বসে আছে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে, একটা কাঠের বাক্সের ওপর আর কামাল রুমাল দিয়ে নিজের মুখ মুছছে। চুলগুলো ওঁর বেসামাল, সার্টের দুটো বোতাম ছেঁড়া। আমি ঘরে ঢুকতেই কামাল সাহেব ঘুরে তাকালেন রুকায়ার দিকে তারপর বাঁ হাতের উল্টো দিকটা দিয়ে ঠোঁটটা পুঁছে বললেন :

'বসুন।'

বসবার আগেই হাবিলদার সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। উনি চোখ তুললেন। হাবিলদার বললে :

'স্কাউট।'

'এখানে ডা…' থেমে গিয়ে বললেন, 'যাও আসছি।' হেসে আমায় বললেন, 'যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কাউকেই বিশ্বাস করিনা।'

হেসে বললাম, 'স্ত্রীর ব্যাপারে তো খুব করেন, দেখছি।'

'করি। কারণ ওখানে সবটাই ভাগ্য। আসছি।

উনি বেরিয়ে গেলেন। রুকায়া আমার দিকে তাকালো। এবার একটা ঝড় ব'য়ে গেছে। চুলগুলো আলুথালু, একটা গোছা চোখের ওপরও পড়েছে। কামিজের কিছুটা ছেঁড়া। রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বললাম :

'লিপষ্টিকটা পুঁছে নাও।'

রুমালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে :

'অপমান কোর'না। এমনিতেই আমি নিজের কাছে অনেক ছোট হ'য়ে আছি।'

'কেন?'

'বললে আরও ছোট হ'য়ে যাবো।'

'শুনি।'

'আজ নয়।'

'কবে?'

'পরে...'

কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত দিতেই ও ছেলে মানুষের মতন কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি সিগারেট ধরালাম সঙ্গোপনে। এ একটা অদ্ভুত সমাবেশ। ভাবছি কামাল সাহেব এসে পড়লে কি ভাববেন আর আমিই বা কি বলব? তখনই খাবার এলো। আমি যেন বাঁচলাম, বললাম :

'দুজনের কেন?'

'সাহেব ওখানে খাবেন।'

'তাহ'লে আমিও।' ওরই সঙ্গে বেরিয়ে এলাম কথা না ব'লে। বলার উপায়ও ছিল না। লোকটাকে আসতে দেখে ও মুখ লুকিয়েছিল হাঁটুর মধ্যে।

বাইরে আসবার আগে লোকটা বলল, 'সাব, সিগরেট!' ফেলে দিলাম। বিপদের সঙ্গে বসবাস ক'রে ক'রে এরা সব

আলাদা মানুষ। আমায় একটা গাছের তলায় বসিয়ে গেল, বড় সাহেবকে খবর দিতে।

সংক্ষেপে যেটুকু কামাল সাহেবের কাছ থেকে শোনা গেল তার মর্মার্থ যে আজ বোধহয় আর বেশী কিছু হওয়ার নয়। তার মানে ওঁদের আরও একদিন অধৈর্য্য প্রতীক্ষা। স্কাউট সংবাদ এনেছে শত্রুপক্ষের লোক আছে আন্দাজ আড়াই শো। ওরা পাহাড়ের ওপর, সামনেটা ওদের সোজা গুলির রেঞ্জে, কাজেই সামনাসামনি আক্রমণ করা মানেই অবধারিত মৃত্যু। ওদের ডান দিকটা পেছনের সৈন্য কভার ক'রে রেখেছে ঠিক পেছনের ছোট্ট পাহাড় থেকে, কাজেই সেদিক দিয়েও অ্যাটাক করা সম্ভব নয়। ওদের বাঁ দিকে খাড়া চড়াই, প্রায় তিনশো ফিট। গোলাবারুদ নিয়ে সে পথে ওপরে ওঠা সেপাইদের সাধ্য নয়। নিরুপায় হয়ে সাহেব লোক পাঠিয়েছেন গ্রামে, যদি তারা কিছু সাহায্য করতে পারে। চারজনের একটা ছোট্ট দল গেছে রেকি করতে, যদি কোন উপায় পাওয়া যায় ওপরে উঠবার। কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়লাম ওঁর ক্যাম্পে। আধ-ঢাকা মোমবাতির আলোর আবছায়া অন্ধকারে রুকায়া শুয়ে আছে দুটো প্যাকিং কেসের ওপর, বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে। উান সস্নেহে ওঁর কোটটা ওর গায়ে চাপিয়ে এক পলক চেয়ে রইলেন। বোধহয় ওঁর ইচ্ছে হল চুলের গোছাটা আলতো ভাবে সরিয়ে মুখখানা একবার দেখে নেন।

আবার আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে আর গিয়ে বসলাম বড় একটা পাথরের ধার ঘেঁসে।

'আপনাকে আসতে বলেছিলাম কিন্তু ব্যস্ততায় সে কথা আমার মনেই ছিল না।'

'আমার ছিল। আর আজ ওই আমায় জোর করে টেনে নিয়ে এল।'

ছোট্ট উত্তর দিলেন কামাল সাহেব, কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে :

'জানি। আমায় ব'লেছে।' হাতের ছড়িটা দিয়ে উনি পাথরটার ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললেন আবার :

'আমিই ওকে আসতে বলেছিলাম।'

এবার আমি ছোট্ট ক'রে বলি, 'ও!'

হয়ত ভেবে নিলেন আমি আরও কিছু বলব, নয়'ত দেখে নিলেন এরপর আর কিছু বলা ঠিক হবে কিনা, তারপর চ'লে গেলেন হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত ; কিছু ভাবলেন এক পলক, তারপর বললেন :

'যে মানুষটা আজ এগারো বছর এক মিনিটের সঙ্গ আমায় কখন দেয়নি সে আজ ষাট মাইল ছুটে এসেছে। কেন জানেন?'

'আপনিই বলুন।'

মৃদু হাসলেন কামাল সাহেব, বললেন :

'তার কারণ, ও আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে।' আমি চুপ ক'রে রইলাম, মুখে কথা জোগালো না।

'জানেন নিশ্চয়?'

জানতাম ঠিকই কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না, রাজ্যের জড়তা বাধা দিল। তাই উত্তরটা এড়িয়ে বললাম :

'আপনি ব'লে যান।'

'সেদিন এটা আমার আন্দাজ ছিল—আপনাকে না দেখেই।' থেমে কামাল সাহেব বলে গেলেন অল্প থেমে থেমে :

'যখন শুনলাম যে ষোল বছর পর ও কাশ্মীরি পোষাক নতুন ক'রে করিয়ে আবার প'রে বেরিয়েছে তখন মন বলল, ওকে হারাণো এবার আমার সম্পূর্ণ হল।'

কামাল সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। আমি বললাম :

'সিগারেট?'

'ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম,' প্যাকেটটা আবার পকেটে পুরলেন। এবার আমার কিছু বলার পালা :

'আপনি তো আমায় চিনতেনও না, জানতেনও না।'

'প্রয়োজনও ছিল না।' সামনের পাহাড়ের দিকে আঙুল চালিয়ে উনি বললেন :

'ঐ যে সামনের পাহাড়টা দেখছেন, ওখানে আমার শত্রু আছে—কখন ওদের আমি চোখে দেখিনি কিন্তু ওরা কে তা জানি, ওদের কি করতে হবে তাও জানি, আর কেন, তাও জানি।' কামাল সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। তারপর বললেন :

'আমি যদি ওদের না মারি তো ওরা আমায় মারবে।' পকেট থেকে রিভলবারটা বার ক'রে রেখে আবার বললেন :

শত্রু আমার সাধনা। তাদের মেরে আমি বাঁচি।'

থেমে গেলেন এক মুহূর্ত। পাশেই ওঁর প্রফাইল। অন্ধকারেই দেখা গেল কানের পাশে চুলগুলোয় পাক ধ'রেছে। মাথাটা অল্প হেলিয়ে উনি পাথরে ভর দিয়ে বসলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, গাঢ় নীল আকাশের তারাগুলো ঝক্‌মক্ করছে। হঠাৎ উনি আবার বললেন :

'আপনাদের যখন একসঙ্গে দেখলাম তখনই বুঝলাম আমার মন ঠিকই বলেছে।'

'হুম্।'

'তাই আমি আপনাকে ডেকেছিলাম।'

'এবার বুঝতে পারছি।'

'কেন জানেন?'

হেসে বলি :

'কেন জানবো না?' থেমে আবার বলি, 'আপনি তো বুঝিয়েই দিয়েছেন।'

'না। আমার আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।'

অবাক হ'য়ে তাকাই কামাল সাহেবের দিকে। স্ত্রীর সাধর্ম্য বন্ধুর মুখোমুখি হ'লে এ অবস্থায় স্বামীরা যে কি ভাবে আর প্রয়োজন হ'লে কি বলে তাতো আমার জানাই আছে। হয়, ওঁর মতন বন্দুক হাতে নিয়ে আর সামনের পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে যা বলেছেন, তাই বুঝিয়ে দেয় আর না হয় বলে, তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তো বিবাহ-বিচ্ছেদে আমার আপত্তি নেই। কামাল সাহেবের আসল কথাটা শোনার আগেই মনে মনে আমার উত্তরটা ঠিক ক'রে নিয়ে বলি : 'বলুন শুনি।'

উনি আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে বললেন :

'আমি আপনার কাছ থেকে ওকে ভিক্ষে চাই।'

দমিত বিস্ময়ে আমার দম্ বন্ধ হ'য়ে এলো। বন্দুক বুঝি, বন্দেজও বুঝি, কিন্তু ভিক্ষা? অবাক হ'য়ে বলি : 'তার মানে?'

'ওর কাছে আমার অপরাধের বোঝা অনেক ভারি। যেদিন ওকে আমি কাছে টেনেছিলাম সেদিন ভালোবাসার ও কিছু বুঝত না আর আমিও কিছু জানতাম না। শুধু জানতাম আমার দেশ, আমার বন্দুক আর আমার নির্য্যাতিত দেশবাসী। ও যখন ভালোবাসা চেয়ে চেয়ে কেঁদে মরল, আমি তখন রইলাম নতুন স্বাধীনতার নেশার উন্মত্ত হয়ে শেখ আবদুল্লাহর পেছন পেছন। সে স্বপ্ন আমার যখন শেষ হল তখন ওর দিকে মন ঝুঁকিয়ে দেখলাম ওর দেহটা আছে মনটা মরেছে। মনে হল ঐ মানুষটাই বোধহয় অমনি ধারা, হিম শীতল, ঠাণ্ডা বরফ, একেবারে নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুল, তাই আবার ঘর ছেড়ে, বাইরের টানে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

আবার অখণ্ড নীরবতা। রাত বাড়ছে, চাঁদ উঠল, তারাগুলো নিষ্প্রভ হল। কোথাও, বহু দূরে একটা বন্দুক গর্জন ক'রে উঠল, তারপর বহু বার। কামাল সাহেব রিভলবারটা তুলে পকেটে রাখতে রাখতে কিছু শুনলেন, কিছু ভাবলেন তারপর বললেন :

'মাঝে মাঝে দেহের তাগিদে ওর দিকে তাকাতাম, কিন্তু তার বেশী নয়। একদিন দেখলাম ও অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে। লেখাপড়া করতে করতে কলেজ পেরিয়ে গেছে, বন্দুক চালাতে চালাতে সুপটু সৈনিকদেরও ছাড়িয়ে গেছে। সমাজ সেবায় ও সবার সেরা; মেয়ে মহলের একেবারে মাথায় উঠে গেছে। বুঝলাম ও সব পারে, পারে না শুধু ভালোবাসতে। মনে হল ও মানুষ নয়, ওর মন নেই, ও একটা ধারালো মেশিন। আমার সে ধারণা আরও স্পষ্ট হল যখন দেখলাম কত ছেলে ওর কাছে ভিক্ষার ঝুলি পেতে ফিরে গেল ব্যর্থ মনোরথে।'

আবার এক ঝাঁক গুলির শব্দ, আরও দূরে। একবার সেদিকে আন্দাজে তাকিয়ে আবার আমায় বললেন:

'তারপর এলেন আপনি। লাল জোব্বার কথা শুনেই মন বললে, আমি ভুল করেছি। যা ভেবেছি ও ঠিক তা নয়। ওকে আপনার সঙ্গে এক পলক দেখেই আমার এক জীবনের ধারণা পাল্টে গেল। সন্দেহের অবকাশ আর বিন্দুমাত্র রইল না। আপনারা আমার চোখের সামনে আসার আগেই দেখলাম ওর ভালোবাসা সৌরভ ছড়াচ্ছে। ঈর্ষার আগুন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল।'

হেসে বললাম, 'বন্দুকটাতো আপনার হাতেই ছিল!'

উনিও হাসলেন, বললেন:

'তা ছিল!'

'তাহলে বলুন, বাধা কি ছিল?'

'ঐ যে বললাম ওর ভালোবাসার সৌরভ। তাই মনে মনে তখনই ঠিক করলাম, আমার আজকের শত্রু-সাধনা শেষ হ'লে যদি বেঁচে থাকি তাহলে ওর সাধনায় আবার নতুন ক'রে মন দেব।'

কামাল সাহেব আবার পাথরটায় ভর দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় ডুব দিলেন। চাঁদটা আরও একটু ওপরে উঠেছে, পৃথিবীর ওপর নতুন রঙের যবনিকা উঠেছে—ধোঁয়াটে নীল।

একটা পাখী অনেক দূরে ডেকে উঠল, বোধ হয় এই নতুন আলোয় ঘুম ভেঙে। মনে হল অনেক কাছে একটা শীষ শুনলাম, খুব চাপা ইশারার মতন। হয়ত ভুলই শুনলাম, কারণ কামাল সাহেব কান দিলেন না। আমায় বললেন :

'তারই ছিল আমার অস্থির প্রতীক্ষা। ইচ্ছে ছিল একটু সময় পেলেই আপনাকে সংবাদ দেব। কিন্তু আর দেরি সইল না কারণ পরশু একটা মৃত্যুর সমন এলো।'

'কি রকম?'

'জীপে ক'রে যাচ্ছিলাম আপনার মুগ্ধতায় ওর কথা ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ স্নাইপারের গুলিতে সামনের কাঁচটা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেল। বুঝলাম, আপনাকে জড়িয়ে ওর কথা ভেবে আমি নিজের মৃত্যু ডাকছি আর দেশের ক্ষতি করছি। এই বিপদের সময় একজন অভিজ্ঞ সৈন্য যাওয়া মানেই অসামান্য ক্ষতি। তাই পরশুই ওকে খবর পাঠিয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে একবার আসতে। এখানে অ-সামরিক মানুষদের আসার নিয়ম নেই। কিন্তু জানেনই তো, যুদ্ধ আর ভালোবাসায় নিয়মের বালাই থাকে না।'

আবার সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন কামাল সাহেব। আমাকেই আবার বলতে হল যে ও নিয়মটা অন্তত: মানতেই হবে। উনি হাসলেন, বললেন :

'জানতাম ও আসবে না। আরও জানতাম যে ও না এলে আমার আজকের প্রতীক্ষা শেষও হবে না কোনদিন। তাই ওর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম একবার এসে একটি কথা আমার শুনে যেতে। তাই ও এসেছে। আপনাকে ভালোবাসে বলে।'

কামাল সাহেব উঠে চ'লে গেলেন আবার ঐ পাহাড়ের কিনারা পর্যন্ত। ওখান থেকেই বললেন :

'আমার অবহেলায় যে মন ওর নিঃশেষে হারিয়েছিল, আপনার মধ্যে সেই মনটা আবার ও খুঁজে পেয়েছে। তার চেয়ে অনেক

বেশী।' থেমে বললেন, 'এটা ওরই মনের কথা, মুখে বলা। আমার নয়।'

এবার উনি এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে, মুখোমুখি। ওঁর প্রকাণ্ড থাবার মতন হাত ছুটো আমার ছুই কাঁধে রেখে আর চোখের ওপর চোখ স্থির ক'রে বললেন :

'ওকে আপনি নতুন করে সৃষ্টি ক'রেছেন। সে ঋণ আমি কোনদিনই ভুলবো না। তাই আপনাকে ডেকেছিলাম আপনার কাছ থেকে ওকে ভিক্ষে চেয়ে নেব ব'লে।···আপনাকে ভালোবেসে ও মুগ্ধ হ'য়েছে বলেই হয়ত আমার প্রতীক্ষা সফল হবে যদি··· আপনি আমায় ভিক্ষে দেন।'

আমার কাঁধের ওপর ওঁর হাত ছুটো চেপে ধ'রে অস্পষ্ট বলি :

'কেন ও কথা বার বার ব'লে আমায় ছোট করছেন?'

আমায় একটু ঝাঁকানি দিয়ে কামাল সাহেব বললেন :

'ছোট করছি না ভাইজান, ভুল বুঝবেন না।'

'তাহ'লে?'

'আপনাকে বোঝাতে চাইছি শুধু যে আপনার ভালোবাসার মধ্যেই আছে আমার মুক্তি।'

এবার ঠিকই শুনলাম। সন্ধ্যার সেই শীষ। উনি পেছন ফিরে তাকালেন তারপর আমায় একটা ক্যাম্প দেখিয়ে বললেন :

'এইটে আপনার আশ্রয়। নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন।'

কামাল সাহেব ত্রস্তপদে চ'লে গেলেন। ক্যাম্পের তলায় একটা মানুষ প্রমাণ গর্ত, মুখটা মশারি দিয়ে ঢাকা। আমি শুয়ে পড়লাম তারই মধ্যে। শ্রদ্ধায় চোখে আমার জল এলো। এইই আসল যোদ্ধা, খাঁটি মানুষ—জয় আর পরাজয় ছুইই যার কাছে সমান, নির্মুক্ত মনের সাধনা। ওঁর কাছে হার নেই, জিৎ নেই, আছে কেবল সামনের দিকে শান্ত মনে এগিয়ে যাওয়া।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিই না।

॥ কুড়ি ॥

পুষ্কর পাহাড়

পাহাড়ের ভোর আর শিশুর ভালোবাসা বোধহয় একই জিনিস। ছুটোই ঐশ্বরিক আনন্দে মন ভ'রে দেয়। প্রত্যূষে যখন নাম না জানা পাখী ডাকল আর নানান গাছের শিশির ভেজা পাতাগুলো আলোর আভাষ পেয়েই উচ্ছ্বসিত আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল তখন চোখ খুলে দেখি ঠিক চারটে। কোন একদিন এমনি এক নেমে যাওয়া রাত আর উঠে আসা দিনের মিলন-বাসরে আমি পৃথিবীতে চোখ মেলেছিলাম। তাই বোধহয় এই সময়টা মন আমার শিশুর সরল আনন্দে আজও ভরে থাকে। সেই আবেশে বাইরে এসে আমি অবাক। কোথাও জনপ্রাণী নেই, কেবল চারজন সশস্ত্র প্রহরী চার কোনে পাথরের মতন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছ থেকেই জানা গেল যে মাঝরাতের অল্প পরেই সদলবলে সব বেরিয়ে গেছে নতুন অভিযানে। ওদের কাছ থেকেই পাওয়া গেল ছু-তিন কথার ছোট্ট চিঠি—'আবার দেখা হবে। কামাল।'

গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম, পাহাড়ের কিনারায়। অল্প আলোর ওড়না গায়ে পাহাড় এখনও আধ-ঘুমন্ত। কুয়াসার জাল বেছানো আছে সামনে, নিচে। সৈন্য নেই, কিন্তু ওদের স্মৃতির সৌধ হ'য়ে আছে কোথাও খালি সিগারেট প্যাকেট, কোথাও ছেঁড়া চিঠি, পায়ের কাছে একটা ভাঙা চিরুনি। আরও আছে, ছু' চারটে আধ পোড়া বিড়ি, একটা পায়ে মাড়ানো দেশলাই-র বাক্স। ওরা এখন কোথায় কে জানে? হয়ত কালকের হাঁবিলদার নেই, কিম্বা সেই লোকটা যে পাহারায় ছিল। হঠাৎ মনে হল তার মুখখানা

জানিনা। তার মুখটা না দেখার জন্য মনে একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। আরও খারাপ লাগলো যখন ঐ হাবিলদারের মুখটাও মনে করতে পারলাম না। থাকতে না পেরে, কোণের পাহারাদারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলতে পারে কিনা। সে শুধুই হাসল। ভাবলো বোধহয় যে আমি পাগল।

আমাদের কথা শুনেই বোধহয়, কোণের ক্যাম্প ঢাকা পাহাড়ের গুহা থেকে রুকায়া বেরিয়ে এলো। হাসলাম। ওটাই অভ্যর্থনা; কালকের কথার পর এই ওর সঙ্গে প্রথম দেখা তাই ঠিক সহজ ভাবে কথা জোগালো না।

ও হেসে বললে, 'ঘুম হ'য়েছে?'

'খুব ভালো।'

কামালের চিঠিখানা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। 'প'ড়ে দেখ।'

ও হেসে বললে:

'জানি। কামাল আমায় ব'লে গেছে।'

'কখন আমাদের যাওয়া?'

'যখন বলবে।'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই তো ভালো,' আমি বললাম, 'বাসি কাপড়, মনটাও যেন নোংরা লাগছে।'

'দাঁড়াও তা হ'লে মুখে চোখে একটু জল দিয়ে আসি।'

ওর ইশারাটা বুঝলাম, বললাম:

'যাও। আমি ঠাণ্ডা সইতে পারি না। রোদ্দুর উঠুক তারপর যাবো।'

রুকায়া চ'লে গেল। আমি আবার আমার ভাবনার জালে জড়াতে আরম্ভ করলাম। তিন দিনের জন্যে এসেছিলাম, দেখতে দেখতে তৃতীয় সপ্তাহে পা দিলাম। এরই মধ্যে তিন জীবনের অভিজ্ঞতা। এসেছিলাম কাজের কোলাহলে। তারই উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়লাম মনের মায়া মিছিলে। গেরুয়া

পরা মনটা, হঠাৎ দেখা গেল, হ'য়ে উঠেছে গাঢ় লাল। কাল পর্যন্ত তাইই ছিল। একটা মানুষের একটা কথায় মনের নতুন রংটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আজ আর গেরুয়াও নয়, লালও নয়, ধবধবে সাদা। ভবিষ্যৎ তার ওপর কি দাগ কাটবে তা ভগবানই জানেন। কোথায় জানি প'ড়েছিলাম, বোধহয় হান সুঁইয়ার বইতে,—যে মানুষ একলা জীবন কাটায়, হয় সে শয়তান আর না হয় ভগবান।' আজ আমি মনে প্রাণে একলা নই অথচ একাকীত্ব আমার বোঝা। এখানে, এই কদিনের মধ্যে ওর কাছ থেকে এমন কিছু পেয়েছি যা জীবনে কখন পাইনি, আবার ওরই জন্যে এমন কিছু হারালাম যা জীবনে আর কখনই আমার পাওয়া হবে না। ভগবান যদি হতাম, ওকে মনের মধ্যে নিয়ে বাকি জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু সেটা যেন কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিনা। পারলে, কালই ওকে মুক্তি দিয়ে দিতাম। শয়তান যদি হতাম, এতক্ষণে কামালের ছোট্ট চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে মাটিতে ছড়িয়ে আমি মাড়িয়ে যেতাম। সেটাই বা পারলাম কোথায়? তাহ'লে আমি কি? কেই বা জানে।

রুকায়ার সঙ্গে কখন আমার কথার অভাব হয়নি। আজ আমরা দুজনেই নিঃস্ব, নিরবকাশ ভাবে নিস্তব্ধ। গভীর অবচেতনার নিভৃত কোণে কে যে কোথায় বিচরণ করছি হয়ত, তা নিজেরাই জানিনা। কখন ভবিষ্যতকে ভয় পেয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরছি কখনও আবার অতীতকে হারাবার ভয়ে ভবিষ্যতকে জয় করতে চাইছি। এরই মধ্যে ছোটখাটো কথা যে বলছি না তা নয়। কিন্তু সেগুলো নিতান্তই তুচ্ছ এবং অহেতুক। সেগুলো নীরবতাকে আরও যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটা যে আমাদের মনটাকে গোপন রাখার গভীর প্রচেষ্টা তা নয়। যে প্রসঙ্গটা প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন

চিহ্নের মতন আমাদের দুজনেরই মনের মুখোমুখি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেটা অবতারণারই এটা অক্ষমতা। বুঝতে পারছি দুজনেই বলি বলি করছি কিন্তু কোথায় যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। ওরও না, আমারও না। পাট্টন পেরিয়ে যখন আর পারা গেলো না তখন রুকায়াই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল :

'কিছু কি বুঝলে ?'

'অনেকখানি।'

'কি ?'

'ও তোমায় নিঃশেষে হারিয়েছিল। আজ নির্মল মনে ফিরে চাইছে।'

রুকায়া ছোট্ট ক'রে উত্তর দিল, 'জানি।'

শ্রীনগরের সান্ধ্য আকাশে অশান্ত মেঘের খেলা। শঙ্করাচার্য্যের চুড়োর ওপরে আলোটাও জ্বলে উঠল। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গেই। গাড়ি এসে থামল ওর দরজায়। ও নেমে যাওয়ার আগে বললাম :

'ও কেন ডেকেছিলো তা জানি। তুমি কেন গিয়েছিলে তা তো বললে না ?'

রুকায়া একটা পা মাটিতে নামিয়েছিল। সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল অন্তহীন। তারপর ঘুরে বললে :

'যে কথা ওকে লুকিয়ে তোমায় বলা উচিত, সেই কথা তোমায় লুকিয়ে ওকে জানাতে গিয়েছিলাম।'

ও চলে যাচ্ছিল, আমি হাতটা চেপে ধরলাম :

'কি ব'লেছ ?'

'সব।'

'সব ?'

'হ্যাঁ সব। সব। সব।' আর দাঁড়ালো না রুকায়া, প্রায় ছুটতে ছুটতেই চলে গেল।

আমাদের সব কথা জেনেও যে মানুষটা আমার কাছে অমন

ভাবে ভিক্ষার ঝুলি পাতলো, তাকে কি বলব ? ভগবান ? নিজের কাছে নিজেকে আবার অনেকখানি ছোট মনে হল। নোংরা, একেবারে ঘৃণ্য। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম ওর তুলনায় আমি একেবারে তুচ্ছ। আমরা প্রেমে পড়ি আর অহঙ্কারের আগুনে পুড়ি। ওর প্রেম ওকে তুলে ধরেছে, নির্মুক্ত প্রাণের পূর্বাকাশে। ও আমার চির প্রণম্য।

বাড়িতে পা দিতেই ভাইয়াজী লাফিয়ে এলেন। রেডিওতে খবর পাওয়া গেছে, পুষ্কর পাহাড় আমাদের দখলে। ওখানে যে শ' দুয়েক পাকিস্তানি সৈন্য ছিল, তাদের মধ্যে আঠারোজন মারা গেছে। তেইশজন বন্দী আর বাকি পালিয়েছে। অসহায় অসহিষ্ণুতায় প্রশ্ন করি :

'আমাদের ? আগে বলুন আমাদের কি হয়েছে ?'

'সাতজন মারা গেছে।'

আমি চেয়ারে বসে পড়লাম, হতবাক। ভাইয়াজী অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলেন :

'কি হল ?'

'কিছু না।'

আমি ঘরে গিয়ে শুলাম। মনের কোন সূক্ষ্ম তারে যখন আমার নাড়া লাগে তখন চোখে জল আসে। সেটাকে আমি কান্না বলি না। বহুকাল পর আজ ছেলেমানুষের মতন কান্নায় ভেঙে পড়লাম বিছানার ওপর। অসহায় নিবেদনে বার বার বললাম, 'ও যেন না হয়....ঠাকুর, ও যেন না হয়।... কামাল ভাই যেন না হয়।...' নিজের জন্যেও এভাবে কখন কিছু চাইনি ব'লেই বোধ হয়, আমার ঐ আকুল ক্রন্দনের সাড়া পাওয়া গেল। দু'দিন পর সংবাদ পাওয়া গেল, পুষ্কর পাহাড়ের পরই আমরা পাকিস্তানি সৈন্য হটিয়েছি পীর-পঞ্জল পাস থেকে। এর ফলে ও পথে হানাদার আসাই বন্ধ হল না, পাকিস্তানের অনেক বেয়াদপিই বন্ধ হ'য়ে গেল।

বহুদিন পর, ফেরার পথে শুনেছিলাম পুষ্কর অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। গ্রামের পাঁচজন লোক নিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী নেমে চলে যায় পুষ্কর পাহাড়ের ঠিক তলায় রাত তিনটের সময়। সেখানে গিয়ে ওরা দুদলে ভাগ হ'য়ে যায়। ঠিক হল, একদল ওদের সামনের দিকে থাকবে এবং এমন ভাবে যুদ্ধ চালাবে যাতে মনে হয় যেন যে ওটা ওপরে উঠবারই জীবন বিপন্ন করা প্রস্তুতি। এই যুদ্ধ আরম্ভ হবে ঠিক যখন অন্য দল বাঁদিক দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ওরাই আগে প্রস্তুত হ'য়ে নেবে আর তারপরই এরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওপরে ওঠা দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গ্রামের লোক, নিঃশব্দে নিঃসাড়ে। ওরা এ তল্লাটে থাকে ব'লে প্রত্যেকটি আঁট ঘাট জানা আছে। ওরা সেপাইদের নিয়ে বাঁদিকে এমন এক জায়গায় গেল যেখান থেকে ওপরে ওঠা যতখানি শক্ত, উঠতে পারলে হানাদারদের আক্রমণ করা ততখানি সহজ। আন্দাজ ক'রে দেখা গেল, পাঁচিলের মতন খাড়া পাহাড় উঠতে হবে প্রায় দুশো ফিট। মাঝে মাঝে খাঁজ আছে, বেরিয়ে আসা পাথরও আছে তবে পুরো পাহাড়টা গা বেয়ে উঠতে হবে, হেঁটে ওঠার উপায় নেই।

নিশুতি রাত। অতএব সামান্য শব্দ করাও চলবে না। অসাবধানে যদি একটা ছোট্ট পাথরও গড়িয়ে পড়ে তাহ'লে ওপারে ওরা জানতে পারবে আর মৃত্যু অবধারিত—একজন নয়, যে কজন আছে সকলের। আলো জ্বালাও চলবে না, যেখানে দেশলাইর আলো দুমাইল দূর থেকে দেখা যায় সেখানে পথ দেখা আলো মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আর সবচেয়ে বিপদ—প্রথমেই দেওয়ালের মতন সোজা পাহাড় প্রায় কুড়ি ফুট। সেটা উঠলে তবে অন্য কথা। সাধারণ নিয়মে এই ধরণের পাহাড় চড়া হয় বঁড়সির মতন লোহার কাঁটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপরে ফেলে দিয়ে।

সেটা যখন শক্ত ভাবে আটকে যায়, পাথরের ধারে কি পাহাড়ের কোন খাঁজে ; তখন দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। এখানে এবং এখন সে পথ বন্ধ। আর এমনি উঠলেই চলবে না। পিঠে আছে জিনিষ, জলের ব্যবস্থা, অল্প খাবার। কোমরে আছে জড়ানো দড়ি আর সঙ্গে আছে বন্দুক আর হাতবোমা। এইসব নিয়ে অতি সন্তর্পনে উঠতে হবে, নিঃশব্দে, নির্ভয়ে, নির্ভাবনায়।

সবাই ইশারায় বোঝালো এ অসম্ভব, কারো ক্ষমতা নেই এ অসাধ্য সাধন করে। ইউ পি আর্মড পুলিশ ট্রেনিং-এ এমন ভাবে পাহাড়ে চড়া কখন শেখানো হয়নি। দরকার হয়নি কখন, হওয়ার কথাও নয়। গ্রামের লোকগুলো তখন এগিয়ে এলো, বললে, প্রথম কুড়ি ফিট তো পাঁচ মানুষের কাজ, ওরাই কাঁধে ক'রে তুলে দিতে পারবে। ব্যস্, বলার সঙ্গে সঙ্গেই একজনের কাঁধে আর একজন তার কাঁধে আরও একজন—এই ভাবে কাঁধে কাঁধে পর পর পাঁচজন দাঁড়িয়ে পড়ল আর তাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল পুলিশ দলের বাইশজন।

দেশ-সেবাটা এমনই নেশা যে একবার মনের মতন স্বাদ পেলে আর পেছিয়ে আসা যায় না। টাকার মায়ায় যেমন কংগ্রেসি কর্মিরা গদিতে আটকে গেছেন তেমনি ঐ নির্জন রাত্রের নির্মুক্তি সাধনায় ওরাও আটকে গেল নিঃশেষে। আর ওরা নামতেই চায় না। এমনি ক'রে প্রায় একশো ফুট উঠে গেল ওরা আধ ঘণ্টার মধ্যে। তখন ওদের আপশোস হল আর একটু আগে আসেনি কেন ? এলে ওরা সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারত বিনা বাধায়—ও দলের সৈন্যদের আর মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হত না পাকিস্তানের সোজা নিশানার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। গেল ওয়ারলেস মেসেজ আর আরম্ভ হল পুষ্কর যুদ্ধের শেষ অঙ্ক।

ওদিকে চলল গুলি বন্দুক, ব্রেনগান, লাইট মেশিন গান আর

একে একে এরা উঠে গেল ওপরে, কাঁধের ওপর দাঁড়ানো মানুষদের সিঁড়ি বেয়ে। ওরা যখন ওপরে উঠে হাতবোমা ফেলল ওদের বাঙ্কারে একেবারে সাত ফুটের মধ্যে গিয়ে তখন দুজন মেশিনগান চালাচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে আর চারজন ব'সে চা খাচ্ছে। এমন নিরাপদ জায়গায় ছিল এরা যে লুঙ্গি প'রে আর চা খেতে খেতেই চালিয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধ, নিচের প্রায় পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে। দেখতে দেখতে হৈ হৈ পড়ে গেল ওদের বাঙ্কারে বাঙ্কারে আর নাইট স্যুট পরা অধিনায়ক সমেত প্রায় দেড়শো লোক পালালো উর্দ্ধশ্বাসে নিচের দিকে। ওরা পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে যেন সহর গড়েছিল ভেতরে ভেতরেই।

হাবিলদার বললে, 'এমন ভাবে পৌঁছে যাবো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি কখন। তাজ্জব ওদের যোশ—ঐ গ্রামবাসীদের—একবার ভাবলো না ওরা কোথায় যাচ্ছে অমন ক'রে।' থেমে হয়ত ভেবে নিল সেই অসম্ভব দিনটির কথা, তারপর বললে :

'সাতজন গেলো বাবুসাব, চারজন নিচে আর তিনজন ওপরে।' থেমে আবার বললে, 'আর জখম হল এগারো।'

'তারা কেমন আছে?'

বিড়িতে ফুঁ দিতে দিতে বললে : 'ভালো!'

বাস চলেছে নৃত্য করতে করতে আর খালি সিটের কুসন পড়তে পড়তে। সারা বাসে যাত্রী আমরা ছজন। তার মধ্যে ওরা তিনজন, যাচ্ছে ছুটিতে—দশ দিনের। প্রশ্ন করি :

'যারা এইভাবে যায়, দুঃখ হয়না তোমাদের? মনে পড়ে না তাদের কথা?'

হাসল হাবিলদার, বললে :

'দুঃখ হয় না বাবুসাব, হিংসে হয়। যারা ভীরু তারা মরে হাজারবার, যারা বীর তারা মরে একবার, ঐ ভাবে।' তবে—একটা টানা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, 'দুঃখ হয় লখনিয়ার জন্যে। সে

ঐ পাহাড়ের ওপর মরল নিচের থেকে আমাদেরই কারোর হাতের গুলি খেয়ে।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ সাব। ওরা ফ্ল্যাগ ওড়াবে তবে তো বন্ধ করব গুলি। ওরা এতো খুশী হয়েছিল যে ফ্ল্যাগ ওড়াতেই ভুলে গিয়েছিল!' থেমে আবার বললে, 'অ বাবুসাব, আরে লখনিয়াকে তো আপনি দেখেছেন!'

'আমি ?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ··সেই যে পাহাড়ের ধারে পাহারা দিচ্ছিল আর আমি বললাম····'

'মনে পড়েছে · '

আরও মনে পড়ল সেদিনকার অস্বোয়াস্তির কথা—ওর মুখটা দেখা হয়নি বলে। আজ নতুন ক'রে মনটা বেদনায় আর অস্বোয়াস্তিতে ভরে উঠল। কেন সেদিন ওর মুখটা আমি দেখিনি। কাপুরুষ দেখেছি—হানাদার। সাধারণ পুরুষ দেখেছি—নিজেকে। বীরপুরুষ দেখেছি—কামাল সাহেব কিন্তু হতভাগ্যের চেহারা কেমন হয় ?

'বড় ভালো লোক ছিল লখনিয়া। বীর। আর স্বভাব কি, যেন জল—কিন্তু বড় বদ নসীব বাবুসাব, বড় বদ নসীব···'

॥ একুশ ॥

আরম্ভের শেষ

পীর-পঞ্জাল আর হাজিপীর যেই হাতে এলো তখনই সব দম ফেলে বাঁচল। নতুন হানাদার আসা বন্ধ, যারা এসেছে তাদের বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ। বলা বাহুল্য, এটা আমাদের সরকারের ঘোষণা। সংবাদটা সুখের এবং হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার মতনই, সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন ওঠে। এই দুটো জায়গা দিয়েই যদি যাতায়াতের পথ হয় এবং আমরা সেটা বড় গলায় বলার মতন ক'রেই জানি তাহ'লে আগে থেকে সাবধান হইনি কেন? আর এটাও যখন জানি যে বেশী লোক এসেছে এইখান দিয়ে তখন পাহারা সত্ত্বেও কি ক'রে তারা এলো তাও নিশ্চয় জানি। সেটা কি? দোষ কারই বা?

সবাই জানে দোষ কার—শুধু সরকারই জানেন না। আর নয়ত জানেন, বলেন না। সাধারণ লোক সারা দেশে যা বলে সেটা অথবা সেগুলো আলোচনা করা মানে মুখ উঁচু ক'রে থুথু ফেলা। কাশ্মীরের কিছু লোক নিশ্চয় ছিল—অমন ধারা কুইসলিং সব দেশেই থাকে, কিন্তু তারা—ঐ শেখ আবদুল্লাহ, বকসি গুলাম মহম্মদ, ঐ শালাবাবু····ওরা তো আর হানাদারদের হাত ধ'রে বর্ডার পার করিয়ে আনেন নি। সেটা সম্ভব হ'য়েছে যারা বর্ডারে ছিল তাদের অপরাধে কিন্তু তাদের অপরাধ সময়মত জানা যায়নি, কেন? এ ব্যাপারে বড় বড় ভারতীয় এবং অ-মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের নামও যে শোনা যায় না তা নয়। সাতজন ব্রিগেডিয়ার আর বারোজন কর্ণেলের নাম তো প্রায় প্রত্যেকের মুখেই শুনেছি। শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব কেশরী নাকি পাকিস্তানে

পালিয়েছেন, একজনকে সাধারণ জোয়ান কুকুরের মতন গুলি করে মেরেছেন পীর-পঞ্জল পাহাড়ে এবং বাকিরা নাকি ধামা চাপা আছে। এদের কথা সরকার অথবা সৈন্য দপ্তর কোনদিনই প্রকাশ করবে না, তবু আমাদের জেনে রাখা দরকার, নাহ'লে বুঝব কি ক'রে যে কংগ্রেসী নেতাদের দুর্নীতির জাত-ব্যবসা স্বাধীনতার পর আমাদের সারা জাতটাকে কোথায় নামিয়েছে!

এইসব নানান আলোচনায় দিন যায়। হানাদারি খবর মাঝে মাঝে আসে তবে সবই সীমান্ত ঘেঁষে। শ্রীনগরের তিরিশ মাইলের মধ্যে সব শান্ত, কখন যে কিছু হ'য়েছে বোঝবারই উপায় নেই। তবে কিছু হানাদার যে সহরের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে সে বিষয় কারো কোন সন্দেহ নেই। সব ব্রীজেই সশস্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে শহর প্রদক্ষিণ। সরকারি দপ্তরে আর সাদিক সাহেবের বাড়িতে সাবধানতার মার নেই। তারই মধ্যে শোনা যায় এখানে লোক ধ'রেছে ওখানে লোক ধ'রেছে—কাউকে সন্দেহে, কাউকে সপ্রমাণে। সারাদিন এই ভাবে জীবন চ'লে—ঐ ধরপাকড়ের কেউ তোয়াক্কাই করে না। দোকানপাট সব খোলা, স্কুল স-কলরবে জীবন্ত, বাজারে সেই দর দস্তুর বিকি কিনি। কেবল আটটা বাজলেই সব অন্ধকার, কারণ সাড়ে আটটা থেকে কারফ্যু। তখন পথে ঘোরে পুলিশ আর বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের কালা ভাইয়াজী। ধরা যে পড়েন না মাঝে মাঝে তা নয়, কিন্তু ওঁর নাকি 'ট্রিক' আছে। সেটা অবশ্য কিছুই নয়, ধরলেই বলেন, উনি সি আই ডি আর ওঁর এক কলেজের চাকতি আছে সেটা স্বচ্ছন্দে দেখিয়ে দেন। আমি বলি, যদি কেউ প'ড়ে ফেলে? উনি হেসেই আর বাঁচেন না, বলেন, সেই আদ্দিকালের মিশনারী কলেজের চাকতি। লেখা যা আছে তা ল্যাটিন ভাষায়। সেই উনিশ শো এগারো থেকে এই পঁয়ষট্টি পর্যন্ত বহু চেষ্টা ক'রে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারলাম না তা ঐ নেংটি পরা পুলিশ···নাও, চা খাও।

এই করি আর করি রুকায়ার অপেক্ষা। যদি সে আসে। সেই যে নেমে গেলো সেদিন তারপর থেকে ওর আর প্রায় দেখাই নেই। মাঝে মাঝে হয়ত দেখা হ'য়ে যায় এদিক ওদিক কি এখানে সেখানে, তখনই ও অজুহাতের ঝড় তোলে আর বলে একাজ, ও কাজ, সে কাজ। কাজ অবশ্যই ও অনেক করছে তবে এটাও বুঝি যে সময় ক'রে সেই আগের ধারায় আসতে না পারার মতন নয়। আমি জোর করি না। মনের মতন কারণ না থাকলে এতোখানি অকরুণ হওয়ার মতন মেয়ে ও নয়। নিজের ইচ্ছেয় যেমন একদিন ও এসেছিল, তেমনিই একদিন ও আবার আসুক আর আমি আমার বলার কথাগুলো ওকে গুছিয়ে বলে দিই—এইটাই আমার অবচেতনার নিবিড় আশা। সেই আশা নিয়েই ওর আসার প্রতীক্ষা করি।

এমনি ধারা নানান চিন্তার ভার নিয়ে একদিন দাঁড়িয়েছিলাম জানলায়—তখন বোধহয় হবে রাত দশটা, হঠাৎ একটা জীপ আসার শব্দ এলো কানে। কারফ্যু দিয়ে মোড়া ঘুমন্ত সহরে জীপের আওয়াজটা প্রথমে ত্রাসেরই সঞ্চার করে, তাই কৌতূহলটা একটু বেশীই হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম জীপটা যেন আমাদের বাড়ির দিকেই এলো। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠিক তাই। ঘাড় বের ক'রে রুকায়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, বোধহয় ভাবল আসবে কি আসবে না তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে চ'লে গেল। দুদিন পর পর ঠিক একই ব্যাপার হল।

তখন অপেক্ষায় রইলাম, এবার যদি আসে তো ধরব কিন্তু আর ও এলো না। তারপর দু-তিন দিন ওর কাজের জায়গায় সন্ধান নিলাম। হয়ত ওর ফিরতে অনেক রাত হয় বলে ওপরে আসতে দ্বিধা বোধ করে; তাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমি জেগেই থাকি। কিন্তু সেখানেও ওর কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। লুকোচুরি খেলায় সাতদিন কাটলো—রবিবার থেকে রবিবার—মানে আটদিন।

আর থাকা যায় না—হয়ত এবার একদিন হঠাৎ চলে যেতে হবে প্লেন সার্ভিস খুললেই তখন কথাগুলো অ-বলাই থেকে যাবে, তাই রবিবার বিকেলে পৌঁছে গেলাম ওর বাড়িতে। দারোয়ান বললে, ও পাহাড়ের ওপর গেছে।

উঠে গেলাম ওপরে। গিয়ে দেখি ওর 'মাটির মায়া' সিংহাসনের ওপর পা তুলে আর হাঁটুতে মাথা এলিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। একবার মনে হল ফিরেই যাই—ওর সব পেয়েছির দেশে আমি পরদেশীর ট্রেসপাশে আর কাজ নেই—কিন্তু ওকে ঐ অসহায়ের মতন ব'সে থাকতে দেখে মানের চেয়ে মায়াটাই বড় হ'য়ে উঠল।

আমায় দেখে ও একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। যেন পাথর। অপলক চেয়ে রইল এমনভাবে যেন জীবনে কখনও পলক ফেলা শেখেই নি। হেসে বললাম ঃ

'পরদেশীকে বসতে বলতে হয়।'

তখন যেন ও প্রাণ পেল, বললে ঃ 'বস।'

আমি গিয়ে বসলাম ওর সিংহাসনে ঠেসান দিয়ে, মাটিতে।

'কি ব্যাপার ?' হাসতে হাসতে বললাম, 'তুমি যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছ !'

'না না···মানে আমার এতো কাজ।'

'জানি। সোমবার আর মঙ্গলবার রাত দশটায় ফিরেছ জীপে ক'রে—সোমবার ছিল শালোওয়ার পরা আর মঙ্গলবার ঐ নীল শাড়িটা···'

'দেখেছ বুঝি ?'

'দুদিনই।'

'কোথায় ?····আমি তো সারাদিন বাড়ির বাইরে যাইনি।'

'গিয়েছিলে। অনেক রাত্রে।'

'তুমি কোথায় ছিলে ?'

'বারান্দায়।'

'ও।' একটা ঘাসের আগা ছিঁড়ে, সেইটা দেখতে দেখতে ও বললে : 'হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

এক চোখ দেখে ও একটা কথাই ছোট্ট ক'রে বললে :

'এমনি।'

হেসেই আবার বলি :

'দরজায় যখন গেলেই, দেখা দিলে না কেন ?'

আবার ও ছোট্ট ক'রে উত্তর দিল—

'এমনি।'

এরপর আর কথা চ'লে না। বাধ্য হ'য়ে চুপ ক'রে বসে চীর্ণ মেঘের চির নতুন খেলা দেখি। কাশ্মীরে এই আকাশ জোড়া সৌন্দর্য্য জীবনেরই প্রক্ষিপ্ত প্রতিরূপ—কখন সাদা, কখন নীল, কখন মেঘে ঢাকা আবার কখন রঙের নেশায় মত্ত! বাদলের শেষ নেই। হঠাৎ এক সময় সুর বদলে রুকায়া বললে :

'কি ভাবছ ?'

'ভাবছিলাম, গেলেই যখন দেখা করলে না কেন ?'

'তোমার কাছে গিয়েও সরে আসাটা সইয়ে নিচ্ছিলাম। তুমি এসেছ, কারণ আমার চেয়ে তোমার মনের জোর অনেক বেশী।'

হেসেই বললাম : 'কামালের তুলনায় কিছুই নয়।'

'ওর কথা থাক।'

'কেন ? এখানেও তো এসেছ ওরই কথা ভাবতে।'

ও ছোট্ট ক'রে বললে, একবার অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে :

'হ্যাঁ।'

'আমিও এসেছিলাম ওর কথা তোমায় কিছু বলতে।'

'বল।'

মনে মনে আরও একবার কামালের নির্মুক্ত মুখখানা স্মরণ

কারি। কিছুতেই তা মনে পড়ল না, কেবল চোখের যে দৃষ্টি দিয়ে ও আমার কাছে দয়া ভিক্ষা ক'রেছিল তারই কিছু ছায়া অন্তর থেকে হৃদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে রইল। আমার ভালোবাসার মধ্যে ও ওর মুক্তি চেয়েছে। রবি ঠাকুর অমিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাষা চেয়েছিল। আমি চাইলাম আরও একটু ভালোবাসা, দেহের সীমানা ছাড়িয়ে যেটা দৈবত। আজ যেমন ক'রে পারি রুকায়ার এই সব পেয়েছির দেশে কামালকে আমি পৌঁছে দেবই দেব। আমার পায়ের কাছে ছড়ানো অশান্ত কাশ্মীর, অসহায় শিশুর মতন মনের কোল জুড়ে বসল। বললাম:

'কি জানো রুকায়া, ওকে তুমি বোধহয় কোনদিনই ঠিক বোঝনি। সাধারণ মানুষ ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তার অনৈক্য রূপ হল দেশ। সেদিন জাফরাণ ক্ষেতে ও তোমায় চায়নি, তোমার মধ্যে ওর কাশ্মীরের প্রতিরূপ চেয়েছিল। তুমি যা ওকে দিয়েছিলে ও চেয়েছিল ওর দেশপ্রেমের সঙ্গে সেটা জুড়ে নিতে। তুমি তা বোঝনি। হয়ত ওই সেটা তোমায় বোঝাতে পারেনি। এটা হল মনের দিক। রইল দেহ। তোমায় ও একদিন কাঠের পুতুল বলেছিল। কেন জানো?'

গাছে ঠেসান দিয়ে রুকায়া অসহায়ের মতন ব'সে কথাগুলো শুনছিল। অস্পষ্ট বললে:

'কেন?'

'কারণ, তোমার দেহ কোনদিনই ওর প্রাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠেনি। পারবেও না কখন। ওর কামনা তো দেহের নয় দেহীর। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে কামনার নির্নীত পূর্তি সম্ভব নয়। ওর দাবী দেহ কখন মেটাতে পারবেই না। তার জন্যে চাই দেশের মাটি—যে প্রেমের পরিবর্তে চায় প্রাণ।...সেই জন্যেই সংসার ওকে বাঁধতে পারেনি, শত্রুর পেছনে ধাওয়া ক'রে ও ছুটে বেড়ায়।'

'কিছুটা বুঝলাম,' হাতের চুড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রুকায়া আমার দিকে না তাকিয়েই বললে :

'বেশীটা মনে হল অতি সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবন চলে না।'

হেসে ফেললাম :

'অসাধারণ হওয়ার এইই বিপদ। দৈনন্দিনের মাপকাটিতে তাদের বোঝা যায় না ব'লে, সবাই ভাবে তারা অমানুষ।' থেমে বলি, 'ক্ষতি নেই তোমাদের ভাষাতেই বলি। আজ দেশের কাছে ওর অনেক দাম। যদি পারো, পঁয়তাল্লিশ কোটির মুখ চেয়ে তুমি ওকে কাছে ডেকে নাও। একজনের মুগ্ধ ভালোবাসায় ওকে তুমি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দিও না। আমার কাছে আমার মূল্য যতই হক, দেশের মাপকাটিতে আমি পঁয়তাল্লিশ কোটির মধ্যে একজন, ও একেবারে আলাদা। অসংখ্য মৃত্যুর ভীড় ঠেলে যেদিন তোমার কাছে এসে ও দাঁড়াবে, শুধু একটা কথাই তুমি ওকে বোল—ভালোবাসি।'

রুকায়া চুপ ক'রে শুনতে থাকে, ঐ প্রকাণ্ড হরি পর্বতের মতন স্তব্ধ আবেশে। আমি কাছে এসে ওর হাতটা ধ'রে বলি :

'আমি নিজে কখন দেশের কথা ভাবিনি। স্বার্থের অন্ধকারেই আমার বেলা গেছে। যেদিন ছোট্ট ক'রে একটুখানি ভাবতে ব'সেছিলাম চাকরি ছাড়ার পর সেদিন আমার অনেক কাছের মানুষরা জীবনের এমন যুদ্ধ শুরু ক'রে দিল যে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। আজ মনে হচ্ছে বাঁচার হয়ত কিছু সার্থকতা পাবো যদি ওকে তোমার জগতে আবার আমি ফিরিয়ে আনতে পারি। আমার দেশের স্বার্থান্ধ মানুষরা কাশ্মীরের যে ক্ষতি করেছে, আমার দিক থেকে এইটাই তার প্রায়শ্চিত্ত।'

ও আস্তে ক'রে বলল :

'আমিও যদি জীবনের যুদ্ধ শুরু ক'রে দি ?'

'তাহ'লে মানুষ পাবে, মন পাবে না। স্নেহ পাবে কিন্তু শ্রদ্ধা পাবে না।'

'কেন?'

'প্রেমের আসল সাধনা হল ত্যাগের সাধনা। সেইখানেই তুমি হেরে যাবে।'

ও ছোট্ট করে বলল 'তুমি কি চাও?'

ওর কাঁধের ওপর আমার হাত দুটো কামালের মতন অসহায় ভাবে রেখে বলিঃ 'ভিক্ষে। তোমার অকুণ্ঠ ভালোবাসার এই ঐকান্তিক দান।'

রুকায়া চুপ ক'রে থাকে। পৃথিবীটাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। অনেক নিচের ধান ক্ষেতে মেয়েরা গান গাইতে কাজ করছিল। হাবা খাতুনের গানের দুটো লাইন কানে এলো।

ভালোবাসে ব'লেই চাঁদ
পৃথিবীতে নেমে আসে না।
ভালোবাসে ব'লেই জাফরাণ ফুল
আকাশে উঠে যায় না ...

ওর উত্তর শুনবার আমার আর সাহস নেই। তাই চ'লে যাবো ব'লে হাতটা নামাতে যাচ্ছিলাম ও হাত দুটো কাঁধের ওপরই চেপে ধরল, বললেঃ

'আর কি কখন আমাদের দেখা হবে না?'

'হবে।' আমি বললাম, 'নিশ্চয় হবে। রোজ হবে। তুমি থাকবে আমার গেরুয়া পরা মনের অনেক আদরের গ্রন্থি। দৈনন্দিনের এতটুকু ক্লেদ কখন তাতে লাগবে না।'

হেসে রুকায়া বললেঃ

'চল, তোমায় কফি খাওয়াবো। বিলেতি নয়। খাঁটি মাদ্রাজি।'

ছেলে ওর মহানন্দে পা ছড়িয়ে ব'সে খবরের কাগজ কাটছিল।

'সর্বনাশ!' রুকায়া বললে, 'ওটা যে আজকের কাগজ। এখনও পড়া হয়নি!' ও হেসে আর হাত বাড়িয়ে এক ফালি কাটা কাগজ দেখিয়ে বললে:

'আমার বাবার ছবি!' মাকে বললে, 'এটা কিন্তু কাঁচের ফ্রেমে আমি বাঁধিয়ে রাখব!'

রুকায়া আমার দিকে তাকালো, কিছু বলল না। ছেলে চ'লে গেল বাবার ছবিটা বুকের ওপর চেপে ধ'রে। রুকায়া পেছন পেছন গেল, কফির ব্যবস্থা করতে। আমি ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম, নিখিলেশ কত বড় হল? ছ' বছর, এবার বোধহয় সাতে পা দিল। সে তার বাবার ছবি কাগজে দেখলে কি করে? চেনে কি? জানে কি? বোঝে কিছু? বলে কি? জানলায় গিয়ে দাঁড়াই। বাইরে পৃথিবী বোবা বেদনায় নিথর। পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের মুখ চেয়ে কামালকে বাঁচিয়েছি। ঐ আধফোটা শিশুর কথা ভেবে নিজেকে বাঁচাবো। আরো ভাবতে থাকি, দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আমি নাটক দেখিয়ে বেড়াই অথচ যে নাটকটা আমার জীবন উবছে পড়ছে, সেইটাই দেখবার লোক নেই, কাউকে দেখাবার সাহসও নেই। আর লখনিয়ার মুখটা না দেখার জন্যে দুঃখ নেই। নিজেরটাই আমার দেখা আছে। কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেললাম। কফির ট্রে নিয়ে রুকায়া ঘরে ঢুকে বললে:

'হাসছ যে?'

অস্পষ্ট জবাব দিলাম:

'কাঁদবো না ব'লে।'

॥ বাইশ ॥

পাকিস্তানের কবর

অস্তাচলের পেছনে সূর্য্য গেলেই আমার অন্তর্দর্শন আরম্ভ হয়। তার কারণ, এটা ঘরে ফেরার সময় অথচ ঐকান্তিক আগ্রহে ঘর বাঁধতে গিয়ে সেটা আমার কোনদিনই হ'য়ে উঠল না। আসলে ঘরটা বোধহয় আমার জন্যে নয়। আমি কি? আজকের সমাজে আমি একটা অপ্রতিহত অসহযোগ আন্দোলন। নিয়মটা আমার কাছে আলস্যের নির্মোক। নির্জিব মানুষরাই অনবরত নিয়মের আফিং খায়। মনে পড়ে গেল, আমার প্রথম চাকরি জীবনে একদল শিল্পীকে ষ্টুডিও থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তারা আমাকে "এখানকার প্রচলিত নিয়ম"-এর হুমকি দিয়েছিল ব'লে। সেই নিয়ে অ্যাসেমব্লিতে প্রশ্নও উঠেছিল। তখন প্রধান অধিকর্তা ল্যাওনেল ফিল্‌ডেন্‌ আমায় বলেছিলেন, সমাজ আর সরকার দুটোই পাথরের প্রাচীর। বিদ্রোহের মাথা ঠুকলে, মাথাটাই যাবে, দেওয়ালটার কিছুই হবে না। দুটোই তাই। মাথাটাই সারা জীবন ঠুকে মরলাম। সরকারের কিছু হয়নি, সমাজেরও না।

তারপর আমি মস্ত একটা পায়ে চলা মানুষ। হিসেব ক'রে দেখলে আদ্ধেকের ওপর কাটিয়ে দিয়েছি পথে পথে। বাকিটাও পায়ে পায়েই খুইয়ে দেব। অনন্ত পথচলা কবে কেন আর কেমন ক'রে আরম্ভ হল আজ অনেক ভাবলেও অস্পষ্টও মনে পড়ে না। জীবনের প্রথম পদক্ষেপে মনে হয়েছিল কোন একদিন আমার সারা জগৎ অফুরন্ত প্রাণ-স্পন্দনে নেচে উঠবে। যা দেখছি, যা শুনছি, যা চাইছি তাইই শুধু নয়, যা কিছু আমার গভীরতম অবচেতনার, আশা আর আকাঙ্ক্ষার অন্ধকারে লুকিয়ে আছে তাও। বস্তুতান্ত্রিক

জগতে যারা বাস করে তারা বাসি ফুলের মতন ভিত্তিহীন, একটু আঘাতেই ঝরে পড়ে। তাই ও জগতটা কোন দিনই মনে ধরেনি। যাঁরা বড় কিছুর লোভে বৈরাগ্যের সাধনা করেন, আমার কাছে তাঁরাও অবান্তর। আমি মাঝখানের পথ নিতে গিয়েই বোধহয় বার বার মার খেয়েছি। আজকের তুনিয়ায় আনন্দে বাঁচতে গেলে হয় মানুষকে হ'তে হয় পুরোপুরি সাধু আর নয় নির্লজ্জ, নির্দয় শয়তান। শেষের সংখ্যাই বেশী। সৌন্দর্য্য, মন, ভালোবাসা এসবই পাগলের প্রলাপ। পাহাড়ের শিখর, জঙ্গলের বিপদ, যুদ্ধের আলোড়ন এসব আমার ভালো লাগে অথচ আর্ত, দীন দরিদ্রের জন্যে চোখে জল আসে। রায়টের ভরা তুপুরে আমি বুলেটের সামনে বুক পেতেছি, আবার কুকুরের কান্না শুনে থমকে দাঁড়িয়েওছি। তুটোই সর্বান্তঃকরণে। ঘর যেমন নিঃশেষ আন্তরিকতায় আঁকড়েও ধরেছি তেমনি অকরুণ অবজ্ঞায় সেটা ছেড়েও এসেছি। যখন ছিলাম, সামনে তাকাইনি; যখন ছেড়েছি, পেছনে তাকাইনি। যাদের এক মুহূর্ত না দেখলে আমার চলতো না, তাদের বছরের পর বছর দেখিনা। নিজেকে নিঃস্ব ক'রে দান করার আনন্দও যেমন আমার, যার কাছে নিজেকে দান ক'রেছি তাকেই আবার নিশ্চিহ্ন ক'রে জীবন থেকে মুছে ফেলাও তেমনি আমারই। এই যে পরস্পর বিরোধী মন ও মতের সমন্বয় আমার কাছাকাছি কোন মানুষই এটা কখন বোঝেনি। তার জন্য আমার তুঃখ নেই; তাদের জন্য আমার দয়া আছে।

আমার আরও একটা বড় অপরাধ, আমি নিজের দিকে নির্দয় ভাবে তাকাতে পারি। সেটা পারি কারণ অন্যের দিকেও সেই ভাবেই তাকাই। কাল আমি কামালের কাছে হেরেছি। আজ আমি রুকায়াকে জয় ক'রে এসেছি। এ তুটোই আমার কাছে সমান গর্বের। এই যে নিজের দিকে না তাকিয়ে আর ভালো মন্দের নিক্তিতে ওজন না ক'রে তুটোকেই সমানভাবে গ্রহণ করা

এটাও কেউ বোঝে না, বোধহয় আজকের জীবনে এটা অচল ব'লে। এটা অচল নয়, আজকের জীবনটাই অচল। আসলে আমরা কেউ জীবিত নই, সবাই জড় পদার্থ।

কারণ, এটা হল জড়তার যুগ। এগিও না। সব সময় জানাও আর নিজেকে জাহির কর। কেবল বল 'আমি'। বিরাট আমি। বিশাল আমি। ব্যাপ্ত আমি। আর কিচ্ছু চাই না, ব্যক্তিগত মতামত না, অনুভূতি না, ভালো মন্দের মূল্যবোধ না। দয়া নয়, মমতা, কৃপা, ভালোবাসা কিচ্ছু নয়। শুধু থাকবে টাকা, যেমন করে পার আনো। আর থাকবে নাম, যেখান থেকে পারো কেনো। যেটা সহজে বোঝা যায় সেটা সাধারণ, যাকে সহজে জানা যায় সে অপদার্থ, যা সহজে পাওয়া যায় সেটা মূল্যহীন। এটা হল দুর্বোধ্য শিল্পের যুগ, দীপিত বিজ্ঞাপনের যুগ, দুরধ্যয় কবিতার যুগ।

কখন যে বাড়ি এসে পড়েছি টের পাইনি। বুঝলাম যখন ভাইয়াজী গেট খুলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন :

'শুনেছেন ?'

'কি ?'

'পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। মাছির মতন ট্যাঙ্ক আসছে।'

'কোথায় ?'

'ছাম্ব-এ' বলে উনি আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বললেন :

'শিগ্গীর চলুন।'

'কোথায় ?'

'খাওয়ার টেবিলে। আলোচনা করতে হবে। অনেক কিছু ভাববার আছে।'

গোল টেবিল ইতিমধ্যেই বসে গেছে। নিচের তলার বাবু এবং বেয়াই বাড়ির দুজন ; বলরাজ, মেহজুর সাহেবের ছেলে আমিন

সাহেব আর পুরোদস্তুর অবসার্ভার হল বুড়ো চাকর। বলাবাহুল্য, প্রধান বক্তা বলরাজ। জানা গেল, আক্রমণ শুরু হয়েছে ভোর রাত্রে আর পাকিস্তানের পুরো আর্মাড ডিভিসন এসে পড়েছে। প্রথম আক্রমণে এসেছে পঁচাশিটা আর পেছনে আছে নাকি দেড়শো। ছামব অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভের প্রথম লক্ষ্য আখনুর, জম্মু আর পাঠানকোট এই অঞ্চলটি অধিকার করা আর প্রধান উদ্দেশ্য কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। পাঠানকোট থেকে যে রাস্তাটা জম্মু হ'য়ে কাশ্মীর গেছে, সেই রাস্তাটা কেটে দিতে পারলে সৈন্য সরবরাহ বন্ধ হ'য়ে যায় আর সাপ্লাই যাওয়াও সম্ভব নয়। এই রাস্তাটা কোন কোন জায়গায়-ভারত-পাক সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইলেরও কম। অথচ, আজ আঠারো বছরের মধ্যেও অন্য একটা রাস্তা পুরোপুরি তৈরি হলনা। খবরে আরও জানা গেল যে, যেখান থেকে আক্রমণ শুরু করা হ'য়েছে সেখান থেকে জম্মু আন্দাজ ত্রিশ মাইল। প্যাটন ট্যাঙ্কের গতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল। পথে যদি বাধাও পায় কিছু তাহলেও, ঐ প্রায় পঞ্চাশ টন চলন্ত লৌহ বিভীষিকার আসতে লাগবে খুব বেশী হ'লে চার ঘণ্টা। মার্কিন যুদ্ধ বিশারদের মতে ওটা অভেদ্য, অজেয়। গত মহাযুদ্ধের প্রায় শেষাশেষি ওটা তৈরি হয়। রাশিয়া তখন মৈত্রী দলে আর জার্মাণীর দম ফুরিয়ে গেছে অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে ওর ঠিকমত পরীক্ষা সম্ভব হয়নি। আমেরিকা নিজে নানান ভাবে পরীক্ষা ক'রে প্রচার ক'রেছিলেন যে, ওটা অজেয় এবং সারা পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট বিরোধী প্রায় সব দেশেই ওরা ওদের ঐ অজেয় ট্যাঙ্ক মুঠো মুঠো ছড়িয়েছে। আন্দাজ করা যায় যে ওঁদের দৌলতে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার ট্যাঙ্ক আমেরিকার বাইরে দেওয়া আছে। এই সব তথ্য শোনার পর আমাদের গোল টেবিলে এইটাই প্রায় স্থির হ'য়ে গেল যে কাশ্মীর আর আমাদের রইলো না।

বুড়ো চাকরটা দুই হাঁটুর ওপর থুৎনি রেখে অবাক জল পান করছিল হতবাক হ'য়ে। এই সব প্যাটন, সিয়াটো আর স্যাটো কিছুই ওর বোঝাবার কথা নয়। আমাদের ব্যাপ্ত নিরাশায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে ও একটা ছোট্ট মন্তব্য করল :

'ভগবান আছেন।'

ভগবান আছেন কিনা আমার জানা নেই কিন্তু কংগ্রেসের ব্যাপক দুর্নীতি সত্বেও আমাদের দেশে যে মানুষ আছে তা প্রমাণ করে দিল আমাদের জোয়ানরা। প্রথম আক্রমণে আমাদের সৈন্যরা পেছিয়ে আসতে বাধ্য হল প্রায় পনেরো মাইল। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ও অঞ্চলে প্যাটন আসবে তা আন্দাজ করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ আয়ুব ওগুলো এনেছিলেন রাতারাতি; সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের প্রস্তুতি ছিল জম্মু পাঠানকোট রাস্তা আগলাবার—যেখানে সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল। তাছাড়া, তিরিশ মাইল পথ এসে পাঁচ মাইল আগলানোর চেয়ে পাঁচ মাইল পথ গিয়ে তিরিশ মাইল আটকানো অনেক সোজা এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

এই যুদ্ধে আয়ুবের হাতে টেক্কা ছিল সাড়ে তিনখানা : প্যাটন ট্যাঙ্ক, সেবার জেট, চীনের বন্ধুত্ব আর কাশ্মীরে ভারতের ব্যস্ততা। প্ল্যানও ছিল সাড়ে তিনটে : (১) প্যাটন দিয়ে সাপ্লাই রুট বন্ধ করে কাশ্মীর অবরোধ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে গিলগিট, বালটিস্থান আর লাদাকের মধ্যে দিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে ব্রজিলা আর যোজিলা পাশ আক্রমণ করা [বিচক্ষণ যুদ্ধবিদ হিসেবে উনি জানতেন যে কাশ্মীরের মধ্যে দিয়ে যদি সাপ্লাই না আসে তাহ'লে ঐ পাহাড়ের উপর পাকিস্তান সৈন্যকে আটকে রাখা ভারতের পক্ষে দশ পনেরো দিনের বেশী সম্ভব নয়। এই ভাবে লেহ যদি পাওয়া যায় তাহ'লে কাশ্মীর পুরোপুরি ঘিরে ফেলা যায়।] (২) সেবার জেট দিয়ে বিয়াস নদীর ওপর ব্রীজগুলো উড়িয়ে দিয়ে আখনুর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত

দখল করে বিয়াসের পারে এসে বসা। (৩) ওদিক থেকে চীনকে দিয়ে ভারত আক্রমণ এবং (৩½) দিল্লীর ওপর অনবরত ইঙ্গ-আমেরিকান চাপ দেওয়া। এ সবই জহরলালের জীবিত কালেও সম্ভব ছিল কিন্তু তখন আয়ুব কিছুই করেননি কারণ জাতীয় নেতা হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে আয়ুবের মনে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তিনি জানতেন জহরলালের একটা ডাকে সারা দেশ এক হ'য়ে দাঁড়াবে।

পাঁচ ফিট আর (বোধহয়) পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের ঐ ছোট্ট খাট্টো মানুষটি যখন গদিতে বসলেন আয়ুব তখন হাতে হাত ঘষে 'কাচ' পরীক্ষায় নেমে পড়লেন আমেরিকা এবং বৃটেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে, লালবাহাদুরের বুকের জোর যাচাই করবার জন্যে। ওখানে পাকিস্তানের লোভনীয় কিছু নেই, ওটা ছিল পুরোপুরি লালবাহাদুরের রক্ত পরীক্ষা। আগেই ঠিক ছিল পরীক্ষা শেষ হ'লেই বৃটেন হাত বাড়িয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দেবে। প্যাটনের ওটা ছিল প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অভিযান—দুটো কারণে—প্রথমত পরখ ক'রে দেখে নেওয়া মালটা কি; আর দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার বুঝে নেওয়ার দরকার ছিল যে ভারতের বিরুদ্ধে ওগুলো ব্যবহার করলে ভারত ঠিক কি করবে। মোটামুটি দেখা গেল লালবাহাদুর গুটিসুটি হ'য়ে যুদ্ধটা থামাবার চেষ্টা করছেন, যুদ্ধ দিয়ে জবাব দিচ্ছেন না। আরও দেখা গেল, প্যাটন একেবারে অজেয়, দরকার হ'লে সোজা দিল্লী চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং প্যাটন ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই ভারত থেমে গেল। আয়ুব আনন্দে গোঁফে তা দিলেন।

অজুহাত যতই বড় হক সোজাসুজি সীমান্ত পেরিয়ে আসা আজকের দিনে পাকিস্তানের পক্ষেও সম্ভব নয়। অতএব আয়ুব পাঠালেন হানাদার। যদি ওতেই কাজ হ'য়ে যায় তো মন্দ কি? আর যদি কোন কারণে না হয় তাহ'লে ঐ গোলাবারুদের মধ্যে

প্যাটন চালিয়ে দিলে ভারত হাঁ হাঁ করার আগেই পাকিস্তানের কাজ হাসিল হ'য়ে যাবে। এ বিষয় ওঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভারত যে মনে প্রাণে যুদ্ধ চায়না তা ওঁর চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। জহরলাল ত' সেই সাতচল্লিশ থেকে কম ক'রে সাতশো বার সেই কথাই প্রমান ক'রে গেছেন। তাই আয়ুবের একটা আন্দাজ ছিল যে ভারত কোপ্‌নী বাঁধতে বাঁধতে উনি কেল্লাটা ফতে ক'রে ফেলবেন।

প্রথমদিন হলও তাই। প্যাটন পৌঁছে গেল পুরো পনেরো মাইল ভেতরে, জম্মুর পনেরো মাইলের মধ্যে। দ্বিতীয় দিন এলো কম—ছ মাইল। ব্যস্‌ ঐ খানেই আটকালো। কি ক'রে আটকালো ? সেটা পুরোপুরি আমাদের জোয়ানদের আত্মবিশ্বাস আর সারা পৃথিবীর বিস্ময়। জোয়ান আমাদের প্যাটন আটকালো —সারমান দিয়ে নয়, সেঞ্চুরিয়ান দিয়েও নয়--জীপ দিয়ে আর বুক দিয়ে।

প্যাটন যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন যে ওটা প্রায় ন ইঞ্চি মোটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি ; ওতে আছে চারটে কামান, ভিতরে থাকে চারজন লোক আর বাইরেটা এমনভাবে তৈরি যে গুলি লাগলে সেটা পিছলে যাবেই। গণ্ডারকে দেখে যেমন বোঝা যায়না তার দেহের দুর্বল জায়গা কোনখানে, ওরও তেমনি। কিন্তু বুদ্ধি থাকলে মানুষ পারেনা কি ? জোয়ানরা জেনে নিল কোথায় ওর দুর্বলতা, আর বুঝে নিল, যে প্যাটনের একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গিয়ে যদি সেই জায়গায় আক্রমণ চালানো যায় তাহলে প্যাটনকে জখম করা সহজ এবং জয়ও করা যায়। প্রথম দিনে তাই লোক মরল অনেক কিন্তু লক্ষ্য ঠিক হ'য়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে সেটার পরীক্ষাও হ'য়ে গেল। এবং তৃতীয় দিন থেকে সেটা হল পুরোপুরি চালু।

কি ক'রে কি হয় তা আমার জানার কথা নয়, যা শুনেছি তাই

বলতে পারি। সেটাও কম কিছু নয়। পুরোণো ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা হল দেখে কামান দাগার। প্যাটনের আধুনিকতম ব্যবস্থা অনুযায়ী দেখার দরকার হয়না। সে কাজটা করে দেয় যন্ত্র। অপারেটর কল টিপে ফটো ইলেক্‌ট্রিক ওয়েভস্‌ চালিয়ে দেয়। সেই ওয়েভ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসে সামনে যে ইস্পাত পায় তার গায়ে লেগে—যে ভাবে বাহুড়, চামচিকে জিনিষ দেখে, অথবা সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সাধারণতঃ ট্যাঙ্কের সামনে থাকে ইস্পাতের বড়সড় ট্যাঙ্ক। কাজেই ইস্পাতের অভাব ঘটে না আর প্রতিধ্বনিও খুব স্পষ্ট ভাবে দূরত্বটা নির্ণয় ক'রে দেয়। সেই অনুযায়ী মেশিনের কাঁটা ঘুরিয়ে কামান চালালেই কেল্লা ফতে। চোখে দেখা আর দরকারই হয়না।

একটা সারমন কি সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্কের তুলনায় সামান্য একটা জীপে আর কতটুকু ইস্পাত? যে যন্ত্র ট্যাঙ্কের গায়ে লেগে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি মাপার জন্য তৈরি সে যন্ত্রে জীপের সামান্য ইস্পাতের প্রতিধ্বনি মাপাই যাবে না। অতএব জোয়ানরা জীপে ক'রে প্যাটন মারার সহজ উপায়টা ঠিক ক'রে নিল। ওরা জীপ নিয়ে থাকত, বড় পাথরের আড়ালে কি গাছের এ ধারে আর সীমানার মধ্যে এলেই সাবড়ে দিতো প্যাটনের দুর্বল জায়গায় গুলি চালিয়ে।

আবদুল হামিদ আরও ভয়ঙ্কর। ও বললে, জীপে তবু সামান্য হলেও ইস্পাত আছে। মানুষের গায়ে তাও নেই। অতএব সোজাসুজি সামনে গিয়ে আক্রমণ করায় ক্ষতি কি? ও এই ভাবেই নষ্ট করতে পেরেছিল তিনটে প্যাটন।

এইভাবে প্যাটনের একটা আক্রমণ আটকানো যায়, দুটোও হয়ত যায় কিন্তু দিনের পর দিন অনন্তকাল ধ'রে যায়না। ওদিকে পাকিস্তান প্রথমতঃ ভাবতেই পারেনি যে প্যাটন আটকে যাবে। নষ্ট হবে সেতো স্বপ্নেরও অগোচর। ওরা পাঁচ তারিখে ঠিক করল,

আরো শ খানেক প্যাটন পাঠাবে ছাম্বে আর সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত জেট আছে সব এক সঙ্গে বোমা ভরে ভরে পাঠিয়ে আখনুর থেকে অমৃতসর পর্যন্ত একদিনে ধ্বংস ক'রে দেবে। দলে দলে যদি দশটা ক'রেও সেবার জেট আসে তাহ'লে দুশোটা সেবার আট শো বোমা ফেলতে পারে চার ঘণ্টার মধ্যে আর তার মধ্যে একশোও যদি জেট যায় তো ক্ষতি কি? কাশ্মীর তো পাওয়া যাবেই। সেইটাই বড় কথা।

এদিকে ভারত ভাবছিল কি করবে? এই নতুন আক্রমণের গুপ্ত সংবাদ পেয়ে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওদের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার যখন সবই ঠিক আমরাই বা আগে খুলবোনা কেন? যদি এমন কোন জায়গায় ওদের ঘা দেওয়া যায় যেখানে ওদের সর্বস্বপণ ক'রে লড়তে হবে তাহ'লে পাকিস্তান নতুন ক'রে আর প্যাটন পাঠাবে না। লাহোর ফ্রণ্ট খুললে প্যাটন না হয় আটকানো যাবে কিন্তু আকাশ আক্রমণ? পাঁচই মাঝ রাতে সংবাদ পাওয়া গেল, রাওলপিণ্ডির দিক থেকে শিয়ালকোট লাহোরের দিকে পুরো মালগাড়ি বোঝাই বোমা আসছে আক্রমণের জন্যে। তারই ওপর তো আকাশ আক্রমণ? দাও ওটাকেই শেষ ক'রে যাতে নতুন ফ্রণ্ট খোলা পর্যন্ত ওদের আটকানো যায়। একবার যদি লাহোর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায় তাহ'লে ঘর সামলাতেই ওরা এতো ব্যস্ত হ'য়ে পড়বে যে আক্রমণের কথা ভাবার সময়ই পাবে না। অতএব রাতারাতি ঐ পুরো ট্রেনটা হল ধ্বংস আর ছয়ই সকালে আমাদের সৈন্য গেল, লাহোর অভিমুখে। সেই কথাই আয়ুব সাহেব রসুলাল্লাহ-র নাম ক'রে বললেন ছ' তারিখ বেলা একটায় তাঁর যুদ্ধ ঘোষণায়।

উনি যে কতটা বিচলিত হ'য়েছিলেন ভারতের এই পাল্টা আক্রমণে তা সেদিনই বোঝা গিয়েছিল ওঁর বেতার বক্তৃতায়। বেলা এগারোটায় ছিল ওঁর বলবার ঘোষিত সময়। প্রতি আধঘণ্টা

অন্তর সেটা পেছুতে পেছুতে গিয়ে পড়ল পাকিস্তান টাইম দেড়টায়। সাণ্ডহার্স্টের মস্ত জাঁদরেল ঐ যুদ্ধবিদ্ রসুলাল্লাহর নাম ক'রে আরম্ভ করলেন তাঁর বক্তৃতা—যা তিনি তাঁর প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবারের বক্তৃতায় কখন করেননি এবং ওঁর গলার কাঁপুনি দেখে মনে হল বুঝি একগলা বরফের মধ্যে বসে কথা বলছেন। ঘড়ি ধ'রে উনি বললেন ঠিক সাড়ে ছ' মিনিট—যদিও সাধারণতঃ উনি বলে থাকেন দশ মিনিট। আমি সুদীর্ঘ পনেরো বছর রেডিওতে কাজ ক'রেছি বলেই বুঝলাম ওঁর মানসিক অবস্থার কথা। অত্যন্ত নার্ভাস না হ'লে কোন বক্তা কখন ওঁর মতন ছ মিনিটের বক্তৃতায় চারবার আটকায় না, আর বার চারেক তোতলায় না। আমাদের গত যুদ্ধে নেতাদের মধ্যে যে কজন বলেছেন ওদিককার আয়ুব থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত, লালবাহাদুর শাস্ত্রীই তাঁদের সকলের চেয়ে সেরা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেতার বক্তা চার্চিলের চাইতে লালবাহাদুর কোন অংশে কম নন। ওঁর বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশী থাকে বিশ্বাসের দীপ্তি, নিজের ওপর এবং যাঁদের বলছেন তাঁদের ওপর। আর থাকে সত্যের ঔজ্জ্বল্য। যা উনি বলতে চান না, তা বলেনই না; অন্যরা নানান রকম কথার জাল বিছিয়ে সত্যকে গোপন করেন বা ঘুলিয়ে দেন। আর থাকে নিষ্ঠা যার ফলে ওর কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আমার আন্দাজ, যদি উনি কখন খুব বড় কোন পরাজয়ের কথাও বলেন তাহ'লেও ওঁর বেতার বক্তৃতা সমান ভাবেই সুখ শ্রাব্য হবে।

ছ তারিখ সন্ধ্যায় কানা ঘুষা সংবাদ পাওয়া গেল যে আমাদের সৈন্য ইছাগোল ক্যানেল পেরিয়ে লাহোর অবরোধ ক'রেছে। এটার আভাষ পাওয়া গেল লাহোর রেডিও ষ্টেশন যখন তিনটের সময় বন্ধ হ'য়ে গেল আর ছটায় চালু হল নতুন ওয়েভ লেনগ্‌থে। লাহোর ষ্টেশনে আমি কাজ ক'রেছি আর ওর ট্র্যান্সমিটার কোথায় আছে

আমার জানা। বোঝা গেল আমাদের এক অভিযানের ধাক্কায় লাহোর রেডিও ছিটকে পড়েছে রাওলপিণ্ডির পথে। মুখে মুখে সংবাদ আসছে নানান রকম। কেউ বলছে বুর্কির পতন হ'য়েছে, কেউ বলছে ইছাগোল পার হ'য়ে গেছি। কেউ বলছে লরেন্স গার্ডেন পৌঁছে গিয়ে হাতাহাতি যুদ্ধেই নেমে পড়েছি। সারা সন্ধ্যা কেটে গেল এই আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে। রাত্রে বলরাজ খবর আনল রফিক সাহেবের মারফৎ যে আমাদের সেনাবাহিনী সত্যিই ইছাগোলের ওপারে পৌঁছে গেছে সরাসরি লাহোরের সদর দরজায়। আরও জানালো যে সহরের ভেতরে ঢোকা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কারণটা যা বলল, তা প্রণিধানযোগ্য। সহর অধিকার করা মানে প্রথমতঃ পাকিস্তানের প্রাণোৎসর্গ প্রচেষ্টার মুখোমুখি দাঁড়ান। এটা একটা যে কোন দেশের, যে কোন সহরের প্রশ্ন নয়, পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রেসটিজের প্রশ্ন। এখানে পাকিস্তান লড়বে মরিয়া হ'য়ে। মাঠে, পাহাড়ে যুদ্ধ এক জিনিষ, সহরের পথে গলিতে যুদ্ধ আর এক জিনিষ। ওরা বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ চালাবে আর সামনে রাখবে বে-সামরিক জনতা। আমাদের তখন বাধ্য হ'য়ে বে-সামরিক জনতাকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিতে হবে, ফলে অসহায় নির্দোষ প্রাণহানী হবে। এতে আমাদের কম ক'রে দু ডিভিশন সৈন্য ওখানে অযথা আটকে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যদি সহরটা দখল করাই হয় তাহলে সহরের পুরো ভার নিতে হবে আর কম ক'রে দশ বারো লক্ষ লোকের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ ওদের গরিলা যুদ্ধের পাল্টা জবাব সামলাতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা আজ অধিকার করলেও একদিন ছাড়তেই হবে। তাহ'লে কি দরকার এই অযথা দু'পক্ষের প্রাণহানীর? তবে, আনন্দে অধীর হ'য়েই ও বলল, লাহোর এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠিক পর মুহূর্তেই ওর মনটা যেন ভেঙে তুবড়ে একাকার হ'য়ে গেল। ওর মনে পড়ে গেল দুমাস

আগে ওর পাকিস্তান ভ্রমণের কথা—ওর ছেলেবেলাকার এলানো ছড়ানো স্মৃতির উজাড় করা আনন্দ। সত্যি, ও বললে, বৃটেন এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে আমাদের দুই দেশকে জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছে। যার সঙ্গে সুখে দুঃখে মানুষ হয়েছি, আনন্দে হেসেছি, দুঃখে চোখের জলে ভেসেছি আজ তাকেই আমাকে মারতে হচ্ছে আজ তারই জীবন বিপন্ন করে আমরা আনন্দ করছি। যুদ্ধের রীতি পাল্টে দেওয়া উচিত। টেনিসের ডেভিস কাপের মতন উচিত সৈন্যদের মধ্যে থেকে বাছা বাছা কিছু লোক নিয়ে কম্পিটেশন করা—ওয়ার অলিম্পিক। সে দেশ সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তারাই পৃথিবী চালাবে পাঁচ বছর। আমরা টিকিট কিনে সৈন্য অলিম্পিক দেখব। আর না হয় করা উচিত আয়ুব, লালবাহাদুর, কসিগিন, উইলসন প্রমুখ নেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—যেমন কে কত মিথ্যে কথা বলতে পারে (উইলসন), অথবা কে কত গালাগাল দিতে পারে (ভুট্টো), কিম্বা কে কত লম্বা চওড়া মিথ্যা হুমকি দিতে পারে (চাউ-এন-লাই) ইত্যাদি ··

ঠাট্টা যতই করি যুদ্ধ যুদ্ধই। তিনদিন পর আবার কানে কানে খবর এলো আমাদের সৈন্য লাহোর সেক্টার থেকে স'রে আসতে বাধ্য হ'য়েছে। কারণটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যেটুকু শোনা গেছে তাতে জানা যায় যে আমাদের লাহোর অভিযান হ'য়েছিল তিন দিক থেকে আর ঠিক ছিল চক্রাকারে লাহোর অবরোধ করা হবে—তার মানে, ডাইনে আর বাঁয়ের ষে সৈন্যদল তারা একটু বেশী এগুবে আর মাঝখানের দল কিছু কম। শোনা যায় মাঝখানের অধিনায়ক জেনারেল নিরঞ্জন প্রসাদ নাকি কিছুটা হামবড়াই করে অন্য দুদলকে পিছিয়ে রেখে সোজা এগিয়ে গেলেন লাহোর পর্যন্ত। ফলে, তাঁদের ডাইনে ও বাঁয়ে কোন আক্রমণ এড়াবার ব্যবস্থা রইলনা আর ওঁরা হলেন বিপন্ন। ওঁদের ঘিরে ফেলেছিল পাকিস্তান দুদিক থেকে আর আমাদের নাকি হ'য়েছিল

মারাত্মক অবস্থা যা না জানাই ভালো। একজন সেনানায়কের কিছুটা ভুলের জন্যে এবং বেশীটা অহংকারের কারণে অযথা আমাদের অসংখ্য জোয়ান প্রাণ দিল।

এই ভুলেরই নাটক হল শিয়ালকোটে। ওখানেও হল তিন দিক থেকে আক্রমণ আর যে ভুলটা লাহোরে হয়েছিল অর্থাৎ মাঝখানের দল আগে ভাগে এগিয়ে যাওয়া সেইটাই আবার অনুষ্ঠিত হল, কেবল, এবার হল রীতিমত প্ল্যান করে আর ঠিক হল, পাল্টা আক্রমণ হ'লেই ওরা পিছিয়ে আসবে বেশ কয়েক মাইল। হলও তাই। পাল্টা আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাঝখানের দল এলো পিছিয়ে আর বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পাকিস্তান সৈন্য ধাওয়া ক'রে এলো এগিয়ে বেশ কিছুটা। যখন ওরা এসেছে এই ভাবে তখন আমাদের ডাইনে বাঁয়ের দল ওদের ঘিরে ফেলে জবাব দিল লাহোরের আর বন্দী করল, বত্রিশটা ব্যবহার উপযোগী প্যাটন।

এই যে প্যাটন ধরা হল শনিবার, এগুলো আবার উল্টে নিয়ে কাজে লাগাতে হ'লে চাই গোলাগুলি। অতএব, শনিবারই নমুনা গেল আমাদের কারখানায়, আর তিন দিনের মধ্যে এলো একেবারে নতুন ধরণের গুলি। পরের বুধবার থেকে অর্থাৎ প্যাটন ধরার পাঁচদিনের মধ্যেই ওদেরই প্যাটন লাগানো হল ওদেরই সঙ্গে যুদ্ধে। এই অসাধ্য সাধন করল আমাদের দেশেরই সাধারণ মানুষ। পেন্টাগন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসল।

স্থলপথে যখন এইভাবে চলেছে আমাদের বিজয় অভিযান তখন আকাশ পথে সৃষ্টি হ'চ্ছে আর এক বিস্ময়কর অধ্যায়। জেটের সঙ্গে ন্যাটের যুদ্ধ। সেবার-জেট আমেরিকার প্রেসটিজ প্রডাক্সান আর ন্যাট বিলেতের বাতিল করা বিমান। এই ন্যাট যখন প্রথম বাজারে বের হল বিলেতে তখন ন্যাটো আর বৃটিশ বিমানবাহিনী এটা একবার পরীক্ষা ক'রেই যুদ্ধে অচল ব'লে নাকচ ক'রে দিল।

সেই সময় ওখানকার বিমান বাহিনীতে টেস্ট পাইলট ছিলেন বিচারপতি এস. আর. দাসের ছেলে সুরঞ্জন দাস। উনি ভারতে ফিরে আসার পর যখন এ দেশে বিমান তৈরির কথা উঠল, তখন স্কোয়াড্রন লীডার সুরঞ্জন দাস জোর দিয়ে বললেন 'ন্যাট'। কৃষ্ণমেনন তখন আত্মরক্ষা মন্ত্রী এবং তার কিছুকাল আগেই বিলেত থেকে জীপ কেনা নিয়ে বেশ একটা বড় ধরণের কেলেঙ্কারি ক'রে ব'সে আছেন। উনি বাধা দিলেন কিন্তু সুরঞ্জনের এক সুর—ন্যাট। বাতিল করা বিমান, বিলেত দেখল, এই সুবিধা। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরল, নিতে হয় তো ন্যাট নাও সস্তায় পাবে।

বাংলোরে আরম্ভ হল ন্যাট তৈরির কারখানা আর সুরঞ্জন দাস গেলেন ওখানকার চীফ টেষ্ট পাইলট হ'য়ে। কামালের মতন উনিও ঘর হারাণো মানুষ তাই প্রাণের মায়া অল্পই। নানান রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যে ন্যাট উনি বের করলেন তার চেহারা দেখে বিলেত হেসে অস্থির। সুরঞ্জনও হাসলেন, তবে মনে মনে। উনি জানতেন যে কোন একদিন ওঁর ধারণার ধার পরীক্ষা করার সুযোগ আসবেই। যুদ্ধের জন্য এই বিমানকে তৈরি করার মূলে আছে ওঁর সাধনা আর দুজন অসম সাহসী পাইলটের মৃত্যু—স্কোয়াড্রন লীডার সুধাকরণ আর স্কোয়াড্রন লীডার মুনীর। ওঁরাও ছিলেন সুরঞ্জনের মতনই ন্যাটের ভক্ত। ওরা ন্যাটের টেষ্টে প্রাণ দিলেন আর সুরঞ্জন করলেন সেই প্রাণত্যাগকে সার্থক সেবার-জেট্‌কে জয় ক'রে। এরও পেছনে আছে ছোট্ট একটা তথ্যের বিরাট আবিষ্কার। সুরঞ্জন দাস জানতেন যে চল্লিশ হাজার ফিট ওপরে উঠতে সেবার-জেটের লাগে ছ মিনিট। উনি ন্যাটটাকে এমন ভাবে তৈরি করালেন যাতে এটা সরাসরি ওপরে উঠে যেতে পারে আর সময় লাগে চারমিনিট। জেটের সঙ্গে ন্যাটের যুদ্ধ পদ্ধতিটাও উনি জানিয়ে দিলেন। চলে যাও সেবার-জেটের নিচে। মারবার লোভ সামলাতে না পেরে জেট ডাইভ মেরে আসবেই নেমে আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা উঠে যাও

ওপরে। সেবার জেট যতক্ষণে ডাইভ সামলে আবার উঠবে ওপরে ততক্ষণে ন্যাট ওপরে ডিগবাজি খেয়ে নেমে আসতে পারবে সেবার জেটের ঠিক ওপরে, ব্যাস তা'হলেই সেবার জেট কাবু।

এমনি ধারা আরও একটা আমাদের নতুন বিমান হল এইচ. এম. ২৪। এই বিমানটার ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করেছেন জার্মানীর ডঃ ট্যাঙ্ক। যেদিন প্রথম এইচ. এম. ২৪ বেরিয়ে এলো পরীক্ষার জন্যে সেদিন টেষ্ট পাইলট স্কোয়াড্রন লীডার সুরি বললেন অচল, এ প্লেন আকাশে উঠবেই না জমি ছেড়ে। সেই প্লেন নিয়েই সুরঞ্জন দাস উঠে গেলেন তিপ্পান্ন হাজার ফিট উঁচুতে।

বলছিলাম ন্যাট্যের কথা। ন্যাটের সঙ্গে সেবার জেটের যুদ্ধে হেরে আয়ুবের দ্বিতীয় টেক্কাও বরবাদ হ'য়ে গেল। আধখানা তো আগেই গিয়েছিল কাশ্মীরে। রইল খালি একটা টেক্কা চীন বন্ধুত্বের। সে টেক্কাটাও যে কেন বরবাদ হল অর্থাৎ লম্বা চওড়া হুমকি দিয়েও চীন কেন ভীতুর মতন ভেড়ার দাবীতে নেমে এলো এটা বুঝতে হ'লে হিমালয়ের ম্যাপ নিয়ে একটু আলোচনা ক'রে দু চারটে জিনিষ ভালো ক'রে জানা দরকার।

সবার আগে জানতে হবে কাশ্মীরের প্রতি পাকিস্তানের এই অসীম দুর্বলতা কেন? কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ সন্দেহ নেই কিন্তু ওটা আসল কারণ নয়। ওটা আসলে মস্ত এক সুবিধাজনক অজুহাত। তার বেশী নয়। রমণীয় জায়গা তাতেও কোন সন্দেহ নেই আর উদ্ভিজ্জ পণ্যও প্রচুর আছে ঠিকই কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস থেকে এবং কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে আমরা অনস্বীকার্য ভাবেই জানি যে দেশটা অত্যন্ত গরীব এবং প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। কাশ্মীরিদের যদি পশুরও অধম ক'রে রাখা হয় তাহ'লে অবশ্য আলাদা কথা কিন্তু ওদের মুষ্টিমেয় ভাবে মানুষের মতন বাঁচবার অধিকার এবং সুযোগ দিতে গেলেই দরকার অজস্র টাকার। অতএব ও দেশটা একটা মস্ত বড় দায়।

বৃটেন যতদিন এ দেশে ছিল ততদিন গরমের সময় ও দেশে হোমের হাওয়া খেতে গেলেও, দেশটা নিয়ে কখনই ওরা মাথা ঘামায়নি। জালিয়াতি ক'রে যখন ওরা ও দেশটা সাময়িক ভাবে অধিকার ক'রেছিল তখন আসল জায়গায় ওরা বেশ একটা বড় ধরণের ঘাঁটি বানিয়ে নিয়েছিল। সেটা শ্রীনগর নয়, জম্মু নয়, সেটা হল এশিয়ার অন্যতম কেন্দ্র গিলগিট্। রাশিয়াকে সায়েস্তা রাখার জন্যে এবং প্রয়োজনবোধে চীনের মধ্যে দিয়ে কম্যুনিজম আসাটা বন্ধ করার জন্যে বৃটেন এবং আমেরিকা দুই বানিয়ারই ঐ জায়গায় একটা পাকা বুনিয়াদের বিশেষ দরকার ছিল।

যে কোন ম্যাপ দেখলেই গিলগিটের প্রাধান্য বোঝা যাবে। এই গিলগিটকে ঘিরে মিশেছে তিন রাজ্যের সীমান্ত। একদিকে আফগানিস্তান, একদিকে ভারত আর একদিকে রাশিয়া। এই গিলগিটই ছিল পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। পাকিস্তান চেয়েছিল কাশ্মীরের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে এবং তার মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে। বৃটেন এবং আমেরিকা জিন্নাকে বুঝিয়েছিলেন (কেন তা পরে আলোচনা করব) যে (১) কাশ্মীর মহারাজার যখন ইচ্ছে তখন কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেই; (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের আধিপত্য আছে ফ্রন্টিয়ার গান্ধীর জন্যে এবং তারা কাশ্মীরের সঙ্গে সীমানায় যুক্ত আছে ব'লে ভারতের দিকে তার পাল্লা ঝুঁকতে পারে। (৩) যদি ঝোঁকে তাহ'লে পাখতুনিস্তান অনিবার্য্য; (৪) পাখতুনিস্তান হ'লে আফগানিস্তান তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য এবং এর ফলে—(৫) পাকিস্তানের মাথার ওপর থাকবে ভারত-পাখতুনিস্তান-আফগানিস্তানের মিলিত শক্তি। এটা বন্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে গিলগিট দখল করা।

বৃটেন-আমেরিকারও প্রয়োজন গিলগিট কারণ (১) ওটা হল রাশিয়ার সীমানা এবং কম্যুনিষ্ট প্রভাব আটকাবার পক্ষে ওটা

এশিয়ার বড় ঘাঁটি; (২) গিলগিটের মধ্যে দিয়ে ভারত যে কোন সময় রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসা যাওয়ার পথ করতে পারে আর তা যদি ক'রেই বসে তা'হলে এশিয়ায় কম্যুনিজম্ পাকাপোক্ত ভিৎ গেড়ে নিল। সেটা আমেরিকার বিশ্বব্যাপী কম্যুনিজম্ বিরোধীতার পটভূমিকায় একটা অসামান্য ক্ষতি। (৩) গিলগিট ভারতের কাছে থাকলে এখানে আমেরিকার বেস্ করা সম্ভব নয়। আর গিলগিটের সঙ্গে যদি কাশ্মীরও পাওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা—কাশ্মীরকে সহজেই করা যায় সাপ্লাই-র বেস্। এমনিতেই পাকিস্তানকে হাতে রাখবার জন্যে আমেরিকার চেষ্টা আর সাহায্যের ক্রুটি নেই, তার ওপর যদি গিলগিট আর সঙ্গে কাশ্মীরও ওদের হাতে তুলে দিতে পারে তাহ'লে পাকিস্তান হ'য়ে যায় ধন-কুবেরের দেশ—এশিয়ায় দ্বিতীয় আমেরিকা। আধিপত্য বাড়ানোর লোভ সব দেশেরই আছে। ব্যক্তিগত ভাবে জিন্নার তো সীমাই ছিল না আর তার ওপর ছিল বৃটেন আমেরিকার উস্কানি। অতএব পাকিস্তান অজুহাতের হাত বাড়িয়ে লাগিয়ে দিল যুদ্ধ।

যে যে কারণে বৃটেন আমেরিকার লোভ গিলগিটের ওপর, ঠিক সেই সেই কারণেই রাশিয়ারও ইচ্ছে যে গিলগিট এবং কাশ্মীর ভারতের হাতেই থাকুক। রাশিয়া স্থির বিশ্বাসে জানে যে (১) কাশ্মীর আর গিলগিট ভারতের হাতে থাকলে আমেরিকার পক্ষে ওখানে ঘাঁটি করা সম্ভব নয়; (২) পাকিস্তানের হাতে গেলে তা হবেই আর (৩) চীন ওটার ধারে লাদাকের ওপর লোলুপ দৃষ্টি হানবেই। এই সব কারণেই রাশিয়া স্পষ্টই জানিয়ে দিল, কাশ্মীর হল ভারতের অপরিহার্য্য অংশ। ওখানে আর সন্দেহের অবকাশটুকুও নেই।

অকস্মাৎ আক্রমণে আর পণ্ডিতজীর 'যে ক'রে হক শান্তি বজায় রাখো' নীতির ফলে গিলগিট আমাদের হাত থেকে চ'লে গেল। শুধু গিলগিটই নয়, সঙ্গে গেল বালটিস্তান আর লাদাকের কিছু

অংশ। আরো বড় সর্বনাশ হ'য়েছিল ছুটো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জায়গা ওদের হাতে গিয়ে—ব্রজিলা আর যোজিলা পাস। এ সবই যদি ওদের হাতে থাকত যা তখন ছিল, তা'হলে একটু সুযোগ পেলেই সৈন্য দিয়ে সারা কাশ্মীর ছেয়ে ফেলা পাকিস্তানের পক্ষে হত ছেলেখেলা। পাকিস্তানের সে সুবিধা সমূলে ধ্বংস ক'রে দিলেন জেনারেল থিমায়া (যাঁকে পণ্ডিতজী নাকি ব'লেছিলেন 'যুদ্ধ আমি তোমার চেয়ে ভালো বুঝি!!)। শীতকালে হিমালয়ের ঐ উচু জায়গাগুলো যখন বরফে ঢাকা এবং পাস ছুটো পুরোপুরি বন্ধ তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে (শুধু পাকিস্তানের গুপ্তচরদের নয়, ভারতবাসীদেরও!) ছোট ছোট ট্যাঙ্ক ১৩০০০ ফিট ওপরে তুলে নিয়ে গেলেন জেনারেল থিমায়া আর হঠাৎ একদিন আক্রমণ ক'রে বসলেন যোজিলা। শুধু পাকিস্তানই নয় পৃথিবীর কোন যুদ্ধবিদই ভাবতে পারেন নি যে ঐ উঁচু পাহাড়ে আর ঐ জমাট বাঁধা বরফে ট্যাঙ্ক দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব! জেনারেল থিমায়া সেটা শুধু সম্ভবই করলেন না, যোজিলা পাসটা জয় করলেন আর পাসের ওপারে কার্গিলও অধিকার ক'রে নিলেন। লেহ আমাদের রাখতে গেলে কার্গিলটা দরকার।

পাসটা এলো হাতে, কাশ্মীর বাঁচল আর লেহ আমাদের রইল ব'লে পাকিস্তানের পক্ষে রাহুল আর কুলুর মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাঞ্জাব আর ঝঙ্গর ও কিস্তওয়ারের মধ্যে দিয়ে জম্মু যাওয়া অসম্ভব হ'য়ে গেল। এসবই হল, কিন্তু গিলগিট, বালটিস্তান আর লাদাকের কিছু অংশ ওদের হাতে থাকার ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ হ'য়ে গেল সিনকিয়াং প্রদেশের মধ্যে দিয়ে।

গায়ে গায়ে লাগা বাড়িতে থাকলে সুখ দুঃখের কথা হওয়া মানুষের মতন জাতিরও স্বভাব। হলও তাই। তিব্বত অধিকার করার পরই চীন চাইল লাদাকের কিছু অংশ। হ'য়ে গেল মৈত্রী। আপোষ নিষ্পত্তি হল কাশ্মীর ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা ক'রে। চীন নেবে লদাক আর পাকিস্তান নেবে কাশ্মীর। সঙ্গে গিলগিট

তো রইলই। বলা বাহুল্য যে এই মৈত্রীর মূলে আছেন রাজপুত রমণী লক্ষীবাঈর পুত্র জনাব ভুট্টো।

এই জনাব ভুট্টো হ'লেন জুনাগড়ের স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টোর ছেলে। স্যার শাহ নওয়াজের প্রথমা পত্নী মারা যাওয়ার পর স্যার গুলাম হোসেন হিদায়াতুল্লার বাড়িতে ওঁর আলাপ হল লক্ষ্মীবাঈর সঙ্গে। লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন জয়সালমীরের রাজপুত ব্যবসাদারের (মার্চেন—বোধহয় মার্চেণ্ট কথাটারই অপভ্রংশ) মেয়ে। স্যার শাহ ওঁকে নিয়ে উধাও হলেন আর বম্বেতে বাসা বাঁধলেন। জনাব ভুট্টো সাহেব বম্বেতেই মানুষ এবং মেহবুব খাঁ সাহেব যখন রাজকাপুর দিলীপকুমার আর নার্গিসকে নিয়ে ছবি করছিলেন 'আন্দাজ' তখন তরুণ জনাব ভুট্টো (পুং) প্রতিদিন ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ষ্টুডিওর দরজায় নার্গিসকে দেওয়ার জন্যে। নার্গিস বিরক্ত হ'য়ে একদিন মেহবুব খাঁ সাহেবকে করলেন নালিশ। তার পরদিন জনাব সাহেব যখন এলেন আবার ষ্টুডিওতে মেহবুব সাহেবের নেপালি দরওয়ান ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিল রাজপথে। বম্বে হাইকোর্টের নথীপত্তর ঘাঁটলে দেখা যাবে যে পার্টিশ্যানের পর থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ভুট্টো সাহেব এখানে কেস্ লড়েছেন যাতে ওঁর বাবার সম্পত্তি ইভাক্যুই প্রপার্টি ঘোষিত না হয় আবার ঐ একই সময় করাচিতে কেস্ লড়েছেন যাতে ওঁর বাবার সম্পত্তির বিনিময়ে ওঁকে কমপেনশেসন দেওয়া হয়!

এ হেন জনাব সাহেবের সঙ্গে আয়ুব সাহেবের সাময়িক দোস্তি হলেও স্থায়ী চুক্তি হওয়া সম্ভব নয় কারণ আয়ুব সাহেব না হক সাহেব, সাণ্ডহার্স্টে পড়া আর সাহেব-ঘেঁষা। আয়ুব যখন সিংকিয়াং-এর মধ্যে দিয়ে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ স্থাপন ক'রে দিলেন আর চীন যখন তিব্বত অধিকার করার পর লাদাকের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিল, জনাব সাহেব তখন আয়ুবের আমেরিকা প্রীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীন মৈত্রী গ'ড়ে তুললেন। এই হল মোটামুটি ইতিহাস। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে চীনকে।

ঘটনাবলীর ধারা একটু ঘাঁটলেই দেখা যাবে যে গত যুদ্ধে যে সময় চীন আমাদের ওপর নোটিশ জারি করেছিল তার আগে ওদের কূটনীতিক ব্যবহারে তৃতীয় স্তরের বস্তিসুলভ বাচলতা থাকলেও যুদ্ধের ঝাঁক ঠিক ছিল না। ওটা আরম্ভ হল যখন ভারতীয় সৈন্য লাহোর আর শিয়ালকোট অবরোধ ক'রে পাকিস্তানের কান কেটে দিল। অতএব এটা পাক্কা বুদ্ধি জনাব সাহেবেরই কারসাজি। পাকিস্তান হিন্দুস্থান যুদ্ধে কি হবে সেটা জনাব সাহেবের ঠিক মতন জানা ছিলো না। উনি ভেবে দেখলেন যদি পাকিস্তান হারার দিকে যায় তো ভারতকে বিব্রত করার জন্য চীন আছে আর যুদ্ধ থামাবার জন্যে আয়ুব সাহেবের আমেরিকা আছে আর যদি ভারত হারার দিকে যায় তো লাদাক নেওয়ার জন্যে চীন আছে। চীন কিন্তু চায়নি এবং ভাবতেও পারেনি যে পাকিস্তান যদি হারার দিকে যায় তাহ'লে আমেরিকার সাহায্য ওরা নিক বা নেবে। সময় মত নোটিশ জারি ক'রেই চীন দেখল, পাকিস্তান আমেরিকার দিকে ঝুঁকেছে (ঝুঁকবে নাইই বা কেন ? আমেরিকা ওদের ডলার দিয়েছে, প্যাটন দিয়েছে, স্যাবারজেট দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং ভারতকে কিচ্ছু না দেওয়ার অঙ্গীকারও দিয়েছে। চীন দিয়েছে কিছু ফিউজ আর ল্যানটর্ণ এবং টর্চ ও ফাউণ্টেন পেন।) কাজই চীনের মেজাজ গেল বিগড়ে, ফলে চীন পড়ল, ঝিমিয়ে। আর ওদের দফা শেষ করল রাশিয়া ছোট্ট দু চারটে কথায়। তাছাড়া কাশ্মীর সম্বন্ধে রাশিয়ার যে কোথায় দুর্বলতা তাও চীন ভালো ক'রে জানে। অতএব কাশ্মীর নিয়ে কোন গণ্ডগোলে যদি চীন যোগ দেয় তাহ'লে রাশিয়া পিছিয়ে থাকবে না। বাধ্য হ'য়ে চীনকেই পড়তে হল পিছিয়ে।

আয়ুব সাহেবের সাড়ে তিনখানা টেক্কা এইভাবে ব্যর্থ হল। ভারতের হাতে চারটের মধ্যে বাকি যে আধখানা টেক্কা, ছিল সেটা ছিল প্রত্যেকটি ভারতবাসীর সব হারানো আর প্রত্যেকটি ভারতীয় সৈন্যের শেষ দেখার পণ ও প্রস্তুতি। লালবাহাদুর সেই

আধখানা টেক্কা নিয়ে এমন চাল চাললেন যে সারা পৃথিবী হতবাক হ'য়ে হাত ফেলে দিল। উইলসন্ সাহেব যুদ্ধ লাগানোর জন্যে ভারতকে যে দোষারোপ ক'রেছিলেন সেটা পড়ি মরি ক'রে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন, উ থাণ্টের শান্তি প্রস্তাবে আয়ুব সাহেব যে তিনটে সর্ত ক'রেছিলেন সেগুলো ভুলে মেরে দিলেন আর জনাব সাহেব হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যে বিরাট হুমকি দিয়েছিলেন তা বেমালুম হজম ক'রে ফেললেন। জনসন্ সাহেব চালাক মানুষ উনি চুপ ক'রে চোখ বুঁজে রইলেন।

কাশ্মীরের হানাদারি যুদ্ধ ছিল হাতের কাছে। কান পাতলে গুলির শব্দই শোনা যেত, সংবাদের তো কথাই নেই। যুদ্ধ যখন স'রে গেল লাহোর আর শিয়ালকোট সেক্টরে তখন সংবাদের জন্যে রইল রেডিও আর রফিক সাহেব। ইছাগোলে ভারত সৈন্যের প্রথম আক্রমণের সংবাদ রেডিও দিল, তার ফলাফল উনি জানালেন সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায়। কাশ্মীরে আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স ফেল করেছিল যতখানি, ওরই সুবাদে জানা গেল, যুদ্ধ সীমানার ওপারে তাদের সেই অনুপাতে সাফল্যের কথা। অন্যান্য সূত্র ধ'রে জানা গেল, একটি বিমান অভিযানে চল্লিশজন পাকিস্তানি পাইলটকে একই বাড়িতে মারার কথা, সারগোধা এয়ারপোর্টে আত্মহত্যা অভিযানে রাডার ভেঙে তছনছ করার বীর কাহিনী। ভারতীয় হিসেবে নিজেকে সার্থক মনে হল যেদিন শুনলাম ইছাগোল ক্যানালের ধারে আমাদের সৈন্যদের একের পেছনে আর একজন ক'রে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের কনক্রিটের বাঙ্কার অধিকার করার অবিশ্বাস্য বিবরণ। কামান দিয়ে যে আঠারো ইঞ্চি চওড়া কনক্রিটের দেওয়াল দেওয়া বাঙ্কার ভাঙা সম্ভব হয়নি, সেই বাঙ্কার অধিকার করার একটি মাত্র উপায় ছিল ব্যক্তিগত ভাবে বাঙ্কার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে খোলা ঘুলঘুলির মধ্যে হাত বোমা ফেলা। সে পর্যন্ত যাওয়ার একমাত্র পথ ছিল মেশিনগানের অগ্নীবর্ষণের মধ্যে দিয়ে। আমাদের জোয়ানরা ভেবে এক উপায়

বের করলেন। পাশাপাশি গেলে মৃত্যু অনিবার্য্য। তার চেয়ে যদি একজনের পেছনে আর একজন ক'রে যাওয়া যায় তাহলে সামনের কিছু লোক মরলেও পেছনের লোক পৌঁছে যাবেই। এই ভাবেই ওঁরা অধিকার ক'রেছিলেন পাকিস্তানের অজেয় বাঙ্কার।

এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল কলাইকুণ্ডা এয়ারপোর্টের কলঙ্ক কাহিনী। সিক্সটিনথ স্কোয়াড্রনের একদল বোমারু ফিরছিলেন পাকিস্তানি বিমান তাড়িয়ে। আমাদের এই স্কোয়াড্রনের আদ্দেক ছিল কলাইকুণ্ডায় আর বাকি আদ্দেক ছিল বেরেলিতে। আমাদের বিমান যখন ফিরল, অভিযানের পর, তখন উইং কমাণ্ডার উইলসন ফিরে এলেন কলাইকুণ্ডায় কিন্তু নামতে চাইলেন না ওখানে, কারণ উনি বললেন পেছনে ওঁর পাকিস্তানি বোমারু বিমান আছে তাড়া ক'রে, অতএব ওঁর বেরিলি যাওয়াই ঠিক হবে। কলাইকুণ্ডা থেকে উইলসনকে হুকুম দেওয়া হল ঐখানেই নামতে। উনি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ওঁকে ঐখানে নামতে বাধ্য করা হল। ওঁর নামবার তিন মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি বিমান এসে আমাদের সাতটা বিমান ধ্বংস ক'রে গেল। অতি লোভে যখন ওরা দ্বিতীয়বার এলো আক্রমণ চালাতে তখন ওদের দুটো বিমান ধ্বংস করা হল। উইলসনকে যদি ওখানে নামতে বাধ্য না করা হত তাহ'লে ঐ এয়ারপোর্টে আমাদের অতোখানি ক্ষতি যে হত না তা বলাই বাহুল্য।

আর খারাপ লাগল, ৩৫ স্কোয়াড্রনের নায়ক উইং কমাণ্ডার বক্সির কথা শুনতে। উনি গিয়েছিলেন দল নিয়ে করাচি এয়ারপোর্টের ধারে পাকিস্তানের গোলাবারুদের গুদাম ধ্বংস করার গুরু দায়িত্ব নিয়ে। আমাদের যে পাইলটরা রাত্রের অন্ধকারে একটা ছোট্ট বাড়ি খুজে বের ক'রে চল্লিশজন পাইলট সমেত সেটাকে ধ্বংস ক'রে আসতে পারে, সেই পাইলটরাই না কি বারোটা বড় বড় গোদাম খুঁজেই পেলেন না, দিন দুপুরে। পরদিন যখন অন্যরা গিয়ে পেলো তখন দেখা গেল সেখানে জোর পাহারা ব'সে গেছে।

যে কাজটা বক্‌সি সাহেব এক ফুৎকারে ক'রে আসতে পারতেন সেটা সহজ সাধ্য হল না। কেন হল না? লোকে বলে ঘুষের জন্যে।

সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন জম্মু অঞ্চলে সতেরোজন ভারতীয় শিখ এবং হিন্দু ধরা পড়ল পাকিস্তানি প্যারাট্রুপার এবং গুপ্তচরদের আশ্রয়ই শুধু নয় তাঁদের লুকিয়ে রাখার অপরাধে। যে দেশে রাত দুটোর সময় বারো তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের দেখেছি হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে রেল লাইন আর রাস্তা পাহারা দিতে প্যারাট্রুপার নামার পর, সেই দেশে এই ধরণের মানুষ থাকে কি ক'রে ভাবতে বসলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। উচিত ছিল ঐ সতেরোজন লোককে প্রকাশ্য রাজপথে পাগলা কুকুরের মতন গুলি করে মারা। কে জানে, একটু তলিয়ে খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়ত ওদের পেছনে আছে কোন বিরল মাড়োয়ারি আর নয় সাদা টুপি পরা কোন কালোবাজারি মন্ত্রী।

কংগ্রেসি মন্ত্রীর দল আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করেছেন তাঁদের নিজেদের কলঙ্কিত চরিত্রের আঁচড় দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর হিজিবিজি কেটে। একদিন যে দেশের মানুষ নুন তৈরি ক'রে জেল খেটেছে আজ সেই দেশেরই মানুষ নয়াপয়সার জন্য দেশ বিকিয়ে দেয়, মরা ছেলের পেট চিরে তার ভেতরে সোনা পুরে কাসটমস্‌ ফাঁকি দেয়, দরিদ্র শিশুদের মিল্ক পাউডার বিক্রী ক'রে নারীর বেসাতি ক'রে। কুড়ি বছরের মধ্যে এই কলঙ্কিত অধঃপতন কি ক'রে ঘটল? যারা ঘটিয়েছে, বলরাজের মতন আমারও ইচ্ছে করল, সেই সব হতভাগাদের টেনে বের ক'রে আনি তাদের বড় বড় রাজপ্রাসাদ থেকে আর দেখাই যুদ্ধকালীন পাঠানকোট, জলন্দর, অমৃৎসর প্রভৃতি সহরে, আশপাশের গ্রামে, পথে ঘাটে গ্রামীন দীন দরিদ্র মানুষদের দেশপ্রেম আর আত্মোৎসর্গের অক্ষয় কীর্ত্তি। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে স্টেশনে দেখেছি আমাদের জোয়ানদের আদর; বিনামূল্যে তাদের ফল, দুধ, সিগারেট, পান, চা, লুচি তরকারি শুধু দেওয়াই নয়, নিতে না

চাইলে, জোর ক'রে হাতে গুঁজে দেওয়া এবং দিয়ে কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়া। এ কাজ ব্ল্যাক মার্কেটের টাকাওয়ালা বড় বড় ব্যবসাদাররা করেনি, করেছে জীর্ণ বস্ত্র পরা, অনাহারক্লিষ্ট, অভাবে জর্জরিত গ্রামের চাষা, সহরের কুলি, হাটের মজুর আর গরীব মেয়েরা। আরও দেখেছি মধ্যরাত্রের গভীর অন্ধকারে গ্রামের লোক লাঠি আর লণ্ঠন হাতে বন্দুকধারী প্যারাট্রুপার খুঁজে বেড়াচ্ছে আখের ক্ষেতে, নালার তলায় উলু খাগড়ার জঙ্গলে। জম্মু থেকে ছম্ব রণাঙ্গণে যাওয়ার পথে সত্তর-বর্ষীয়া বিধবা বৃদ্ধাকে দেখেছি রুটির ঝুঁড়ি মাথায় আর জলের হাঁড়ি হাতে "মেরে লাল্" দের খাওয়াবার জন্যে রণাঙ্গণের দিকে সাত মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে। পাঠানকোটের জনাকীর্ণ পথ হাঁটতে হাঁটতে দেখেছি সাত আট বছরের শিশুরা তাদের যুদ্ধ জয়ের অভিযান চালিয়েছে পথের মোড়ে মোড়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোয়ানদের জুতো পালিশ ক'রে আর বুড়োরা তাদের জল সরবৎ চা বিতরণ ক'রে। অমৃতসর স্টেশনের বাইরে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের দেখেছি প্যাকেট প্যাকেট পোষ্ট কার্ড নিয়ে ব'সে জোয়ানদের জবানি চিঠি লিখতে আর পাঠানকোট স্টেশনে দেখেছি চিরুণি হাতে বৃদ্ধা, জোয়ানদের আদর ক'রে চুল আঁচড়ে দিতে। আরও দেখেছি কাশ্মীরে বুইক হাঁকিয়ে এসে সৈনিক শিবির থেকে বড়লোক ব্যবসাদারকে অল্প মূল্যে মদের বোতল কিনতে!

এই সব দেখা আর শোনায় মেশানো যুদ্ধের উন্মাদনা আর আমার ছবির কাজের উত্তেজনার মাঝে মাঝেই রুকায়ার সন্ধান নিই আর সময় পেলেই ওর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই। সেদিনে ঐ সব কথার পর প্রত্যক্ষ ব্যবহারটা যতই আমাদের সহজ হক, গভীর অবচেতনায় একটা কিছু জড়তা যেন কাঁটার মতন বিধে আছে দুজনেরই মনে। আদর্শের শক্ত সঙ্কল্প দিয়ে মনটাকে—বেঁধেছি ঠিকই কিন্তু মন থেকে এই নতুন পরিস্থিতি

কোনমতেই যেন মেনে নিতে আমরা পারছিনা। হয়ত কখন এমন পরিনির্বাণীয় আনন্দে কিছু পাইনি ব'লে কিম্বা হয়ত, যা পেয়েছি তা হারাতে চাই না বলেই এমন হত। আরও একটা কারণ ছিল রুকায়া নিজে। সহজ আর সস্মিত কথার মাঝখানে কোন এক মুহূর্তে ও হঠাৎ থমকে গিয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে যেন প্রথম মিলনের প্রথম মুহূর্তটিতেই ও এখনও নিবদ্ধ আছে—যেমন থাকে রাগিণীর শেষ সুরে প্রথম পর্দার মূর্চ্ছনা। তখন আমার মনে হত আমার গেরুয়া বসন পরা মনটা মিথ্যে, একেবারে নির্জলা আর নির্লজ্জ। মনে হত হয়ত আমি নিজের কাছে নিজেই মিথ্যে কথা বলা অমানুষ আর ঐ সব বড় বড় কথা বোধ হয় সত্যি আমার আদর্শের আফিং যার নেশায় নিজের কাছেই আমি নিজেকে বড় ব'লে জাহির করার জঘন্য প্রচেষ্টা করি। আমার এই সব নানান প্রশ্নের জবাব নিজের মনে জানা প্রয়োজন ব'লে, ওকে যখন প্রশ্ন করলাম, ও বললে :

'তোমার কথা তুমিই জানো, আমার কিন্তু যখনই মনে পড়ে পাকিস্তানের কথা তখনই মনটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়।'

'পাকিস্তান কেন ?'

'তাছাড়া কি ?' গভীর উত্তেজনায় রুকায়া ফেটে পড়ে বলতে থাকে 'পাকিস্তান যদি না আসতো সেই সাতচল্লিশে তো সারা জীবন থাকতাম আমি বোর্খার আড়ালে আর পেতাম যা এদেশের মেয়েরা চিরকাল পেয়ে এসেছে। ছোট্ট পরিমিত জীবন, সুখ দুঃখের সংসার, ছোট্ট চাহিদার পরিপূর্ণ পূরণ যেমন পেয়েছিল আমার মা তারও আগে আমার ঠাকুমা, দিদিমা।'

থেমে যায় রুকায়া বড় কিছু ভাবার জন্যে, বলে 'ঐ পাকিস্তানের জন্যেই হারিয়েছি আমি কামালকে। তুমিও গেছো আমার জীবন থেকে ঐ পাকিস্তানের কথা ভেবে আর পঁয়তাল্লিশ কোটির দোহাই দিয়ে।'

ছোট্ট ক'রে আমি বলি : 'কৈ আমি তো যাইনি।

'গেছ, কিন্তু কি ক'রে তা বলব না।'

হেসে ফেলি। বলি, 'না বললেও বোঝা যায়।'

'তাহলে?'

এইবার আমার প্রসঙ্গে এসে পড়ে বলি, 'দৈহিক ভাবে পাওয়াই কি সব পাওয়া?'

'সব নয় হয়ত, তবে অনেকখানি।'

'আচ্ছা ভেবে নাও' গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি মনের কথাগুলো 'এমন একটা সভ্যতা যেখানে সামাজিক বাঁধন নেই, স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা নেই লয়ালটির বালাই নেই। স্বেচ্ছাচারিতা ব'লে কিছু নেই, অবাধ দেহদানে বদনামের লেশ নেই আর নেই সংযমের কোন মূল্য। বিটনিক্ নামীয় আধুনিকতম সম্প্রদায়ের এই আদীম প্রথাগুলোর যদি আবার প্রচলন হয়, আর জীবনে মুল্যবোধের যদি বালাই চোকে তাহ'লে কি হয়? মানুষ কি সুখী হবে? তাতেই কি মানুষের পাওয়ার তৃষ্ণা মিটবে?'

রুকায়া কোন জবাব দেয়না চুপ ক'রে ভাবতে থাকে, বোধহয় কল্পনা করতে থাকে অমনি ধারা জীবন।

'কৈ বললে না?'

'জানিনা। তুমিই বল।'

'আমিও ঠিক জানিনা। তবে বোধহয় বা আমার মূল্য-বোধে, দেহের ক্ষুধাটা কেবল দেহের নয়, দেহটা শুধু প্রকাশের ভঙ্গিমা, ভাষাও বলতে পারো। আসলে ওটা মনের। মন যদি এই সব মূল্যবোধকে সেলামি না দিয়েই দেহের ওপর ভর করে তাহ'লে ও চাওয়া হয় লালসা আর ও পাওয়াটা হয় ব্যর্থ। ধর তুমি আর আমি। আজ আমরা যাই বলিনা কেন আর যাই করিনা কেন, কামাল আমাদের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘনীয় অন্তরায় হ'য়ে অনবরত ঐ সব সামাজিক আর চারিত্রিক বিধি নিয়মের দিকে আঙ্গুল দেখাবেই। আর আমরা যে চোখ বুজে থাকব তারও উপায় নেই কারণ শিক্ষা আর সংস্কৃতি আমাদের মজ্জায়

গুঞ্জায় মিশে আছে। আজ যদি তুমি আর আমি আমাদের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার বন্যায় ভেসে যাই অবাধ স্বাধীনতায় তাহ'লে বলবার কেউ নেই, কেবল আমাদের মন ছাড়া। তার অপমৃত্যু অনিবার্য্য। তাই আমার মনে হয়, ঐগুলো সব আছে ব'লেই ভালোবাসা সার্থক।'

রুকায়া ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করল: 'কোনগুলো?'

'যে সব মূল্যবোধগুলো বাদ দিয়ে আমি জীবনটাকে ভাবতে বললাম। সামাজিক বাঁধন, লয়ালটি, অন্যের ইচ্ছা, সংযম, দেহের মর্য্যাদা, মনের মূল্যবোধ। এইগুলো যদি জীবন পরিপূর্ণ ক'রে তবে ভালোবাসা যায়, চাওয়াটা তবেই হয় পবিত্র, পাওয়াটা তখনই হয় সার্থক আর ঐটেই হয় পরিনির্বাণীয় আনন্দে পরিপূর্ণ যখন ঐ চাওয়ার মূলে থাকে সন্তান সৃষ্টির সাধনা। তার চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে আর কিছু নেই এইটাই আমার ধারণা।'

কিছু একটা ভেবে নিয়ে রুকায়া বললে: 'আর একটা কথা বল।'

'কি?'

'সত্যি করে বলবে কিন্তু।'

'বলব।'

'কখন কি ইচ্ছে করে না তোমার, আবার আমাদের দুদিনের ঐ ছোট্ট ইতিহাসের পাতা আর একবার ওলটাতে?'

ওর দিকে তাকাই বটে অপলক কিন্তু সেটা আমার অজুহাত। নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখি ভালো ক'রে, বলি:

'করে না যদি বলি তাহ'লে মিথ্যে বলা হবে। করে ঠিকই কিন্তু ওটা করণীয় নয় ও ইচ্ছেটাকে আমি আমল দিই না।'

'কেন? দুর্নামের ভয়?'

হেসে ফেললাম: 'সুনামের মোহ নেই তাই দুর্নামের ভয়ও আমার নেই।'

'তাহ'লে?'

'আমার মধ্যে যে সত্যিকারের মানুষ আছে মাঝে মাঝেই

তাকে দেখতে আমার মন চায়। আরও একটা কারণ হল আমার মনের মূল্যবোধ।'

'এটা তোমার মিথ্যে অহংকার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি: 'হতেও পারে। তবে আত্মত্যাগও বটে। জীবনের এই জটিলতায় কামালকে আমি বড় ক'রে দেখছি, সেটা তো আমার আত্মত্যাগই।'

'তাহলে আর একটা কথা বল।'

'কি?'

'আজ তুমি আমায় কি চোখে দেখ?'

হেসেই বলি, 'দু চোখ ভ'রে। যেমন তোমায় প্রথম দিন আমি প্রথম সাক্ষাতে দেখেছিলাম।' থেমে আবার বলি, 'চোখ ভ'রে তো দেখিই। মন ভ'রেও।'

হেসে নিল রুকায়া সলজ্জ ভঙ্গিমায়, বললে:

'জানা হল। এবার বল তুমি যাচ্ছ কবে? টিকিট পেলে?'

'টিকিট তো আছে। প্লেন নেই। তাই ভাবছি রাস্তা ধরব।'

'কবে?'

'গেলেই হল। আজ। কাল। পরশু। কেন?'

'তুমি যে ব'লেছিলে ভূষ ময়দানে যাবে।'

মনে পড়ে গেল ফকীর মহম্মদের আত্মত্যাগের কথা, ওর মৃত্যুর করুণ কাহিনী। বললাম: 'যাবো। পাকিস্তানের কবরস্থান না দেখে ফেরাই যাবে না।'

'কবে যাবে?'

'যেদিন তোমার সময় হবে।'

খানিকটা অস্থির চাপল্যে ও উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানলার চৌকাঠ ধরে; বাইরের বেসমাল বেলা যাওয়া অন্ধকারে, বোধহয় মনের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে। তারপর ফিরে বলল: 'কালই?'

'যাবো। কিন্তু এতো তাড়া কেন?'

জানলায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ও বললে: 'মনের তাগাদা।'

থেমে আবার বললে, 'কবে তুমি চ'লে যাবে ঠিক তো নেই। তাছাড়া, কামাল ফিরে এলে আর যে তুমি আসবে না তাও আমি জানি।'

ওকে বাধা দিয়ে বলি : 'ওটা তোমার ভুল ধারণা।'

অবাক হল ; প্রশ্ন করলো : 'আসবে ?'

'রোজ। যদি থাকি। অবাক হ'লে ?'

'কিছুটা।'

'কেন ?'

'বোধহয় তোমায় ঠিক বুঝি না বলে।'

'না বোঝার তো কিছু নেই, কামালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমায় আমি ভালোবাসি। এ দুটোর কোনটাই লুকোবার জিনিষ নয়।'

রুকায়া হেসে বলল, 'সভ্য সমাজের এটা কিন্তু নিয়ম নয়।'

আমিও হেসেই জবাব দি : 'জানি। আমার অতীতে তার বহু প্রমাণ আছে। আমি না থাকলে তারা কুকুরের মতন চুপি চুপি আসত আর আমায় দেখলেই চোরের মতন পালাতো।'

'মানলাম' রুকায়া বললে, 'তুমি আসবে কিন্তু তার আগে চ'লেও তো যেতে পারো।'

'তা পারি।'

'তাই ইচ্ছে করছে, তার আগে তোমার সঙ্গে প্রকৃতির পরম সৌন্দর্য্যকে আর একবার প্রণাম জানিয়ে আসি।'

'আমার সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ।' রুকায়া বললে, 'প্রকৃতির আমরা অভেদ্য অংশ তাই আলাদা ক'রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কখন দেখতে জানতাম না। ওটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ। নৈসর্গিক সৌন্দর্য যে এমন নিঃসীম তা তোমারই শিক্ষা।'

ভালো লাগল, ওর মুখে আমার মনের এই কথাগুলো। প্রকৃতিকে আমি বিমুগ্ধ মনে ভালোবাসি ব'লেই জীবনের জঞ্জাল আমায় নৈরাশ্যের জালে আজও জড়াতে পারেনি। অর্থ আর খ্যাতির মোহে যখন অনর্থ ঘটেছে, স্বার্থের হানাহানিতে যখন

সংসার ভেঙেছে আর মানসিক সংঘাতে যখন সন্তানদের হারিয়েছি তখন প্রকৃতির কোলে চোখ মেলেই পেয়েছি আমি চৈত্তিক সান্ত্বনা। প্রকৃতিই আমার প্রজ্ঞা পারমিতা। তাই সানন্দে সম্মতি দিলাম: 'বেশ, তাহ'লে কালই চল।'

উঠে দাঁড়ালাম। অনেক দূরের কিছু পথ হেঁটে যাবো, বাকি যেতে হবে টাঙা হাঁকিয়ে। ওদিকে কারফ্যুর সময়ও আসন্ন। আরও মনে ছিল, সূর্য্যাস্তে প্রথম প্রহরে আমার গৃহহীনতার গভীর বেদনা হয়ত ওর চোখে ধরা পড়ে গিয়ে ওর মনে বেদনার ছায়া ফেলবে। সেটা অনুচিত এবং কামালকে নিয়ে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্কল্পের অন্তরায়। সাধর্মীর কাছ থেকে সমবেদনার সান্ত্বনা শুনতে খারাপ লাগেনা ঠিকই কিন্তু সম্পর্কটা যদি ভালোবাসার হয় তাহ'লে সমবেদনার মধ্যে বড্ড বেশী স্পর্শের তাগাদা থাকে। আনত সন্ধ্যা আর একলা ঘরে সেটা মনকে বড্ড বেশী অসহায় ক'রে দেয়। দরজার কাছে ও বললে:

'যাবো তো' যদি আর না ফিরি?'

হেসে বলি: 'ভয় নেই। আমি ফিরিয়ে আনব। কামালের কৈবল্য জীবনে তোমায় পৌছে দিয়ে তবেই তো আমার ছুটি?'

ও ঠাট্টা ক'রে বলল,: 'পঁয়তাল্লিশ কোটি?'

সেই পঁয়তাল্লিশ কোটি আজও ঠিক আগের মতনই আছে। কামালও আছে। আমিও আছি। রুকায়ার স্মৃতিও আছে। ওই শুধু নেই।

তারপর যা হয় মানুষ মরলে তাই হল। ওর গুণগানে কাশ্মীর ভরে উঠল। ওর সাহসের তালিকা ছড়ালো সৌরভময় বাতাসের মতন। গান হল, লেকচার হল, লৌকিকতাও হল। ওর সমাধিতে সবাই ফুল দিল। ছবিতে মালা পরালো। একবাক্যে সবাই বলল, কি সুন্দর জীবন ছিল ওর—সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধিতে ভরপুর। আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। সার্কিসাহেব কাশ্মীরের

জাঁদরেল ব্যবসাদার আর জব্বর ডন জুয়ান। স্মৃতিসভা থেকে উনি আমায় ধ'রে নিয়ে গেলেন সালিমার বাগানে। হুইস্কির বোতলটা মুখে পুরে উনি বললেন, মেয়েটার, বুঝলেন, সব ভালো ছিল, শুধু ভালোবাসা যে কি তা জানতো না। ওর পেছন পেছন আমি পৃথিবী ঘুরেছি—লণ্ডন, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান। টাকা ছড়িয়েছি তু' হাতে, আর জীবন দিয়েছি ওর পায়ে বিছিয়ে কিন্তু মনই যার নেই এসবের মূল্য সে বুঝবে কি? সার্কি সাহেব সারা সন্ধ্যা এমনি ধারা কত কথা ব'লেছিলেন আজ তার কিছুই আমার মনে নেই। ঐ সন্ধ্যার একটা কথা শুধু মনে আছে। ওঁর সঙ্গে আমি সমান তালে মদ খেয়েছিলাম কিন্তু মাতাল হইনি।

বলরাজের বাগানে চৌকিদারের চিলতে বারান্দায় ব'সে মোমবাতির আলোয় মনটাকে আজ উলটে পালটে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। সারা পৃথিবীময় সমস্ত জীবন জোড়া ব্যর্থ খোঁজার পর যখন নিজেকে হারাতে এলাম কাজের অজুহাতে তখনই হল আমার সার্থক পাওয়া। শিল্প সাধনা আর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শান্ত পরিবেশে যেটা সহজ মনে পাওয়ার কথা, সেটা আমার পাওয়া হল মৃত্যু আর ধ্বংসের মধ্যের মধুচন্দ্র মুগ্ধতায়। এইখানেই এক অতর্কিত সন্ধ্যায় আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম পাখীর ছোট্ট তুলোটে পালকের মতন মধুর ভালোবাসা। সারা জীবনের বিস্তৃতিতে তার মেয়াদ এক পলকের বেশী নয়। মৃত্যুর ঝড়ে সেটা উড়ে চলে গেল, কেন জানিনা, কোথায় তাও জানিনা। আমার জীবনজোড়া প্রতীক্ষার এইটাই শেষ না এইখান থেকেই আবার নতুন ক'রে আরম্ভ তাই বা কে জানে?

কিন্তু স্থির বিশ্বাসে একটা কথা আমি ঠিক জানি। সে জানার আমার শেষ নেই। রুকায়ার রহসি ভালোবাসায় মনের অনেক ক্লেদ আমার ঘুঁচে গেছে, অনেক কালিমা মুছে গেছে, শূন্যতার হাহাকার শেষ হয়েছে। জীবনের ওপর যে ক্ষুব্ধ অভিমান আমার

জমা হ'য়েছিল, নিজের প্রতি যে গভীর অবিশ্বাস আমায় গলা টিপে মারছিল আর সংসারের ওপর যে জঘন্য ঘৃণা জীবনকে ক্লেদাক্ত করেছিল সে সব থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি আর নির্মুক্ত মনে বাঁচার আনন্দও আমি জেনে নিয়েছি।

নিঃসীম আবেশে ভালোবাসার আশ্বাস আর নৈকষ্য আনন্দে ত্যাগের তৃপ্তি আর এই দুই সীমানার মাঝখানে আমার সত্যিকারের মানুষটাকে পর্য্যবসিত করার জন্যেই যে আমার অতীতের চক্রবাল বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন ছিল সেটা আমার মনে আজ আলোর মতন উজ্জ্বল বলেই অরুন্তুদ জীবন থেকে হীরের আংটি পরা হাতের ধাক্কা আমি সর্বান্তকরণে ক্ষমা ক'রে দিতে পারছি। আমার মন থেকে আজ সব তিক্ততা সরে গিয়ে তিতিক্ষার স্থান ক'রে দিয়েছে। রুকায়া আমার জীবনে সার্থকতার প্রমাণ, নবজন্মের প্রতীক।

পঁয়তাল্লিশ কোটির জন্যে ও জীবনকে মেনে নিয়েছিল। ওর জন্যে আমি আজ অপরিমিত আনন্দে সবাইকে ক্ষমা করতে পারি, সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যত কলঙ্ক, অর্থের মোহ খাতির আকর্ষণ, লোভ, রাগ, দ্বেষ, ঐহিক চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব সব আমার শেষ হয়েছে রুকায়ার 'সব পেয়েছির' রাজত্ব থেকে জগতকে জেনে। তাই জীবনটা আজ থেকে আর রৌরব নয় অনির্বাণ গৌরব।

রুকায়া তার জীবনের জ্যোতি ছড়িয়ে আর মৃত্যুর মাধুরী মিশিয়ে আমার প্রতীক্ষার সীমানা বাড়িয়েছে কি কমিয়েছে তা জানিনা কিন্তু অনেক জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়ে গেছে— কেবল একটা সমস্যার সমাধান সে করতে পারেনি। সে হল আমার নিখিলেশ। অনেক ভেবেও ও আমায় বোঝাতে পারেনি ঠিক কোথায় আমার নিখিলেশ। সে কি আমার বাস্তবের শেষে না আমার স্বপ্নের আরম্ভে?

কে জানে।